জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

প্রথম খণ্ড

6070

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা-৩

প্রথম সংস্করণ
পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৭

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী

[ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত ভূমিকার বঙ্গানুবাদ]

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারি খণ্ড[১] গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু যে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি সনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয়া সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

অন্যত্র যেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দু মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করিবেন। ভারত হইতে ইংরেজী ভাষা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও ঐ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রসূ হইবে। হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের—যাহা সত্যসম্পর্কে বিগতভী। এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে। সঙ্কটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে আহরণ করিয়া বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই ভারত যে বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১ ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বর্তমানে আট খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বাংলায় এই গ্রন্থাবলী দশ খণ্ডে বিভক্ত।—সম্পাদক

নিজের সীমান্তের বাহিরে অবস্থিত ·মানব-সাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, ইহা যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত। ইহা যে এইবারই প্রথম সংঘটিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে জাতিগঠনকারী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তা-ধারার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল—সেই আত্মগত একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নূতনভাবে সৃষ্ট হইল। আমরা কখনই ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশ: 'তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের নিকট প্রচার কর।' ইহা সেই একই চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উদ্গাত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি বলিতেছিলেন, 'একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে। ··সেইজন্য হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও।' এবং তিনি নিজের বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ করিয়া বলেন, 'আমরা হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ্য করি, তাহা নয়, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমরা মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পার্শীদিগের অগ্নির পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই। আমরা জানি নিম্নতম বস্তুমূর্তি হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে, অসীমকে উপলব্ধি এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই সকল কুসুম চয়ন করিয়া, প্রেমের সূত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পূজার জন্য একটি অপূর্ব স্তবক রচনা করি।' এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হৃদয়ে বিদেশী বা পর; তাঁহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল।

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাব-সমূহ,' কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে কিছু নূতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর

সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য। ইওরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোতে—যেখানে মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক কালের প্রযত্ন এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহা কিছু, তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে—এই নগর-রানীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপর বিস্তৃত—উত্তরের দ্যুতিতে ভাস্বর চক্ষু লইয়া তিনি যেন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের ঐতিহ্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহা চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লাভ করে নাই। এবং এই কেন্দ্রের সৃজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতূহল বর্তমানে আমাদের কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক ঐক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে সঞ্চরমাণ।

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর—তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহা ছিল অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ। বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ পরিবেশেরই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর—বহুযুগের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত; তাঁহার পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ, যাহার কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ্ হইতে—এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের—এমন একটি জগৎ, যাহা ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ—একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধূলিকণা যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসন্তের পাদস্পর্শে পবিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ—তাহার বহু সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সে পরীক্ষা করিয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অনেক কিছু, এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় সব কিছু—শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছাড়া, যে ঐকমত্য সে-দেশের অধিবাসিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সুতরাং এইগুলি ছিল দুইপ্রকার চিত্তপ্রবাহ; যেন দুইটি বিশাল চিন্তা-

তরঙ্গিণী—প্রাচ্য ও আধুনিক ; ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক-পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্ত হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র। ব্যক্তিত্বাভিমানশূন্ত এই ব্যক্তির আধারে সংঘটিত এই অভিঘাতের অবশুম্ভাবী ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্গত হয় নাই,—এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনকালে—মধ্যাহ্নসময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ উষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্ত মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্ত।

একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে—বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই, যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার নিকট—তাঁহার নিজেরই ভাষায়—ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 'বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা'। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্ত, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন ; তাহাদের একটি বা অপরটি—এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্ত কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 'এগুলি সবই সূত্রে মণিগণের মতো আমাতেই অনুস্যূত।……যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্ত শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে 'মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।'…এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ—সেই আদেশ : 'ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে'—ধর্ম তখনই

আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, যিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে।

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট—যাহা সত্য তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডারই বুঝায়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন: 'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ-সমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়-বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করিতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন হইতেছে—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সর্বাবগাহিত্ব—প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিমা

বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত : 'শোন অমৃতের পুত্রগণ! যাহারা দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে—সকল অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে! তাঁহাকে জানিয়া তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।' এই তো সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী সব কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে। 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান,—এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে – ইহার বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোষণা করে: সাধনার অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে নিরাকারে—কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের হউক না কেন, প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে মহান্ ঊর্ধ্বগতির সোপান-স্বরূপ মনে করে এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাঁহার নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত। গীতায় কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায়—ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্যের ন্যায় তাঁহার বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি দ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশক-রূপে—ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও

করিতেন, তথাপি তাঁহা দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত; না আরও বেশী—ঐগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু থাকিত, ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্নতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত। যদি তিনি আবির্ভূত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি আজ সহস্র সহস্র মানবের নিকট জীবনের পরমায়রূপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতো নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, এবং রামানুজের মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।

তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। এ-কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা, বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আর একটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই, তিনি এমন এক তত্ত্ব—যাহাতে সাকার নিরাকার দুইই আছে।

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে।'

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি সূত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহার সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা—সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় দুইটি ভাবজগতের যে-বৈষম্য এইভাবে তাঁহার চক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ধর্মগ্রন্থগুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে সঞ্চারিত করিয়াছিল; ইহা তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, এই অনুভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের ঋষিগণ আকস্মিকভাবে ইহা লাভ করেন নাই, যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরন্তু ইহা ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিষয়—সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহা সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে থাকিয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভাব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ—তদানীন্তন 'নরেন'—তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্রসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্ত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাঁহার জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত—মনের গতি বহু হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ। তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই দিব্যদর্শন লাভ করিত। 'জড়ভাবের মতো' পরম জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা এই

শিল্পকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্ত-বিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের কুঞ্চিকা লাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি এখনও তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল—এই-ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাঁহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

সুতরাং শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—যেন তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্ সঙ্গীত। এই রত্নগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা—একই দীপাধারে প্রজ্বলিত, ভারতবর্ষ তাঁহার হাত দিয়া উহা জ্বালাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য—১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বৎসরের কর্মের মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই দীপ প্রজ্বালনের জন্য ও এই যে লেখমালা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য, স্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশেকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাঁহারা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাঁহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয়া উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা
(N. of Rk-V)

প্রকাশকের নিবেদন

আজ হইতে শত বৎসর পূর্বে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের একটি পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্যে ধর্মের প্রভাব তখন কিছুটা স্তিমিত; অশিক্ষা ও কুশিক্ষায়, পরাধীনতা ও দারিদ্র্যে ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ভারতও যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে; সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রান্ত পথনির্দেশকরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁহার আগমনে শুধু যে তমসাচ্ছন্ন ভারত কর্মযোগে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহা নয়, রজোগুণে উন্মত্ত ইওরোপ-আমেরিকাও তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষায় ধ্যান-জ্ঞানের নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, আধ্যাত্মিকতার একটি শাশ্বতরূপ দেখিয়া মানুষ আজ ধর্ম-বিষয়ে নিজের ভুল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাত্র উনচল্লিশ বৎসর কাল স্বামীজী এই মর্ত্যলোকে অবস্থান করেন, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর কাল। পরিব্রাজক জীবনের শেষে শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যান। সেখানে অপূর্ব সাফল্যের পর, তিনি আমেরিকা ও ইওরোপে সার্বভৌম আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেন। পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত-প্রচারের কার্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন ও স্বদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বজ্রনির্ঘোষে নব-জাগরণের বাণী শুনাইতে থাকেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী পুনরায় পাশ্চাত্ত্যে গমন করেন ও বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় নবযুগের উদার ভাব প্রচার করিতে থাকেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

কঠোর পরিশ্রমে তখন তাঁহার শরীর ক্লান্ত, মনও নির্বাণমুখী; তাই অতি শীঘ্র জগতের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজ যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিস্ময়-বিমুগ্ধ জগৎ বহুদিন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। বক্তৃতা এবং রচনার মাধ্যমে

স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাল মাত্র সাত বৎসর (১৮৯৩-১৯০০), অবশ্য পত্র-রচনার কাল ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী (১৮৮৮ ১৯০২)।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশানুরূপ-ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাপি তাঁহার যে-কয়টি ভাষণ ও বক্তৃতা আমরা পাইয়াছি, তাহা চিরদিনই মানব-সমাজের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে। বিভিন্ন দেশের বহু ব্যক্তিকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলি এবং তাঁহার কথোপকথনও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উৎস।

স্বামীজীর বাংলা পত্র ও প্রবন্ধ কিছু কিছু তাঁহার জীবৎকালেই তৎ-প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদেশে প্রদত্ত তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাবলীর কিছু কিছু সেই দেশেই পুস্তকাকারে বাহির হয়। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাতেও স্বামীজীর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

স্বামীজীর উৎসাহে মাদ্রাজ হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তাহাতেও তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী বাহির হইতে থাকে। কিছুকাল পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' হিমালয়ে স্থানান্তরিত হয়, তখন উহাতে নিয়মিতভাবে তাঁহার লেখা ও বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে।

স্বামীজীরই নির্দেশে গুরুসেবার অঙ্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এগুলি ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয়; পরে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন-কার্যালয় হইতে সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হইতেছে।

স্বামীজীর জন্মের শত বর্ষ পরে তাঁহার ঐ-সকল বাণী, রচনা ও পত্রাদি এবং আজ পর্যন্ত আরও যে-সকল অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সব একত্র করিয়া শতবর্ষ-স্মারক-গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করার কথা দুই-তিন বৎসর পূর্বে আমাদের অনেকের মনে উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজীর পরামর্শক্রমে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য মঠের কয়েকজন

বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও আমাদের সুহৃদ্ কয়েকজন অধ্যাপককে লইয়া একটি ছোটখাট সভায় অধিবেশন হয়। এই আলোচনা-সভায় সর্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয় যে, স্বামীজীর পত্রাবলী সময়ানুক্রমে সাজাইয়া এবং বক্তৃতা ও রচনা, কথোপকথন—যথাসম্ভব বিষয়ানুযায়ী সাজাইয়া ১০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উদ্বোধন কার্যালয় হইতে জন্মশতবর্ষ-স্মারক গ্রন্থ-রূপে প্রকাশিত হইবে।

দশটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ ও রাজযোগ; ২য় খণ্ডে জ্ঞানযোগ; ৩য় খণ্ডে ধর্ম ও দর্শন; ৪র্থ খণ্ডে ভক্তিযোগ এবং 'দেববাণী'; ৫ম খণ্ডে 'ভারতে বিবেকানন্দ' এবং ভারত-প্রসঙ্গে বক্তৃতা ও রচনাবলী মুদ্রিত হইতেছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা (গদ্য ও কবিতা) এবং পত্রাবলী; ৭ম খণ্ডে পত্রাবলী ও ইংরেজী কবিতার অনুবাদ; ৮ম খণ্ডে পত্রাবলী এবং 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ'; ৯ম খণ্ডে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', স্বামীজীর সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথন এবং ১০ম খণ্ডে মেরী লুই বার্ক লিখিত গ্রন্থে (Swami Vivekananda : New Discoveries in America) প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণীর বঙ্গানুবাদ এবং বিবিধ বিষয়ের লেখা ও বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইতেছে।

স্বামীজীর সমগ্র 'বাণী ও রচনা'র মুখবন্ধরূপে ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ভূমিকা 'Our Master and his Message' অনুবাদ করিয়া প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই সন্নিবেশিত হইল। প্রতি খণ্ডে স্বামীজীর রচনাদির সহিত একটি তথ্যপঞ্জী ও নির্দেশিকা দেওয়া হইয়াছে।

পুরাতন অনুবাদগুলিতে যথাসম্ভব স্বামী শুদ্ধানন্দজীর রীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু ভাষার সংস্কার করা হইয়াছে। বানানে বর্তমান রীতি অনুসৃত।

এই গ্রন্থমালার সম্পাদন-ভার সর্বসম্মতিক্রমে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দকে দেওয়া হয়। ইহাও স্থির হয় যে, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ-বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। প্রকাশনের অন্যান্য কার্যের ভার উদ্বোধনের প্রকাশন বিভাগের পরিচালক স্বামী অতন্দ্রানন্দের উপর অর্পিত হয়। এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সুপরিচিত স্বামী গম্ভীরানন্দের সাহায্য এবং পরামর্শও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থমালা-প্রকাশ-প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের উৎসাহে ও প্রাথমিক অর্থানুকূল্যে এই প্রকাশন কার্য আমরা আরম্ভ করি।

শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্য শিল্পী আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয় এই গ্রন্থমালার প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়া দিয়া আমাদিগকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অনুবাদ প্রভৃতি কার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন ডক্টর রমা চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীতামসরঞ্জন রায়, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী অজজানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রভৃতি অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও বুধমণ্ডলী। সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

আরও অনেকে এই গ্রন্থমালা প্রকাশনে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, স্থানাভাবে সকলের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা গেল না। তাঁহাদের শ্রম ও সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। গ্রন্থমালার তথ্যপঞ্জীর পৌরাণিক অংশ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ঐতিহাসিক অংশ অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর, নৃতাত্ত্বিক অংশ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই গ্রন্থমালার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। দার্শনিক অংশের তথ্যপঞ্জী ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তথ্যপঞ্জীর অন্যান্য অংশ এবং নূতন পত্রগুলির অনুবাদ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের শ্রীমান্ সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাউ-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় সমগ্র গ্রন্থাবলীর বিষয়-নির্দেশিকা (Subject Index) প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের শেষে নির্দেশিকা রচনা করিয়াছেন শ্রীমান্ তারক-নাথ দে ও শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ। হিসাব রক্ষায় ব্যাপারে প্রথম হইতেই শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য।

বাগবাজার নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনের শ্রীবিজয়লাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার বাড়ির অনেকটা অংশ আমাদের এই প্রকাশন বিভাগের জন্য ছাড়িয়া না দিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রন্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুষ্ঠু বিতরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

ইঁহাদের সকলের উপর শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হউক; স্বামীজীর জীবনপ্রদ ভাবধারা সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক—বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর পুণ্য বৎসরে, এই গ্রন্থাবলী প্রকাশনের শুভক্ষণে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রকাশক

সূচীপত্র

চিকাগো বক্তৃতা



ভূমিকা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বমেলা উপলক্ষ্যে চিকাগোতে চারিটি সমাবেশ হইয়াছিল, পাঠককে সে-কথা এখানে জানানো ভাল। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল যে-সকল বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেগুলির সহিত সাহিত্য- কলা- এবং বিজ্ঞান-সম্মেলন সংশ্লিষ্ট করাও একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব মানব-কল্যাণকারী বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাসে এইরূপ প্রত্যেকটি অধিবেশন যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহাও আশা করা যায়। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে যাঁহারা একত্র মিলিত হইয়াছেন, সেই মানবমণ্ডলী চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখার তাত্ত্বিক গবেষণা ও কার্যকরী আবিষ্কারের আদান-প্রদান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন করাই তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবেন। মার্কিন সাহস ও মৌলিক মনোভাব লইয়া চিকাগো-বাসিগণই ভাবিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির একত্র সমাবেশই হইবে এই-সকল সম্মেলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মেলন। এই-সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিবেন, আন্তরিক গভীর সহানুভূতি সহকারে তাহারা তাহা শুনিবে—এ-কথাও ব্যক্ত হইয়াছিল। এইরূপ সম মর্যাদার ও সুনিয়ন্ত্রিত বাক্‌স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিগণ যে সংসদ গঠন করিবেন, তাহা হইবে একটি ধর্ম-মহাসভা। 'বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের প্রয়োজনীয়তা' জগতের মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইবে।

প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যে নিমন্ত্রণ ও যথারীতি নির্বাচনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিষ্য তাহাদের গুরুদেবকে হিন্দুধর্মের পক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বিশেষভাবে তৎপর হইল। অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তাহাদের মনেই হয় নাই, তাহারা এমন কিছু দাবী করিতেছে, যাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা ভাবিয়াছিল, বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইলেই যথেষ্ট হইবে। স্বামীজীও শিষ্যগণের মতো জাগতিক

রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানিলেন যে, এই কার্যে তিনি ঈশ্বরাদেশ লাভ করিয়াছেন, তখন স্বামীজী কোন বাধাই মানিলেন না। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও পরিচয়পত্রাদি ব্যতিরেকেই হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি জগতের সমৃদ্ধি ও শক্তির সুরক্ষিত দ্বারে প্রবেশ করিলেন—এই ঘটনা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের সংঘবদ্ধহীনতা অন্য কোন উপায়ে স্পষ্টতরভাবে প্রমাণিত হইতে পারিত না।

চিকাগোতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। প্রেরিত ও গৃহীত আমন্ত্রণ অনুসারে কোন পরিচিত ও স্বীকৃত সংস্থা তাঁহাকে প্রেরণ করে নাই। অধিকন্তু প্রতিনিধি-সংখ্যা বাড়ানোর সময়ও চলিয়া গিয়াছে, তালিকা পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বস্টনে যদি কাহারও সহিত দৈবক্রমে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটিয়া যায়, এইরূপ ভাবিয়া কী গভীর নৈরাশ্যেই না তাঁহাকে চিকাগোর রুদ্ধদ্বার হইতে ফিরিতে হইয়াছিল!

এইভাবে দূরদৃষ্টি বা নিজের কোন পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচিত হইলেন। রাইট তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিলেন এবং মাদ্রাজী শিষ্যগণের মতো তিনিও অনুভব করিলেন যে, আগামী ধর্ম-মহাসম্মেলনে পৃথিবীকে এই ব্যক্তির বাণী শুনিতেই হইবে। পরে অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার নিকট পরিচয়-পত্র দেখিতে চাওয়া এবং সূর্যকে তাহার আলোকদানের অধিকার জিজ্ঞাসা করা একই কথা।' এইরূপ প্রীতি ও প্রভাবের জন্যই স্বামীজীকে পুনরায় চিকাগোয় যাইতে হইয়াছিল এবং সেখানে স্বীকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা ও আসন লাভের পথ উন্মুক্ত হইল। অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা গেল তিনি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত। একমাত্র ভারতীয় বা একমাত্র বাঙালী না হইলেও তিনিই ছিলেন যথার্থ হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি।

অন্যান্য সকলে সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা কোন ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। একমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা; এবং সেদিন তাঁহারই মাধ্যমে ঐ ভাবগুলি সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ঐক্য ও রূপ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের যে-ধর্মকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে নিজগুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণকালে তিনি

দেখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। যে ভাবগুলিতে সমগ্র ভারতের ঐক্য আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই। ধর্ম-মহাসম্মেলনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করিতে সতরো দিন প্রবন্ধাদি পাঠ চলিয়াছিল। ১৯শে (সেপ্টেম্বর) স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় বক্তব্য পাঠ করেন। কিন্তু যেদিন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা ও সেগুলির উত্তর পঠিত হইল, সেই প্রথমদিন হইতেই স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নের শেষদিকে তিনি অভ্যর্থনার উত্তর দিলেন। যখনই তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকাবাসিগণকে 'ভগিনী ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, যখনই প্রাচ্য সন্ন্যাসী তিনি—নারীকে প্রথম স্থান দিয়া—সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সেই মহাসম্মেলনে আনন্দের যে শিহরন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শ্রোতৃবর্গের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, 'আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন করার কথা ভাবিতে পারিল না!' সেই মুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাঁহার নিশ্চিত সাফল্যের সূচনা হইয়াছিল। পরে সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ চঞ্চল শ্রোতৃবর্গকে কৌশলে শান্ত করিবার জন্য অনেকবার বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি ধৈর্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে সর্বশেষে স্বামীজী একটি গল্প বলিবেন বা একটি বক্তৃতা দিবেন। এই ভাষণগুলির কিছুকিছু অংশ সুরক্ষিত হইয়া এই পুস্তকে অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই সম্মেলন এমন একটি যুগের সূচনা করিয়াছে, যাহার মূল্য ও গুরুত্ব কালক্রমে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। কেবল বাহ্য চাকচিক্য ও আড়ম্বরের দিক্ হইতে প্রতিনিধিদের সম্মেলন সভার প্রারম্ভে ও অবসানে এমন একটি দৃশ্য রচনা করিয়াছে, যাহা আমাদের সমসাময়িক কেহ আর কখনও দেখিবে না। কোটি কোটি মানুষের ধর্মমতের প্রতিনিধিগণ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন। দৃশ্যটি উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টায় আমরা রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যবিবরণীর প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

'যথা সময়ের বহুপূর্বেই প্রাসাদটি প্রতিনিধি ও দর্শকে ভরিয়া উঠিল, এবং 'কলম্বস্ হল' বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দেশ-বিদেশের চার হাজার উৎসুক

শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। বেলা দশটার সময় বহুজাতির উড্ডীয়মান পতাকার নীচে বিশাল জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে বারোটি ধর্মের প্রতিনিধি-গণ হাত ধরাধরি করিয়া বারান্দা দিয়া আগাইয়া আসিলেন। এই সময়ে মঞ্চটি ছবির মতো চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করিল। কেন্দ্রস্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গির্জার প্রধান যাজক কার্ডিনাল গিবন্‌স্ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উচ্চাসনে সমাসীন। যথাযোগ্য প্রার্থনা পূর্বক তিনি সভার অধিবেশন শুরু করিলেন।

'তাঁহার উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের নানাবর্ণের পোশাক ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার পোশাকের সমতুল হইয়াছিল। ব্রহ্ম, বুদ্ধ ও মহম্মদের ভক্তগণের মধ্যে বোম্বাইয়ের বাগ্মী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উজ্জ্বল চমৎকার রক্তিম পোশাকে তাম্রবর্ণের মুখমণ্ডলকে হরিদ্রাবর্ণের বৃহৎ উষ্ণীষে বেষ্টন করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে কমলা-রঙের ও শুভ্র বেশভূষায় সজ্জিত ভারতের একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মসমাজের বি. বি. নাগারকর ও সিংহলের বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপাল বসিয়াছিলেন। ধর্মপাল চার কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃশ ক্ষুদ্র দেহটি শুভ্রবেশে সজ্জিত ছিল এবং কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িতেছিল।

'সেখানে মুসলমান, পার্শী ও জৈন ধর্মযাজকগণ নিজ নিজ বিচিত্র বর্ণ ও গতিভঙ্গি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বীয় ধর্মের ব্যাখ্যা ও সমর্থনে তৎপর হইলেন।

'জাপান ও চীনের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট উজ্জ্বল মূল্যবান্ বেশে শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ, তাও-ধর্ম, কংফুছের মত ও শিণ্টো ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তপস্বীর মতো কৃষ্ণবর্ণের বেশ পরিধান করিয়া প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ভারতের একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মসমাজের নেতা মজুমদার মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বীয় বাগ্মিতা ও ইংরেজী ভাষার উপর অপূর্ব অধিকারের দ্বারা বিরাট শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

'আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি একটি অদ্ভুত বক্রযষ্টিতে ভর করিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি হইলেন জান্তের (Zante) গ্রীক ধর্মযাজক—

তাঁহার ছিল আবক্ষবিস্তৃত শুভ্র শ্মশ্রুরাশি, মস্তকে অদ্ভুতদর্শন এক টুপি, কোমর হইতে ঝুলানো বৃহৎ রৌপ্যনির্মিত ক্রশ। এশিয়া মাইনর হইতে আগত রক্তিমগণ্ড দীর্ঘকেশ এক গ্রীক 'সন্ন্যাসী' তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গর্ব করিয়া বলিতেছিলেন, তিনি কখনও শিরোভূষণ ব্যবহার করেন নাই বা নিজ আহার-বাসস্থানের জন্ম একটি কপর্দকও ব্যয় করেন নাই।

'আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট (Arnett) এবং আফ্রিকা-দেশীয় এক যুবরাজের আবলুস কাঠের মতো কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আড়াল করিয়াছিল সম্মিলিত মহিলাদের সুন্দর বেশভূষা; এবং সর্বপশ্চাতে কালো পটভূমিকারূপে ছিল প্রোটেষ্টাণ্ট প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিত অতিথি-বর্গের কৃষ্ণ পরিচ্ছদ'। (ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যাণ্ডের রেভাঃ ওয়েস্টের ধর্মোপদেশ হইতে গৃহীত)

সর্বশেষ ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মসম্মেলনের সহিত অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি কিংবা সম্রাট আকবরের ধর্মসভার তুলনা করিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ জাতির দুঃসাহসই এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিরাট কার্যসূচীর পরিকল্পনা করিয়াছিল; নাগরিকগণের শক্তিপ্রাচুর্য এবং উৎসাহই ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। ধর্মসভার গঠনতন্ত্র ইহার মাধ্যমেই হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্বয়কারী ভাবগুলি ব্যক্ত করিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উদ্ধত ও বর্ধনশীল ধর্মগুলির প্রতিনিধিবর্গ সরল গণতান্ত্রিক সাম্য ও সৌজন্যের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর কখনও এরূপ বিরাট-ভাবে এইজাতীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল ধরিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে সর্বপ্রথম নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিল।

—নিবেদিতা

অভ্যর্থনার উত্তর

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবন্‌স্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী বলেন :

হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে গিয়া আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি দূরদেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারাও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' (ভাবার্থ : বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদের এ-কথা বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি ; যে বৎসর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে তাহাদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়, সেই বৎসরই তাহারা দক্ষিণ-ভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য আসিয়াছিল। জরথুষ্ট্রের অনুগামী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে

ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যাহারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহারই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি: 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥'[১]—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্নস্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনি হে ভগবান্, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

এই ধর্ম-মহাসভা গীতাপ্রচারিত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছে: 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥'—যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতো-ভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।

১ শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

ভ্রাতৃভাব

১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণে ধর্ম মহাসমিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব ধর্মের প্রাধান্য-প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত হন; অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ এই গল্পটি বলিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।

আমি আপনাদিগকে একটি ছোট গল্প বলিব। এইমাত্র যে সুবক্তা ভাষণ শেষ করিলেন, তাঁহার কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন—'এস আমরা পরস্পরের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হই'। মানুষে মানুষে সর্বদা এতটা মতভেদ থাকিবে ভাবিয়া বক্তা-মহাশয় বড়ই দুঃখিত। তবে আমি আপনাদের একটি গল্প বলি, হয়তো তাহাতেই বুঝা যাইবে—এই মতভেদের কারণ কি।

একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাস করিত। সে বহুকাল সেইখানেই আছে। যদিও সেই কুয়াতেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি ব্যাঙটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্রই ছিল। অবশ্য তখন বর্তমান কালের ক্রমবিকাশবাদীরা কেহ ছিলেন না, তাই বলা যায় না, অন্ধকার কূপে চিরকাল বাস করায় ব্যাঙটি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল কি না; আমরা কিন্তু গল্পের সুবিধার জন্য ধরিয়া লইব তাহার চোখ ছিল। আর সে প্রতিদিন এরূপ উৎসাহে কুয়ার জল কীট ও জীবাণু হইতে মুক্ত রাখিত যে, সেরূপ উৎসাহ আধুনিক কীটাণুতত্ত্ববিদ্‌গণেরও শ্লাঘার বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে দেহে কিছু স্থূল ও মসৃণ হইয়া উঠিল। একদিন ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের একটি ব্যাঙ আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল।

কূপমণ্ডূক জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'সমুদ্র থেকে আসছি।'

'সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মতো বড়?' এই বলিয়া কূপমণ্ডূক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফ দিল।

তাহাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, 'ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করবে কি ক'রে?'

ইহা শুনিয়া কূপমণ্ডূক আর একবার লাফ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সমুদ্র কি এত বড়?'

'সমুদ্রের সঙ্গে কুয়োর তুলনা ক'রে তুমি কি মূর্খের মতো প্রলাপ ব'কছ ?'

ইহাতে কূপমণ্ডূক বলিল, 'আমার কুয়োর মতো বড় কিছুই হ'তে পারে না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই থাকতে পারে না ; এ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও।'

হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির বেড়া ভাঙিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হইবে। আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

হিন্দুধর্ম

১৯শে সেপ্টেম্বর, নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয় ও ইহুদী—এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তৎপ্রসূত ধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই ঐ সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইল, এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসী মাত্র এখন মহান্ জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইল, বোধ হইল যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়-বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই-সকল বহুধা বিভিন্ন ভাব কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাত-বিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে

অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।

এ স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন —সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। আচ্ছা, যদি এমন এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই-সকল ব্যক্ত শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেহ বলিবেন যে, এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে, ইহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।

যদি কোন উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ—নিত্যসক্রিয় বিধাতা, তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে: 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা

যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'—অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি—'আমি' 'আমি' 'আমি', তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি—এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেন: না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা—আমি দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্তু আমি মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মরিয়া যাইবে তখনও আমি বাঁচিয়া থাকিব এবং পূর্বেও আমি ছিলাম। আত্মা শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়, কারণ 'সৃষ্টি' শব্দের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এগুলি বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট পদার্থ হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা মরণশীলও বটে। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন।

কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে—শরীর সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে—কাহারও হস্ত-পদ নাই, কেহ বা জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান্ কেন এত পক্ষপাতী? যদি বলো যে, যাহারা এ জন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখী হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছুই উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন দুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের এই ভাবধারা সৃষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার চেষ্টাও নাই; পরন্তু এক সর্বশক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর আদেশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্পষ্টতই ইহা অবৈজ্ঞানিক। অতএব স্বীকার করিতে হইবে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেইসব কারণ।

দেহ-মনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ মনের প্রবণতা হইতেই উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ হয় না কি? দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত্তা সমান্তরাল রেখায় বর্তমান—একটি মন, অপরটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার

দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। কিন্তু জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করা যায় না, এবং যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক একত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাদী একত্ববাদ অপেক্ষা ইহা কম বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুইটির কোনটিরই—প্রয়োজন নাই।

আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশবস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব জীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। স্বীকার করা গেল পূর্বজন্ম আছে, কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন? ইহা সহজেই বুঝানো যাইতে পারে। আমি এখন ইংরেজীতে কথা বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা নয়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-মনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরও নাই। কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহা এখনই প্রবল বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগেই চেতন-ভাব অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা সেই সমুদ্রের গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে। চেষ্টা ও সাধনা কর, ঐগুলি সব উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে।

পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ। কার্যক্ষেত্রে সত্যতা নির্ণীত হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং ঋষিগণ সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন: স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ

কিরূপে আলোড়িত করিতে হয়; সেই রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সাধনা কর, তোমরাও পূর্বজন্মের সকল কথা মনে করিতে পারিবে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু নিজেকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। 'সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না, এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।'[1] হিন্দু বিশ্বাস করে: সেই আত্মা এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আর আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নন, আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। কিন্তু কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় মনে করিতেছেন।

পরবর্তী প্রশ্ন: কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ? পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? শুনিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন—হিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে পারিবেন না বলিয়া উহা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত আত্মা ও জীব—এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চান এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না। প্রশ্ন যেমন তেমনই রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া পূর্ণকল্প হইতে পারেন? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, কেমন করিয়া তাঁহার সেই স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, 'জানি না, কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যাপারটি তো অনুভূত সত্য। প্রত্যেকেই তো নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করে।' কেন এইরূপ, কেনই বা আত্মা এই দেহে রহিয়াছেন, তত্ত্ব তাঁহারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—এরূপ বলিলে কিছুই ব্যাখ্যা করা হইল না। হিন্দুরা যে বলেন, 'আমরা জানি না', তাহা অপেক্ষা এই উত্তর আর বেশী কিছু নয়।

১ গীতা, ২।২৩

বেশ, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন বা দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। বর্তমান অবস্থা পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা এবং বর্তমান কর্ম দ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে—মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন ওঠে: প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? আত্মা কি নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্যকারণ-স্রোতে দুর্বল অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মতো কার্যকারণ-চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর ঐ চক্র সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে—বিধবার অশ্রুর দিকে চাহিতেছে না, পিতৃমাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না?

ইহা ভাবিলে মন দমিয়া যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। তবে কি কোন আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন-সমীপে উহা উপনীত হইল, সেখান হইতে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নামিয়া আসিয়া এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষি তারস্বরে জগতে এই আনন্দ-সমাচার ঘোষণা করিলেন, 'শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই।'[১]

'অমৃতের পুত্র' কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান,

---

১ শ্বেতাশ্ব. উপ., ২।৫

মৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

এইরূপে বেদ ঘোষণা করিতেছেন—কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্য-কারণের কারাবন্ধন নয়; কিন্তু এই-সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন এক বিরাট পুরুষ, যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে।'[১]

তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান্—সকলের উপরেই তাঁহার করুণা। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি আমাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর'—বৈদিক ঋষিগণ এইরূপ গানই গাহিয়াছেন। আমরা কিভাবে তাঁহাকে পূজা করিব? প্রীতি ভালবাসা দিয়া। প্রেমাস্পদরূপে—ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে।

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখা যাক, হিন্দুগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া যাঁহাকে বিশ্বাস করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই প্রেমতত্ত্ব পরিপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়াছেন: মানুষ পদ্মপত্রের মতো সংসারে বাস করিবে। পদ্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু তাহাতে জল লাগে না; মানুষ তেমনি এই সংসারে থাকিবে, ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়া হাতে কাজ করিবে।

ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা ভাল; কিন্তু ভালবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসা আরও ভাল। তাইতো এই

---

১ কঠ উপ., ২।৩।৩

প্রার্থনা : প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা চাই না। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব ; কিন্তু আমার শুধু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালবাসার জন্যই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের এক শিষ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট শত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া রানীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে রানী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন, 'প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা! কেমন সুন্দর ও মহান্! আমি হিমালয় বড় ভালবাসি। পর্বত আমাকে কিছুই দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান্ বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্য ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার একমাত্র পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাসি। আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি না, আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না, তাঁহার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাঁহাকে ভালবাসি। আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না।'

বেদ শিক্ষা দেন : আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন ; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব এই পরিত্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ঋষিদের ব্যবহৃত শব্দ 'মুক্তি'—মুক্তি, মুক্তি—অপূর্ণতা হইতে মুক্তি'—মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি।

ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপালাভের উপায়। কিভাবে তাঁহার করুণা কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। 'তখনই—কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়।' মানুষ তখন আর ভয়ঙ্কর কার্যকারণ নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মস্থল, ইহাই

ন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার লইয়া াকিতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু াকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে াত্মা বলিয়া কিছু থাকে, যাহা আদৌ জড় নয়,—যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী রমাত্মা থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন রিবে। তবেই তাহার সকল সন্দেহ দূর হইবে। অতএব আত্মা ও শ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আত্মাকে র্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।' সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই কমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র; শুধু শ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই—উহা জীবনে পরিণত করাই র্ম।

এখন দেখা যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ য়া—দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁহার র্শনলাভ করিয়া সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।

পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন রেন। আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দের ধিকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন—সকল ন্দু এ-বিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ইহা সাধারণ ধর্ম।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পূর্ণতাই পরম তত্ত্ব, এবং সেই পরম কখনও দুই তিন হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে । অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন, তখন ক্ষের সহিত এক হইয়া যাইবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য ও পূর্ণরূপে লব্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ—নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, রপেক্ষ আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ।

আমরা প্রায়ই পড়িয়া থাকি, আত্মার এই অবস্থা—ব্যক্তিত্বের লয়—ঠ পাথরের মতো জড়াবস্থা; ইহাতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ য়, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা বোধ করেন নাই, তিনিই রের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া পরিহাস করেন।

আমি বলিতেছি, এই অবস্থা ঐরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দেহের চেতনা উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহের চেতনা উপভোগ আরও বেশী সুখের হইবে। এইরূপে—দেহসংখ্যা যতই বাড়িবে, আমার সুখও ততই বাড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায়—লক্ষ্যে উপনীত হইব।

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমি প্রাণস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণে জানিয়াছি—দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার শরীর এই নিরবচ্ছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তিত হইতেছে; সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব)-জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়া যাইবেই; কারণ ঐ বিজ্ঞান তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। যথা—রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূলপদার্থ আবিষ্কার করে, যাহা হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা চরম উন্নতি লাভ করিল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলিয়া 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভা

াধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাবায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।

এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞলোকদের ধর্ম ম্বন্ধে আলোচনা করি। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ াই। প্রতি দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে ়নিতে পাইবে পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সর্বব্যাপিত্ব র্যন্ত আরোপ করিতেছে। ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন দব-বিশেষের প্রাধান্যবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে না। গালাপকে যে-কোন অন্য নামই দাও না কেন, তাহার সুগন্ধ সমানই াকিবে। সংজ্ঞা বা নাম দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না।

মনে পড়ে, বাল্যকালে একদা এক খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ভারতে এক ভিড়ের ধ্যে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দ্বারা াঘাত করি, তবে উহা আমার কি করিতে পারে?' জনতার মধ্য হইতে কজন বলিল, 'আমি যদি তোমার ভগবান্‌কে গালাগালি দিই, তিনিই । আমার কি করিতে পারেন?' পাদ্রী উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর পর তোমার াস্তি হইবে।' সেই ব্যক্তিও বলিল, 'তুমি মরিলে পর আমার দেবতাও তামাকে শাস্তি দিবেন।'

ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে, যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, াহাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়: পাপ ইতে কি কখন পবিত্রতা জন্মিতে পারে?

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা কন গির্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন াকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি রহিয়াছে কন? প্রোটেস্টাণ্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব কেন? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবন-রণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময় রূপ-বিশেষের সাহায্য না

লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাবানুষঙ্গ-নিয়মানুসারে জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদিত হয়। এইজন্য হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্য প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্য দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই মতো জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলতো, 'সর্বব্যাপী' বলিতে অধিকাংশ মানুষ—প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়া থাকে? ইহা একটি শব্দমাত্র—একটি প্রতীক। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি না থাকে, তবে 'সর্বব্যাপী' শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয়, এই পর্যন্ত।

যখন দেখিতেছি—যেভাবেই হউক—মানুষের মনের গঠনানুসারে অনন্তের ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত, তেমনি আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। হিন্দুরা পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেহ কেহ সমগ্র জীবন স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের গণ্ডিবদ্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়া দেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন না; তাহাদের নিকট কয়েকটি মতে সম্মতি দেওয়া এবং লোকের উপকার করা ভিন্ন ধর্ম আর কিছুই নয়। কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন: 'বাহ্যপূজা—মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা'[১]। যে একাগ্র সাধক জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য কর—তিনি তোমাকে কি বলেন, 'সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারা এবং এই বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই অগ্নি

১ মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।১২

াহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? ইহারা সকলেই তাঁহার আলোকে কাশিত।'[১] তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে াপ বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া ীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। দ্ধের পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বলা কি উচিত হইবে?

হিন্দুধর্মে বিগ্রহ-পূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয়। কিন্তু কেহ দি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা ইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার—উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান্ সূর্যে উপনীত হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন: আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহায্য যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহা নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই

১ কঠ, উপ., ২।২।১৫; শ্বেঃ, ৬।১৪, মুঃ, ২।২।১০

এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক। যাহাদের পক্ষে ইহা আবশ্যক নয়, তাহাদের বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহা অন্যায়।

আর একটি বিষয় বলা আমার অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিও, তাঁহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু—চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্বলিত করে না; ইহাকে যদি তাহার দুর্বলতা বলো, সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য-স্বরূপ—দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন—আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসিতেছে। সকলের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্য বিভিন্নতা প্রয়োজন। কিন্তু সব-কিছুরই অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বলিয়াছেন: সূত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, আমিও সেইরূপ সকল ধর্মের [illegible]স্যূত। যাহা কিছু অতিশয় পবিত্র ও প্রভাবশালী, মানবজাতির উন্নতিকারক ও পাবনকারী, জানিবে—সেখানে আমি আছি।[১] এই শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়। ব্যাস বলিতেছেন, 'আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।'

১ তুলনীয় গীতা, ৭।৭, ১০।৪১

আর একটি কথা। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে ঈশ্বর-পরায়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহান্ কেন্দ্রীয় তত্ত্ব—মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করার দিকেই তাঁহাদের ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। তাঁহারা 'জগৎপিতা'-কে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে) দেখিয়াছেন, এবং যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে।[১]

ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু তাহার সব পরিকল্পনা হয়তো কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্ট-ভক্ত, সাধু অসাধু—সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির উর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন, সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সশ্রদ্ধ ভয়ে দণ্ডায়মান—সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অনুবর্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভা

১ Bible

ঐ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনা মাত্র। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন—সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা', তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল—কখনও উজ্জ্বল, কখনও অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহা পশ্চিম গগনের দিকে চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্ব গগনে স্যানপোর[1] সীমান্তে উহা উদিত হইতেছে।

স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া,[2] তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত নিমজ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ-রূপ ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

---

১ ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম।

২ কলম্বস কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম—কলম্বিয়া।

খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন ?

[২০ সেপ্টেম্বর, দশম দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ]

খ্রীষ্টানদের সর্বদাই স্পষ্ট কথার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত; এবং আমার বোধ হয়, যদি আমি তোমাদের একটু সমালোচনা করি, তাহাতে কিছু মনে করিবে না। তোমরা খ্রীষ্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে খুব উদ্‌গ্রীব, কিন্তু বলো দেখি, অনাহার দুর্ভিক্ষের কবল হইতে তাহাদের দেহগুলি বাঁচাইবার জন্য কোন চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টানেরা কিছুই কর নাই! তোমরা ভারতে সর্বত্র গির্জা নির্মাণ কর, কিন্তু প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব—ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা। ভারতে যদি কেহ পারিশ্রমিক লইয়া ধর্মপ্রচার করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম, খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষরূপে তাহা উপলব্ধি করিতেছি।

[ইহার পর সনাতনধর্মের পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করিলেন।]

২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্মের বিষয়ই অধিক বলা হইয়াছিল। সেই দিবস স্বামী বিবেকানন্দ সনাতনধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। নানামতাবলম্বী নরনারীগণ তাঁহাকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শত শত ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ অতি নিপুণতার সহিত সেই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন। সেদিন তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এতদূর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সনাতনধর্ম সম্বন্ধে আর একদিবস অন্যত্র বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন।

বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ

[২৬'শ সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান্ গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে। আপনারা এইমাত্র শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিতে উঠিতেছি, কিন্তু আমি চাই তাহা পূর্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন; যাঁহাকে আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টান ধর্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমরা—হিন্দুরা দেখাইতে চাই, তাহা প্রধানত এই: শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মতো তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ অর্থাৎ ইহুদীরাই তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যগণই তাঁহার শিক্ষার

র্ম বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীরা যেমন (যীশুর মধ্যে) ওল্ড টেস্টামেণ্টের পূর্ণ রিণতি বুঝিতে পারে নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের ত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারে নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি: াক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিগত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ।

হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতিভেদ নাই। ভারতে উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন—ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; শুধু তাই নয়, ধর্মান্তরিত-করণের ভাব তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে।

সকলের প্রতি—বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা ছিল না। ইহা সে সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান, তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, 'আমি দরিদ্রের জন্য—জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব'। আজ পর্যন্ত তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত।

দর্শনশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে।

দর্শনশাস্ত্রের দিক দিয়া সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন শৈলের অভিমুখে সবেগে পতিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেন

না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনারী সকলে সাদরে ধরিয়া থাকে, তাঁহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপহৃত করিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ বলেন।

কিন্তু এইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই সমাজ-সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিককে বলিতে হইয়াছে: কোন হিন্দু মিথ্যা বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী—এ-কথা শোনা যায় না।

সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন:

হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন—আমাদের এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্যই আজ ভারতবর্ষ ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাসী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে। অতএব এস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্ আত্মা এবং অসাধারণ লোক-কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই।



স্বামীজীর ধর্ম-মহাসভায় প্রবেশ, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

বিদায়

[২৭শে সেপ্টেম্বর, সপ্তদশ (শেষ) দিবসের অধিবেশন]

বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন এখন সত্যই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে ; এবং হারা এই মহাসভা-অধিবেশনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, করুণাময় শ্বর তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে াফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

যাঁহারা প্রশস্ত হৃদয় এবং সত্যানুরাগ লইয়া স্বপ্নের ন্যায় এই আশ্চর্য াপার প্রথমতঃ কল্পনা করিয়া পরে কার্যে পরিণত করিয়াছেন, আমি সেই হানুভব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ দিই। এই সভামঞ্চ হইতে যে-সকল উদার াব পরিবেশিত হইয়াছে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী ামার প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-ভাবগুলি দ্বারা র্মসমূহের বিরোধভাব মন্দীভূত হয়, সেই ভাবগুলির প্রত্যেকটি তাঁহারা পলব্ধি করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। এই কতানের মধ্যে সময় সময় কিছু শ্রুতিকটু ধ্বনি শোনা গিয়াছে, ঐগুলির ন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, কারণ বিশেষ বৈষম্যদ্বারা উহারা ামাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে যে সাধারণ মঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে।

ধর্মীয় ঐক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ামি এখনই এ-বিষয়ে আমার নিজের মতবাদ উপস্থাপন করিতেছি না। ন্তু যদি এখানে কেহ এরূপ আশা করেন যে, এই ঐক্য—প্রচলিত বিভিন্ন র্মের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা সাধিত হইবে, াহাকে আমি বলি, 'ভাই, এ তোমার দুরাশা।' আমি কি ইচ্ছা করি যে, ষ্টান হিন্দু হয় ?—ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন ন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হউক ?—ভগবান্ তাহা না করুন।

বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল ; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। জটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া য় ?—না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে জের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা বায়ু ও জল ভিতরে

গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে বাড়িয়া উঠে।

ধর্মসম্বন্ধেও ঐরূপ। খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।

যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই: ইহা প্রমাণ করিয়াছে—সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতিরই মধ্যে অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র, তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় লোকেদের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে: 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

পরিশিষ্ট

চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে ামীজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন :

(১) শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তদর্শন

—শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূর্বাহ্ণ ১০॥টায়।

(২) ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ

—শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ণ অধিবেশন।

(৩) পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয়-সম্বন্ধে

—শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর।

(৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ

—সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর।

'The Chicago Daily Inter-Ocean' সংবাদপত্র ২৩শে সেপ্টেম্বর থম বক্তৃতা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :

ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে গতকাল পূর্বাহ্ণে স্বামী বিবেকানন্দ াস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৩ নং হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ; াতৃবৃন্দ শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং সন্ন্যাসিপ্রবর অপূর্ব দক্ষতার সহিত াঞ্জলভাবে ঐগুলির উত্তর দেন। অধিবেশনের শেষে আগ্রহান্বিত জিজ্ঞাসুরা াহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধে কোথাও একটি ছোট সভায় কৃতা দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনাটির থা ইতিপূর্বেই তাঁহার মনে উঠিয়াছে।

প্রাচ্য নারী

চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভার 'মহিলা পরিচালক বোর্ড'-এর অধ্যক্ষা মিসেস পটার পামার কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় চিকাগোর জ্যাক্‌সন স্ট্রীটে মহিলা-সদনে স্বামীজী এই বক্তৃতা দেন। 'Chicago Daily Inter-Ocean' সংবাদপত্রে ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়:

স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন: কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী-পুরুষের মর্যাদায় কোন পার্থক্য ছিল না; পূর্ণ সমতার ভাব বিরাজিত ছিল। কোন হিন্দুও বিবাহিত না হইলে পুরোহিত হইতে পারে না; ভাবটা এই যে, অবিবাহিত ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দুনারীর জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব। পত্নী যেন বৃত্তের কেন্দ্র—ঐ কেন্দ্রের স্থিরত্ব নির্ভর করে—তাহার সতীত্বের উপর। এই আদর্শের চরম অবস্থায় হিন্দু বিধবারা সহমরণে দগ্ধ হইতেন। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশী ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না। যদি আমরা চরিত্রের ঐ-সকল সদ্‌গুণ রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ হিন্দুনারী জগতের আদর্শস্থানীয়া হইবেন।

ধর্মীয় ঐক্যের মহাসম্মেলন

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 'Chicago Sunday Herald' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

এই ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা, কারণ আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান—এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর স্বীকার করে না। যদি আমরা এই-সকল সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে রাখিতে না চাই—সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন হইবে না—তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আমাদের মিলনভূমি প্রশস্ত করিতেই হইবে। এই ধর্ম-মহাসভায় আরও বলা হইয়াছে—মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা আমাদের কর্তব্য, কারণ প্রত্যেক অসৎ ও হীন কার্যেরই প্রতিক্রিয়া আছে। আমার মনে হয়, এটি দোকানদারির ভাব : আমরাই প্রথমে, তারপর আমাদের ভাই-এরা। আমি মনে করি, ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্বে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, ভাইকে আমাদের ভালবাসিতেই হইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক মত মানুষের দিব্যভাব স্বীকার করে; কাহারও অনিষ্ট করিও না, তাহা হইলে তাহার অন্তরস্থ দিব্যভাবকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

ভগবৎপ্রেম

[২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 'Chicago Herald' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী]

লাফলিন ও মনরো স্ট্রীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতা-গৃহে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভগবৎপ্রেম; আলোচনা বাগ্মিতাপূর্ণ ও অপূর্ব হইয়াছিল। তিনি বলেন:

ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান্ ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সৎকার্যে প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ।

বক্তা চিকাগোতে আসা অবধি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন—আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বরপ্রেম হইতে সঞ্জাত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। বক্তা বলেন:

তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্বতগুহায় রাত্রি কাটাইয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বে এমন কিছু আছে, যাহা মানুষকে অসত্য বা অন্যায় হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা ঈশ্বরপ্রেম। ঈশ্বর যদি যীশু, মহম্মদ এবং বৈদিক ঋষিগণের সহিত কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঈশ্বরেরই অন্যতম সন্তান—তাঁহার সহিতও তিনি কেন কথা বলেন না?

স্বামী আরও বলিলেন: সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তাঁহার সকল সন্তানের সহিত কথা বলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি এবং তাঁহার প্রেমের সীমাহীনতা দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হই এবং সেই প্রেম হইতে আমাদের মঙ্গল ও শুভকর্মের প্রেরণা লাভ করি।

কর্মযোগ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় নয় বৎসর পূর্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ নামক গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ করি, তখন ধারণা ছিল যে, আমেরিকান সংস্করণখানিই উৎকৃষ্টতর; সুতরাং তদবলম্বনেই অনুবাদ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে আদ্যোপান্ত সংশোধনের ইচ্ছা থাকিলেও অন্যান্য কার্যবশতঃ সময়াভাবে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই। অনেক দিন ধরিয়া তজ্জন্য উহা অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উহা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত-ভাবেই পুনর্মুদ্রিত করা হয়। সম্প্রতি একটু অবকাশ পাইয়া মাদ্রাজ-সংস্করণের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম—মাদ্রাজ-সংস্করণে আমেরিকান সংস্করণ অপেক্ষা এত অধিক নূতন বিষয় আছে যে, বলা যায় না। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানির্বাণতন্ত্র হইতে বিস্তৃত উদ্ধৃতাংশ ও উহার উপর স্বামীজীর মন্তব্যসমূহ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'প্রতীক'-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই দুই সংস্করণের অনেক স্থলে এত পাঠান্তর যে, অনুবাদককে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। অগত্যা আমরা মাদ্রাজ-সংস্করণে প্রাপ্ত প্রায় সমুদয় অতিরিক্ত অংশগুলির অনুবাদ বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম এবং পাঠান্তর-স্থলে উভয় সংস্করণের তুলনা করিয়া যেটি স্পষ্টতর বোধ হইল, সেইটির অনুবাদ করিয়া দিলাম। এতদ্ব্যতীত পূর্বানুবাদের ভ্রম বা ভাষার ত্রুটিসমূহ কতক কতক সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সুতরাং কর্মযোগের এই তৃতীয় সংস্করণকে পূর্ব পূর্ব সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইতি—

আষাঢ়, ১৩১৬ — বিনীতানুবাদকস্য

কর্ম—চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব

(কর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'কৃ'-ধাতুর অর্থ 'করা'; যাহা কিছু করা হয়, তাহাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ 'কর্মফল'। দার্শনিকভাবে ব্যবহৃত হইলে কখন কখন উহার অর্থ হয়—সেই-সকল ফল, আমাদের পূর্ব কর্ম যেগুলির কারণ। কিন্তু কর্মযোগে আমাদের 'কর্ম' শব্দটি কেবল 'কাজ' অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে। মানবজাতির চরম লক্ষ্য—জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই একমাত্র লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। সুখ ও আনন্দ তো শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য—এরূপ মনে করা ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ—মানুষ অজ্ঞের মতো মনে করে, সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। কালে মানুষ বুঝিতে পারে, সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও সুখ উভয়েই তাহার মহান্ শিক্ষক, সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তেমন শিক্ষা পায়। সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এই চিত্রসমষ্টি বা সংস্কার-সমষ্টির ফলকেই আমরা মানুষের 'চরিত্র' বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে, উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের প্রবৃত্তি—মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টিমাত্র। দেখিবে, সুখ-দুঃখ—দুই-ই সমভাবে তাহার চরিত্রগঠনের উপাদান, চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভাল-মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে—ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।)

এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—মানুষ 'আবিষ্কার করে' (discovers)

বা 'আবরণ উন্মোচন করে' (unveils)। মানুষ যাহা 'শিক্ষা করে', প্রকৃতপক্ষে সে উহা 'আবিষ্কার করে'। 'Discover' শব্দটির অর্থ—অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। মানুষ যতপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ—উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-স্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজের মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতর পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরা আর একভাবে সাজাইয়া উহাদের ভিতর একটি নূতন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিলেন; উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব লৌকিক বা পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, বরং আবৃত থাকে; যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি, 'আমরা শিক্ষা করিতেছি', এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবরণ যাঁহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাহার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান; আর যে ব্যক্তি হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ, জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্য সম্বন্ধেও সেইরূপ; যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি, তবে দেখিব, আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি —সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা আমাদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত;

এই আঘাত-সমষ্টিকেই বলে ‘কর্ম’। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বাহির করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে-কোন মানসিক বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়, তাহাই কর্ম; ‘কর্ম’ অবশ্য এখানে উহার ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করিতেছি। আমি কথা বলিতেছি—ইহা কর্ম। তোমরা শুনিতেছ—তাহাও কর্ম। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছি—ইহা কর্ম, বেড়াইতেছি—কর্ম, কথা কহিতেছি—কর্ম, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা করি, সবই কর্ম। কর্ম আমাদের উপর উহার ছাপ রাখিয়া যাইতেছে।

(কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি আমরা সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া শৈলখণ্ডের উপর তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনি শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্দ বলিয়া বোধ হয়! কিন্তু তবু আমরা জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি। উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা আমরা শুনিতে পাই না; যখন উহারা একত্র হইয়া প্রবল হয়, তখনই আমরা শুনিতে পাই। এইরূপে হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে। কতকগুলি কার্য আমরা বুঝিতে পারি, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ধরা দেয়; তাহারা কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না। অবস্থা-বিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ—সে কি ভাবে করিতেছে; এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা উপলক্ষে অতিসামান্য লোকও মহত্ত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার।)

মানুষকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি সে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, ঐ কেন্দ্রেই উহাদিগকে দ্রবীভূত করিয়া একাকার করিতেছে, তাহার পর একটি বৃহৎ তরঙ্গাকারে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ একটি কেন্দ্রই প্রকৃত মানুষ, তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ; আর তিনি তাঁহার নিজের

দিকে সমগ্র জগৎ আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ—সবই তাঁহার দিকে চলিয়াছে এবং তাঁহার চতুর্দিকে সংলগ্ন হইতেছে। তিনি ঐগুলির মধ্য হইতে 'চরিত্র'-নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়া উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ বাহিরে প্রক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে।

আমরা জগতে যতপ্রকার কার্য দেখিতে পাই, মনুষ্য-সমাজে যতপ্রকার আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কার্য হইতেছে, সবই চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, রণতরী—সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা চরিত্র হইতে উদ্ভূত, চরিত্র আবার কর্মদ্বারা নির্মিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ। প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে-সকল মানব জগতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে ওলট-পালট করিয়া দিতে পারিতেন। ঐ শক্তি তাঁহারা যুগযুগব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মতো প্রবল ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ করা যায় না, আর উহাকে পুরুষানুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারও (hereditary transmission) বলা যায় না; কারণ আমরা জানি তাঁহাদের পিতারা কিরূপ ছিলেন। তাঁহারা যে জগতের হিতের জন্য কখন কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। যোসেফের ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূত্রধর জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ এখনও জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন। যদি ইহা কেবল পুরুষানুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র সামান্য রাজা—যাঁহাকে হয়তো তাঁহার ভৃত্যেরা পর্যন্ত মানিত না, তিনি কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, যাঁহাকে জগতের অর্ধেক লোক উপাসনা করিতেছে? সূত্রধর ও তাহার সন্তান—যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে—এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশানুক্রমিক মতবাদ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয় না। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য উহা যুগযুগান্তর হইতে ঐ স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর

হইতেছিল। অবশেষে উহা বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্তির আকারে সমাজে আবির্ভূত হইল। এখনও ঐ শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

এই সবই কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপার্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা কখন কখন মনে করিতে পারি, ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে দৃঢ়বিশ্বাসী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সারা জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিতে পারে, এ জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাহার নিকট জীবন কষ্টকর ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ কর্মের দ্বারা যাহা উপার্জন করি, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার। একজন নির্বোধ জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহার পুস্তকাগারে পড়িয়া থাকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়িতে পারিবে, এবং এই যোগ্যতা কর্ম হইতে উৎপন্ন। আমরা কিসের অধিকারী এবং আমরা কি আয়ত্ত করিতে পারি, আমাদের কর্মই তাহা নিরূপণ করে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের বর্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাহা হইতে পারি। অতএব আমাদের জানা উচিত কিরূপে কর্ম করিতে হইবে। তোমরা বলিবে, 'কর্ম কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই তো কোন-না-কোন ভাবে এই জগতে কাজ করিতেছে।' কিন্তু 'শক্তির অনর্থক ক্ষয়' বলিয়া একটি কথা আছে। গীতায় এই কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, 'কর্মযোগের অর্থ কর্মের কৌশল—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কর্মানুষ্ঠান।' কর্ম কি করিয়া করিতে হয়—জানিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, সকল কর্মের উদ্দেশ্য—মনের ভিতরে পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আছে।

এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার ঐ মহাশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতস্বরূপ।

মানুষ নানা উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকে। কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য হইতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাহারা যশের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহারা অর্থের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ প্রভুত্ব চায়, তাহারা প্রভুত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে স্বর্গে যাইতে চায়, তাহারা স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর নিজেদের নাম রাখিয়া যাইতে চায়। চীনদেশের রীতি—না মরিলে কাহাকেও কোন উপাধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষাকৃত ভাল প্রথা বলিতে হইবে। চীনে কোন লোক খুব ভাল কাজ করিলে তাহার মৃত পিতা বা পিতামহকে কোন সম্মানজনক উপাধি প্রদান করা হয়। কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে। কোন কোন মুসলমান-সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরে সমাহিত হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কার্য করিয়া থাকে। আমি এমন কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা জানি, যাহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমাধি-মন্দির নির্মিত হইতে থাকে; ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম এবং ঐ সমাধি-মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্যক্তি ততই ধনী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ম করিয়া থাকে; সর্ববিধ অসৎ কার্য করিয়া শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাহাদিগকে দিল। তাহারা মনে করে, এরূপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিষ্কার হইল, পাপ সত্ত্বেও তাহারা শাস্তি এড়াইয়া যাইবে। মানুষের কার্য-প্রবৃত্তির বহু উদ্দেশ্যের কয়েকটি মাত্র বলা হইল।

কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহাদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর; তাঁহারা কর্মের জন্যই কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রাহ্য করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়াই তাঁহারা কর্ম করেন। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিদ্রের উপকার ও

ন্ত্র-জাতিকে সাহায্য করেন; কারণ তাঁহারা সৎকার্যে বিশ্বাসী, তাঁহারা ভাব ভালবাসেন। নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে ওয়া যায় না; সচরাচর দেখা যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের বন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম-যশ হয়। কিন্তু যদি হ কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না? , সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে। নিঃস্বার্থ কর্মেই অধিক লাভ, তবে হা অভ্যাস করিবার সহিষ্ণুতা মানুষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা শী লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থপরতা—এগুলি শুধু নীতি-সম্বন্ধীয় ালঙ্কারিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ; কারণ এগুলির মধ্যেই হতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ িনিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্তা—স্বর্গলাভের াকাঙ্ক্ষা, শাস্তির ভয় অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কাজ করিতে ারেন, তাঁহার মধ্যে শক্তিমান্ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব ার্যে পরিণত করা কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আমরা উহার ল্য জানি, জানি উহা কত শুভফলপ্রসূ। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ কাশ। সমুদয় বহির্মুখ কার্য অপেক্ষা আত্মসংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ। তুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাধা না পাইয়া পাহাড়ে ঢালু পথে গড়াইয়া াইতেছে, অথবা শকটচালক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে—ইহাদের মধ্যে কান্‌টি অধিকতর শক্তির বিকাশ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উহাদিগকে ংযত করা? একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া ড়ে, অন্য একটি গোলা দেয়ালে লাগিয়া বেশী দূরে যাইতে পারে না, কিন্তু ই সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমুদয় বহির্মুখ শক্তি ার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, ঐগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া াসিয়া তোমার শক্তি-বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু ঐগুলিকে সংযত রিলে তোমার শক্তি বর্ধিত হইবে। এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত ইবে; উহা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মতো চরিত্র সৃষ্টি করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রহস্য ানে না, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি ানে না যে, সে যদি কাজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষা করে, তবে সমুদয় জগৎ াসন করিতে পারে। সে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুক, এবং এই অজ্ঞানসুলভ

জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক। ঐ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গেলেই সে জগ শাসন করিতে পারিবে। অনেক পশু যেমন কয়েক পদ অগ্রে কি আছে তাহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই তেমনি অল্প কয়ে বৎসর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমর যেন একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ—ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহা বাহিরে আর কিছুই দেখিবার ধৈর্য আমাদের নাই, এইভাবেই আমর অসাধু ও দুর্বৃত্ত হইয়া পড়ি। ইহাই আমাদের দুর্বলতা—শক্তিহীনতা।

কিন্তু অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি উচ্চত উদ্দেশ্যে কাজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই—নামযশের জন্যই কা করুক। প্রত্যেককে—সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রস হইতে হইবে, এবং ঐগুলি কি—তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 'কর্মে আমাদের অধিকার, ফলে নয়'—ফল যাহা হইবার হউক। ফলের জন্য চিন্ত কর কেন? কোন লোককে সাহায্য কবিবার সময় তোমার প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও না। তুমি যদি কো মহৎ বা শুভ কার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইও না।

কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। তীব্র কর্মশীলতার প্রয়োজন; সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আমরা এক মিনিটও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন সংগ্রামের একদিকে কর্ম—যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘূর্ণিত, আর একদিকে সব ধীর স্থির; সবই যেন নিবৃত্তি-উন্মুখ, চারিদিক শান্তিময়—কোনরূপ শব্দ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্তু বৃক্ষগুল্ম পর্বতরাজি-সমন্বিত প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই দুটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর সমুদ্রের মৎস্য উপরে আসিবামাত্র খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়—কারণ জলের প্রবল চাপেই উহা জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার যে-ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্ম

বং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনি সংযমের রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্মসংযম করিয়াছেন। যানবাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। কর্মযোগের ইহাই আদর্শ। যদি এই অবস্থা লাভ করিতে পারো, তবেই কর্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হইবে।)

কিন্তু আমাদিগকে গোড়া হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও অধিক নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ, কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন আমরা সত্যই নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমরা সেই অবস্থা লাভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়

সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত—সংস্কৃত ভাষায় ঐ উপাদান-ত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহ্যজগতে ইহাদের প্রকাশকে আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলতা ও জড়তা বলিতে পারি। তমোগুণের লক্ষণ অন্ধকার বা কর্মশূন্যতা; রজঃ—কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত, আর সত্ত্ব—ঐ দুই গুণের সাম্যাবস্থা।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে। কখন তমঃ প্রবল হইয়া উঠে—আমরা আলস্যপরায়ণ হই, আমরা যেন আর নড়িতে পারি না, নিষ্কর্মা হইয়া যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আবার কখন কখন কর্মশীলতা প্রবল হয়। অন্য সময়ে আবার উভয় ভাবের সাম্য বিরাজ করে, মনে শান্ত ভাব আসে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে সচরাচর এই উপদান-ত্রয়ের কোন একটির প্রাধান্য দেখা যায়। একজন হয়তো কর্মশূন্যতা, আলস্য ও জাড্যলক্ষণান্বিত; অপরের প্রধান লক্ষণ—কর্মশীলতা, শক্তি, মহাশক্তির বিকাশ; আবার কাহারও ভিতর আমরা শান্ত মৃদুমধুর ভাব দেখিতে পাই—ইহা ঐ পূর্বোক্ত গুণদ্বয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার সামঞ্জস্য। এইরূপে সমুদয় সৃষ্ট জগতে—পশু উদ্ভিদ মানুষ—সকলের মধ্যেই আমরা এই বিভিন্ন শক্তির কম-বেশী প্রকাশ দেখিতে পাই।

এই ত্রিবিধ গুণ বা উপাদানই বিশেষভাবে কর্মযোগের আলোচ্য বিষয়। উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়া কর্মযোগ আমাদিগকে ভাল-ভাবে কর্ম করিতে সাহায্য করে। মানবসমাজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংগঠন। উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীতে ও বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত। সুনীতি ও কর্তব্য কাহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দেখিতে পাই—ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন। এক দেশে যাহা সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো তাহা সম্পূর্ণ দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—কোন কোন দেশে জ্ঞাতি-ভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহা অতিশয় নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষ নিজ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ

করিতে পারে, অপর দেশে উহা নীতি-বিরুদ্ধ। কোন দেশে একবার মাত্র বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইরূপে আমরা সদাচারের অন্যান্ত বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, তথাপি আমাদের ধারণা—সদাচারের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে।

কর্তব্য-সম্বন্ধেও এইরূপ। কর্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন। কোন দেশে যদি কেহ কার্যবিশেষ না করে, লোকে বলিবে সে অন্যায় করিয়াছে; অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্যগুলি করিলেই লোকে বলিবে, সে ঠিক করে নাই। তথাপি আমরা জানি, কর্তব্যের একটি সর্বজনীন ধারণা অবশ্যই আছে। এইরূপে সমাজ এক শ্রেণীর কার্যবিশেষকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে, অপর এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে এবং ঐরূপ কার্য করিতে হইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি পথ খোলা: অজ্ঞ লোকের পথ, তাহারা মনে করে, সত্যলাভের পথ মাত্র একটি, আর সব পথ ভুল; আর একটি জ্ঞানীদের পথ, তাঁহারা স্বীকার করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথবা অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্তব্য ও সদাচারের ক্রম আছে; জীবনের এক অবস্থায়—এক পরিবেশে যাহা কর্তব্য, অপর অবস্থায়—অন্যরূপ পরিবেশে তাহা কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে না।

উদাহরণ: সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ—অশুভের প্রতিরোধ করিও না, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সমুদয় সমাজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে—আমাদের লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। মাত্র একটি দিন যদি এইরূপ 'অপ্রতিকার-নীতি' কার্যে পরিণত করা হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ ধরিবে। তথাপি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে 'অপ্রতিকার'-রূপ উপদেশের সত্যতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহাকে আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কেবল ঐ মত প্রচার করিলে মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হয়। শুধু তাহাই নয়, উহাতে তাহাদের বোধ হইবে যে, তাহারা সর্বদাই অন্যায় করিতেছে এবং

তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে। ইহা তাহাদের দুর্বল করিয়া দিবে, এবং অন্যান্য দুর্বলতা অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইরূপ আত্মগ্লানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে। যে-ব্যক্তি নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য।

আমাদের প্রথম কর্তব্য—নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথম নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, তাহার কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিতে পারে না।

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্যায় করা হইল—তাহা নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের কর্তব্য হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে তোমরা অনেকে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া হয়তো আশ্চর্য হইয়াছ ; বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং 'অহিংসাই পরম ধর্ম' এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে—প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে কাপুরুষ ও কপট বলিয়াছেন। এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রান্ত-দুইটি দেখিতে একই প্রকার। চূড়ান্ত 'অস্তি' ও চূড়ান্ত 'নাস্তি' সকল সময়েই সদৃশ। আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতি দ্রুত কম্পনও আমরা দেখিতে পাই না। শব্দ সম্বন্ধেও ঐরূপ ; অতি নিম্নগ্রামের শব্দ শুনা যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্দও শুনা যায় না। 'প্রতিকার' ও 'অপ্রতিকারে' প্রভেদও এইরূপ। একজন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম ; প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছা করিলে সে দুর্নিবার আঘাত হানিতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত করে না—তাহা নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুর্বলতাবশতঃ 'প্রতিকার' করে না, সে পাপ করিতেছে ; সুতরাং এই 'অপ্রতিকার' হইতে সে কোন সুফল অর্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে। বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ

রিলেন—ইহা প্রকৃত ত্যাগ বটে ; কিন্তু যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই, ন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অতএব এই প্রতিকার' ও 'আদর্শ প্রেমের' কথা বলিবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে কি ঝিতেছি, সেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আগে সযত্নে বুঝিতে হবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। শক্তি থাকা ত্বও যদি প্রতিকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের াজ করিতেছি ; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, বং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্ররণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই রিতেছি। অর্জুনও তাঁহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্যব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ভীত ইয়াছিলেন। 'স্নেহ-ভালবাসা'-বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি র্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কপট বলিতেছেন ; াণ্ডিতের মতো কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতো কাজ করিতেছ ; ঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।'[১]

ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই র্বোচ্চ আদর্শ—তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ বং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের াপানমাত্র। এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য— শুভের প্রতিরোধ করা। কাজ করিতে হইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে, -যতদূর সাধ্য উত্তম প্রকাশ করিয়া আঘাত করিতে হইবে। এই তিকারের শক্তি যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম া পুণ্যকর্ম।

আমার দেশে একবার একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে র্ব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়া জানিতাম, কিছু জানিবার ন্য তাহার কোন আগ্রহ ছিল না—সে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিল। ামার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঈশ্বর লাভের জন্য ামাকে কি করিতে হইবে, কি উপায়ে আমি মুক্ত হইব?' আমি তাহাকে

১ তুলনীয়ঃ গীতা—২।১১, ৩৭

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পারো কি?' সে বলিল, 'না' তখন আমি বলিলাম, 'তবে তোমায় মিথ্যা বলিতে শিখিতে হইবে। একটা পশুর মতো বা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মতো জড়বৎ জীবনযাপন করা অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভাল। তুমি অকর্মণ্য; কর্মের অতীত যে-অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করে এবং যাহা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তাহা লাভ কর নাই। তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কাজও করিতে পার না।' অবশ্য যে-লোকটির কথা বলিতেছি, তাহার মতো তামসিক প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আমি তাহার সহিত মজা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করিতে হইলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

আলস্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলতা অর্থে সর্বদা 'প্রতিরোধ' বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্‌ভাবের প্রতিরোধ কর; যখন তুমি এই কার্যে সফল হইবে, তখন শান্তি আসিবে। এ-কথা বলা অতি সহজ যে, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কোন অমঙ্গলের প্রতিকার করিও না'; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার কি অর্থ দাঁড়ায়, তাহা আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমরা 'অপ্রতিকারের' ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসনা দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের ন্যায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে। যথার্থ অপ্রতিকার হইতে প্রাপ্ত যে শান্তি আসে, আমরা তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি; মনে হয়—প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাসনা থাকে, এবং যদি তুমি জানো যে, সমগ্র জগৎ ধনলিপ্সু পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়া মনে করে, তবে তুমি হয়তো অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হইবে না, কিন্তু তোমার মন দিবারাত্রি অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে। এরূপ ভাব কপটতা মাত্র, ইহা দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয় না। সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, কিছুদিন পরে যখন সংসারে সুখ দুঃখ—যাহা কিছু আছে ভোগ করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে—তখনই শান্তি আসিবে। অতএব প্রভুত্বলাভের বাসনা এবং অন্য যাহা কিছু বাসনা আছে, সবই পূরণ করিয়া লও; এই-সকল বাসনা পূর্ণ হইলে পর এমন এক সময়

াসিবে, যখন জানিতে পারিবে—এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিস। কিন্তু ভদিন না তোমার বাসনা.পূর্ণ হইতেছে, যতদিন না তুমি এই ক্রিয়াশীলতার ্য দিয়া যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আত্মসমর্পণের ও বরাগ্যের ভাব লাভ করা অসম্ভব। এই 'প্রশান্তি' সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চারিত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে ইহা শুনিয়া াসিতেছে, তথাপি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব ম দেখিতে পাই। আমি তো অর্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু ামার জীবনে যথার্থ শান্ত ও প্রতিকারচেষ্টাশূন্য কুড়িজন মানুষ দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।)

((প্রত্যেকেরই কর্তব্য—নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। পর ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাই ন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়তো ীবনে কখনই পরিণত করা সম্ভব হইবে না। মনে কর, আমরা একটি শিশুকে কেবারে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করিতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মরিয়া াইবে, নয় তো হাজারে একজন বড় জোর ঐ কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে ামাগুড়ি দিয়া অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবে। সচরাচর আমরা মানুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। কোন সমাজে সকল নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ নয়; তাহাদের আদর্শগুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। ওক বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার করা আবশ্যক।))

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম। ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী সৃষ্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য মাত্র। এই কারণে একই আদর্শ দ্বারা সকলকে বিচার করা অথবা সকলের সম্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করা উচিত নয়। এইরূপ কর্ম

প্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম সৃষ্টি করে। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ধার্মিক ও সৎ হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। (আমাদের কর্তব্য—প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ আদর্শ সত্যের যতটা নিকটবর্তী হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা।)

আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধর্মনীতিতে এই তত্ত্বটি স্বীকৃত হইয়াছে; তাঁহাদের শাস্ত্রে ও ধর্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানব-সাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ করিতে হয়; তারপর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হয়; বৃদ্ধাবস্থায় হিন্দু গৃহস্থাশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এবং সর্বশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে বড় নয়। যিনি বিবাহ না করিয়া ধর্মকার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যত মহৎ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত মহৎ। সিংহাসনে আরূঢ় রাজা যেরূপ মহান্ ও গৌরবান্বিত, রাস্তার ঐ ঝাড়ুদারও সেইরূপ। রাজাকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাজ করিতে দাও—দেখ, তিনি কতটা পারেন। আবার ঝাড়ুদারকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দাও—দেখ, সে-ই বা রাজকার্য কিরূপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর, এ-কথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস—এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে। গৃহস্থ বিবাহ করেন এবং সামাজিক কর্তব্য করিয়া যান; আর সংসারত্যাগীর কর্তব্য—তাঁহার সমুদয় শক্তি কেবল ধর্মের দিকে নিয়োজিত করা; তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা করিবেন এবং ধর্মশিক্ষা দিবেন।

'মহানির্বাণ-তন্ত্র' হইতে এই প্রসঙ্গে কিছু পড়িব। ঐগুলি শুনিলে তোমরা বুঝিবে গৃহস্থ হওয়া এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করা অতি কঠিন।

> ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
> যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥[১]

—গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞানলাভই যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহাকে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে, তাঁহার নিজের সমুদয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই তাঁহাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।

কর্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হইতে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অথচ উহাতে নাম-যশ হইল বা না হইল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া —এইটিই এ-জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য করিতে পারে, কিন্তু কাহারও স্তুতি-প্রশংসা না চাহিয়া অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়া সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

> ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
> দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥[২]

—গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন উহা সংগ্রহ না করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।

> মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
> মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ॥[৩]

---

১ মহানির্বাণতন্ত্র—৮।২৩   ২ ঐ—৮।২৪   ৩ ঐ—৮।২৫

—মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥[১]

—যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ প্রীত হন। হে পার্বতি, তুমিও তাহার প্রতি প্রীতা হও।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥[২]

—পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখন কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সুসন্তান। পিতামাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবে, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর যতক্ষণ না তাঁহারা বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবে না।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥[৩]

—মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে।

জনন্যা বর্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥[৪]

১ ঐ—৮।২৬ ২ ঐ—৮।৩০-৩১ ৩ ঐ—৮।৩৩-৩৪ ৪ ঐ—৮।৩৬-৩৭

পিতামাতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

ন ভার্যাস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্যং ন দর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্ণা শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥[1]
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্যা পতিব্রতা।
সর্বো ধর্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥[2]

—ভার্যার প্রতিও গৃহস্থের অনুরূপ কর্তব্য আছে: গৃহী ব্যক্তি পত্নীকে কখনও তাড়না করিবে না, তাঁহাকে সর্বদা মাতৃবৎ পালন করিবে, আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ পত্নী বর্তমানে অন্য স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে স্পর্শ করিবেন না। এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জনে শয়ন বা বাস করিবেন না। স্ত্রীলোকের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেন, কখনও তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। হে পার্বতি, যে ব্যক্তির উপর পতিব্রতা ভার্যা তুষ্টা থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ করিয়াছেন এবং তিনি তোমার প্রিয়।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥

১ ঐ—৮।৩৯-৪২ ২ ঐ—৮।৪৪

বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেষয়েদ্ গৃহকর্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥[১]

—পুত্রকন্যার প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এইরূপ: চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত পুত্রগণকে লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত নানাবিধ সদ্‌গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দিবে। বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে, তারপর আত্মতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্নপূর্বক শিক্ষা দিতে হইবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

এবংক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী॥
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥[২]

—গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সন্তোষবিধান করিবেন। তারপর গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন করিবেন। হে দেবি! বিভব সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এরূপ আচরণ না করেন, তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে; তিনি লোকসমাজে নিন্দনীয় ও পাপী।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু॥[৩]

১ ঐ—৮।৪৫-৪৭ ২ ঐ—৮।৪৮-৫০ ৩ ঐ—৮।৫১-৫২

—গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং অশনবসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন—এ-সকলই পরিমিতভাবে করিবে। গৃহস্থ অকপট, নম্র, বাহিরে অন্তরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হইবে।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।[1]

—গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শৌর্য বীর্য অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবে।

শত্রুগণকে বীর্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোণে বসিয়া কাঁদিবে না, অপ্রতিকার-বিষয়ক বাজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ যদি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥[2]

—নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবে না এবং সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিগণের অবমাননা করিবে না।

অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা গৃহীর কর্তব্য নয়; কারণ তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার যাঁহারা সম্মানের যোগ্য, তাঁহাদিগকে যদি গৃহস্থ সম্মান না করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে মহা অন্যায়।

সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥[3]

—একত্রবাস ও সবিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া তবে তাহাদের উপর বিশ্বাস করিবে।

গৃহস্থ যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবে না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে

১ ঐ—৮।৫৩ ২ ঐ—৮।৫৩ ৩ ঐ—৮।৫৪

ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥[১]

—গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন না। নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব করা উচিত নয়। ঐ বিষয় তাঁহার গোপনে রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞতা নয়; যদি কেহ এরূপ না করে, তবে তাঁহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলা যাইতে পারে।

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলম্বন, তিনিই প্রধান ধনোপার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোক—যাহারা (বাহিরের) কোন কার্য করে না—সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি এমন হওয়া উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন যে তিনি নিজ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতেছেন না। এই কারণে—

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥[২]

—যদি গৃহস্থ কোন অন্যায় বা নিন্দিত কার্য করিয়া ফেলে অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, যাহাতে সে জানে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইবে, সে-বিষয়ও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে আত্মদোষ-প্রকাশের কোন প্রয়োজন তো নাই-ই, অধিকন্তু উহাতে নিরুৎসাহ

১ ঐ—৮।৫৬ ২ ঐ—৮।৫৭

জাগিয়া তাহাকে যথাযথ কর্তব্য করিতে বাধা দেয়। সে যে অন্যায় করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ভুগিতেই হইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সে ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য, আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে, তাহাকে তো মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে।

যদি এই শহরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া ধনী না হইতেন, তাহা হইলে এই সভ্যতা—দরিদ্রালয় ও বড় বড় বাড়ি কোথায় থাকিত?

এক্ষেত্রে অর্থোপার্জন অন্যায় নয়, কারণ ঐ অর্থ বিতরণের জন্য। গৃহস্থই জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকার্যে অর্থব্যয় করা তাঁহার পক্ষে উপাসনা, কারণ যে-গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন—সন্ন্যাসী নিজ কুটিরে বসিয়া উপাসনা করিলে উহা যেমন তাঁহার মুক্তিলাভের সহায়তা হয়—সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে; যেহেতু উভয়ের মধ্যেই আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার সবকিছুর উপর ভক্তিভাব-প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাবের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র দেখিতেছি।

বিদ্যাধনযশোধর্মান্ যতমান উপার্জয়েৎ
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যা দ্রোহং পরিত্যজেৎ॥[৪]

—গৃহস্থ যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবে এবং ব্যসন (দ্যূত-

৪ ঐ, ৮।৫৮

ক্রীড়াদি), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করিবে।

অনেক সময় লোকে নিজেদের সাধ্যাতীত কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা করিয়া থাকে। আবার

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টা সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ ॥[১]

—চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত। অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম করিবে। সকল বিষয়েই এই 'সময়ের' দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক সময় যাহা বিফল হইল, আর এক সময়ে হয়তো তাহাতে প্রচুর সাফল্য লাভ হইল।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ ॥[২]

—ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের যশ খ্যাপন করিবেন না এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥[৩]

—যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম-গৃহ ও সেতু নির্মাণ করিয়া সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন। বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই-সকল কর্ম করিয়া সেই পদলাভের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহাই কর্মযোগের এক অংশ—গৃহস্থের কর্তব্য ও কাজকর্ম। উক্ত তন্ত্রগ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়:

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥[৪]

১ ঐ, ৮।৫৯   ২ ঐ, ৮।৬২   ৩ ঐ, ৮।৬৩   ৪ ঐ, ৮।৬৭

-যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত ন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া হস্থের মৃত্যু হয়—যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই দ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের ক্ষে যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহা কর্তব্য নয়; পরন্তু শাস্ত্র কোনটিকেই ীন বা উন্নত বলিতেছেন না। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য হিয়াছে এবং আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপযোগী কর্তব্য ালন করিতে হইবে।

এই সমুদয় আলোচনা হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, র্বলতামাত্রই সর্বথা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্মের ভিতর—আমাদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর—এই বিশেষ ভাবটি আমি ব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে—তাহাতে 'অভয়' ব্দটি বার বার উক্ত হইয়াছে। কোন কিছুকেই ভয় করিও না—ভয় র্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মানুষকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া ানা পাপ-কর্মে টানিয়া লয়। সুতরাং জগতের ঘৃণা ও উপহাসের দিকে াদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

যদি কেহ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া জগতের হিত-চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না; আবার যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান্। এই বিষয়টি আমি একটি গল্প দ্বারা বুঝাইব।

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু-সন্ন্যাসীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে বড, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্তব্য করিয়া যায় সে-ই বড় ?' অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'সন্ন্যাসী বড়'। রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আসিয়া বলিলেন, 'স্বধর্মপরায়ণ

গৃহস্থই বড়।' রাজা তাঁহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহা প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া নি রাজ্যে বাস করাইলেন।

অবশেষে আসিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী; রাজা তাঁহাকেও ঐরূপ প্র করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হে রাজন্, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় রাজা বলিলেন, 'এ-কথা প্রমাণ করুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হাঁ, আমি প্রমা করিব; তবে আসুন, কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকিতে হইবে, তবে যাহা বলিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।' রাজা সম্ম হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করি আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখ এক মহাসমারোহ-ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যা নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি এবং ঘোষণাকারীদের চিৎকার শুনিতে পাইলেন পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে—আ ঢেঁটরা পেটা হইতেছে। রাজা ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলে ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, 'এই দেশে রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন।'

ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্যাগণের স্বয়ম্বরা হইবা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে প্রত্যে রাজকন্যারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ও ধারণা ছিল। কাহারও ভাব—বর যে পরম সুন্দর হয়, কাহারও আকাঙ্ক্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান্ বরের, কেহ কে আবার চান খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখীন হইতেন। কখন কখ তাঁহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত; সে রাজপুত্রের গুণাবলী, কি কারণে তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্র—তাহা বর্ণনা করিত সিংহাসনে সমাসীনা সুসজ্জিতা রাজকন্যাকে সভার চতুর্দিকে বহন করি লইয়া যাওয়া হইত; তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের এক একজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেন, এবং কে কিরূপ গুণবান্ তাহা শুনিতেন। এইরূ দেখিয়া ও শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিতে 'আগাইয়া চল'; তখন সেই প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীদের দিকে আর কে

ছিয়াও দেখিত না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যার মনোমত তেন, তবে রাজকন্যা তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই জকন্যার স্বামী হইতেন।

যে-দেশে আমাদের পূর্ব-কথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সেই দেশের জকন্যার এরূপ স্বয়ম্বর-সভা হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে াপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন; ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর জকন্যাই রাজ্য লাভ করিবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা ুরুষকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার মনের মতো সুপুরুষ পাওয়া যাইতেছিল । অনেকবার এইরূপ স্বয়ম্বর-সভা আহূত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও নানীত করিতে পারেন নাই। এই স্বয়ম্বর-সভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। ই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হইয়াছিল, এবং ই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত হইয়াছিল।

সিংহাসনে সমাসীনা রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাহকগণ াহাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজকন্যা াহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এবারেও স্বয়ম্বর-সভা পূর্ব পূর্ব বারের তো ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইতে লাগিল। এমন সময় ক যুবা সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার রূপের প্রভা খিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং সূর্যদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে বতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন—কি ইতেছে। রাজকন্যাসহ সেই সিংহাসন তাঁহার নিকটবর্তী হইল। রাজকন্যা াই পরমরূপবান্ সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থামিতে বলিয়া সন্ন্যাসীর লদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যাসী মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও লিতে লাগিলেন, 'এ কি নির্বুদ্ধিতা! আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে বিবাহের র্থ কি?' সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য াজকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না; অতএব তিনি বলিলেন, আমার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর র সমগ্র রাজ্য।' এই বলিয়া সন্ন্যাসীর গলায় আবার মালা পরাইয়া দিলেন। কি বাজে কথা। আমি বিবাহ করিতে চাই না, তবু এ কি?' বলিয়া সন্ন্যাসী লায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি বলিলেন, 'হয় আমি ইহাকে বিবাহ করিব, নতুবা মরিব।' রাজকন্যা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুবর্তন করিলেন। তারপর আমাদের সেই অপর সন্ন্যাসী—যিনি রাজাকে সেখানে আনিয়াছিলেন—বলিলেন, 'চলুন রাজা, আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।' এই বলিয়া তাঁহারা অনেকটা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। যে-সন্ন্যাসী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক ক্রোশ গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিলেন; অপর দুইজনও তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন।

এই যুবা সন্ন্যাসী ঐ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন; উহার কোথায় কি আঁকাবাঁকা পথ আছে, সব জানিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইরূপ একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বন হইতে বাহিরে আসিবার পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও অপর সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গাঢ়, তাহাতে পথ বাহির করা বড় কঠিন, এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এস, আজ আমরা ইহার তলায় বিশ্রাম করি। প্রভাতে তোমাকে বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিব।'

সেই গাছে এক পাখির বাসা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখি, পক্ষিণী ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত। ছোট পাখিটি নীচের দিকে চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, 'দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছেন—শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নিখণ্ডে কাঠকুটা দিয়া বেশ আগুন

প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পাখিটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'প্রিয়ে, আমরা কি করি? ইহাদিগকে খাইতে দিবার মতো কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই; কিন্তু ইহারা ক্ষুধার্ত, আর আমরা গৃহস্থ, ঘরে যে-কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমি নিজে যতদূর পারি করিব। ইহাদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তাঁহারা বাঁচাইতে পারিলেন না।

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, 'এঁরা তিনজন রহিয়াছেন, তাঁহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখি! ইহা যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর কর্তব্য—স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমার শরীরও ইহাদের জন্য উৎসর্গ করি।' এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং পুড়িয়া মরিয়া গেল।

শাবক-তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্যাপ্ত খাদ্য হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'আমাদের পিতামাতা যতদূর সাধ্য করিলেন, কিন্তু তাহাও তো যথেষ্ট হইল না। পিতামাতার কার্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্য; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক' —এই বলিয়া তাহারাও সকলে মিলিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিল।

ঐ তিন ব্যক্তি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্তু পাখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাঁহারা অনাহারে রাত্রি-যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজা ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, দেখিলেন তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চান, তবে ঐ পাখিদের মতো প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি সংসারত্যাগ করিতে চান, তবে ঐ যুবকের মতো

হউন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। যদি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়া লন, তবে সৌন্দর্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যাহা কর্তব্য, তাহা অপরজনের কর্তব্য নয়।'

শরীরগত অভাব পূরণ করিয়া অপরকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্তু অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর। যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, অবশ্যই তাহার উপকার করা হইল; যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহা অধিকতর উপকার; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার। একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে; অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। কেবল আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব-বৃত্তি চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা। মানুষকে যিনি পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক। আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিবার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ পুরুষ; কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্মপ্রচেষ্টার প্রকৃত ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছা করিলে তিনি অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি না জাগা পর্যন্ত মানুষের শারীরিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-বিষয়ে সাহায্য। অন্ন-বস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর,—প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহৎ, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য; জ্ঞানই জীবন। জীবন যদি অন্ধকারে কাটাইতে হয়—অজ্ঞান ও দুঃখের মধ্য দিয়া চলাই যদি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার পর অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান। অতএব অপরকে সাহায্য করার বিষয় বিচার করিবার সময় আমরা যেন এই ভ্রমে পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। শারীরিক সাহায্যের স্থান শুধু সর্বশেষে নয়—সর্বনিম্নেও, কারণ ইহা স্থায়ী তৃপ্তি দিতে

পারে না। ক্ষুধার্ত হইলে যে কষ্ট পাই, খাইলেই তাহা চলিয়া যায়; কিন্তু ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। দুঃখ তখনই নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ বা যন্ত্রণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অতএব যাহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন করে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার; তার পর মানসিক উপকার, তার পর শারীরিক।

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ-সমস্যার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মানুষ পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই জগৎ হইতে দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমরা দাতব্য আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাকিবেই থাকিবে।

গীতায় আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করি—আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে হইবে। সকল কর্মই স্বভাবতঃ শুভাশুভ-মিশ্রিত। আমরা এমন কোন কর্ম করিতে পারি না, যাহা দ্বারা কোথাও কিছু না কিছু ভাল হয়, আবার এমন কোন কর্ম হইতে পারে না, যাহা হইতে কোথাও না কোথাও কিছু অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক কর্মই অপরিহার্যভাবে শুভাশুভ-মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে বলিতেছেন। শুভাশুভ উভয়ই নিজ নিজ ফল প্রসব করিবে। শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইবে; কিন্তু এই শুভাশুভ উভয়ই আত্মার বন্ধন। গীতায় ইহার এই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত না হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে পারিবে না। এখন 'কর্মে অনাসক্তি' বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

*গীতার মূলভাব এই : নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। 'সংস্কার' শব্দের প্রায় কাছাকাছি অর্থ 'সহজাত প্রবণতা'। মনকে যদি একটি হ্রদের সহিত তুলনা করা হয়, তবে বলা যায়—মনের মধ্যে যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু উহা চিত্তের উপর একটি দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং ঐ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার একত্র নাম—'সংস্কার'। আমরা যে-কোন কর্ম করি—আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা—চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া যায়, যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনও এত প্রবল থাকে যে, তাহারা অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করিতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। এই মুহূর্তে আমার 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমার অতীত জীবনের সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'চরিত্র' বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মন্দ কথা শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐগুলিই অজ্ঞাতসারে তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কার-গুলি সর্বদাই কাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং ঐ ব্যক্তি একটি মন্দ লোক হইয়া দাঁড়াইবে—সে ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার মনের এই সংস্কার-সমষ্টি মন্দ কার্য করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উৎপন্ন করিবে। এই সংস্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে জোর করিয়া মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয় চিন্তা করে এবং ভাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইবে এবং অনুরূপভাবে ঐগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিবে। যখন মানুষ এত বেশী ভাল কাজ করে এবং এত বেশী সৎ চিন্তা করে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও ঐ-সকল সংস্কারের সমষ্টি-স্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না, সংস্কার-

গুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিবে; সে তখন তাহার সৎ সংস্কারগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।

যেমন কূর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে,—তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারো, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারো, তথাপি পা ও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলি সংযত হইয়াছে, তাহার চরিত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই সেগুলিকে বহির্মুখী করিতে পারে না। এরূপ নিরন্তর সচ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবর্তিত হওয়ায় সৎকর্ম করিবার প্রবণতা প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমরা ইন্দ্রিয়গুলি (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যন্ত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র) জয় করিতে সমর্থ হই। এভাবেই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে। এরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ; তাহার দ্বারা কোন অন্যায় অশুভ কার্য সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই রাখো না কেন, তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই সৎপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে—মুমুক্ষুত্ব। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল যোগের লক্ষ্য—আত্মার মুক্তি এবং প্রত্যেক যোগই সমভাবে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যানের দ্বারা, খ্রীষ্ট প্রার্থনা দ্বারা যে-অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, মানুষ কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত; কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝা কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—শুভ বন্ধন হইতে যেমন, অশুভ বন্ধন হইতেও তেমনি মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও শিকল। আমার আঙুলে একটি কাঁটা ফুটিয়াছে, আর একটি কাঁটা দ্বারা ঐ কাঁটাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোলা হইয়া গেলে দুটি কাঁটাই ফেলিয়া দিলাম। দ্বিতীয় কাঁটাটি রাখিবার দরকার নাই, কারণ দুটিই তো কাঁটা! এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বারা ব্যাহত করিতে হইবে। মনের মন্দ সংস্কারগুলি দূরীভূত করিয়া সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে

হইবে—যতদিন না যাহা কিছু মন্দ, তাহা প্রায় অন্তর্হিত হয় অথবা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মনের এক কোণে বশীভূত ভাবে থাকে ; কিন্তু তারপর শুভ সংস্কারগুলিও জয় করিতে হইবে। এরূপে 'আসক্ত' ক্রমে 'অনাসক্ত' হইয়া যায়। কর্ম কর, কিন্তু ঐ কর্ম বা চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আসুক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্গ উৎপন্ন হউক, কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে।

ইহা করিবার উপায় কি? আমরা দেখিতে পাই, যে কার্যে আমরা আসক্ত হই, তাহারই সংস্কার থাকিয়া যায়। সারা দিনে শত শত ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাকে আমি ভালবাসি। রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্ট মুখগুলির বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এক মিনিটের জন্য যে-মুখখানি দেখিয়াছিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখানিই আমার মনে ভাসিয়া উঠিল, আর সব মুখগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার বিশেষ আসক্তিবশতঃ অন্যান্য মুখগুলি অপেক্ষা ঐ মুখখানিই আমার মনে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। শারীরিক দিক দিয়া মুখগুলি দেখার কাজ একরূপই, যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি, সবগুলির ছবিই আমার অক্ষিজালের (Retina) উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক ঐ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় নাই। বেশীর ভাগ মুখ হয়তো সম্পূর্ণ নূতন ছিল; এমন সব নূতন মুখ হয়তো দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে আমি পূর্বে কখন চিন্তাই করি নাই; কিন্তু যে-মুখখানির একবারমাত্র চকিত দর্শন পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তো কত বৎসর ধরিয়া মনে মনে তাহার ছবি আঁকিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত বিষয় জানিতাম, এখন এই নূতন করিয়া দেখায়—মনের শত শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার পড়িয়াছে, ঐ একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সংস্কার ফেলিয়া মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে।

অতএব 'অনাসক্ত' হও, সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলি কর্ম করুক। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না

করিতে পারে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য আসিয়াছ—এইভাবে কর্ম করিয়া যাও। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি, এই সংসার—এ পৃথিবী সেগুলিরই একটি। সাংখ্যের সেই মহাবাক্য স্মরণ রাখিও, 'সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়।'[১] আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে—ইহাই প্রয়োজন। যদি সর্বদাই এ-কথা স্মরণ রাখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না; আমরা বুঝিব যে, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তকমাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভ করিবার পর, আমাদের নিকট ঐ গ্রন্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া প্রকৃতির সহিত আমরা নিজেদের মিশাইয়া ফেলিতেছি, ভাবিতেছি আত্মাই প্রকৃতির জন্য। সাধারণ চলিত কথায় আছে, মানুষ 'খাইবার জন্যই জীবনধারণ করে, জীবনধারণ করিবার জন্য খায় না।' আমরা ক্রমাগত এই ভুল করিতেছি; প্রকৃতিকেই 'আমি' ভাবিয়া উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারই আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে না দিয়া ক্রীতদাসের মতো কর্ম করায়।

এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে, প্রভুর মতো কর্ম করিতে হইবে, ক্রীতদাসের মতো নয়। সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু দাসের মতো কর্ম করিও না। সকলে কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন হইতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোক ক্রীতদাসের মতো কর্ম করিয়া থাকে—তাহার ফল দুঃখ; ঐরূপ কর্ম স্বার্থপর। স্বাধীনতার সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর! 'প্রেম' শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে কখনও প্রেম আসিতে পারে না। ক্রীতদাসের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শৃঙ্খলে

১ তুলনীয়ঃ—সংহতানাং পরার্থত্বাৎ।

বাধিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাও, সে বাধ্য হইয়া একটানাভাবে কাজ করিবে, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন ভালবাসা থাকিবে না। এইরূপ আমরাও যখন সাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মতো কাজ করি, আমাদেরও অন্তরে কোন ভালবাসা থাকে না; আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম নয়। আমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম দাসসুলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য কৃত কিনা, তাহার পরীক্ষা এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাজ করা যায়, তাহাতে সুখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কাজ নাই, যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর-সম্বন্ধ—ইহারা একে তিন। ইহাদের একটি যেখানে আছে, অপরগুলিও সেখানে অবশ্য থাকিবে। ইহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ। যখন সেই (নিরপেক্ষ) সত্তা আপেক্ষিকভাবাপন্ন হয়, তখন উহাকে আমরা জগৎরূপে দেখিয়া থাকি। সেই জ্ঞানই আবার জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহৃদয়ে সর্ববিধ ভালবাসার ভিত্তিস্বরূপ। অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক অথবা প্রেমাস্পদ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

মনে কর, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালবাসে। সে একাই তাহাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায়, তাহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির মনে ঈর্ষার উদয় হয়। সে চায়—মেয়েটি তাহার কাছে বসুক, তাহার কাছে দাঁড়াক, তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক। সে ঐ মেয়েটির ক্রীতদাস, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া রাখিতে চায়। ইহা ভালবাসা নয়, ইহা একপ্রকার দাসসুলভ অনুরাগের বিকার। ভালবাসার মতো দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ইহা ভালবাসা নয়। উহা ভালবাসা হইতে পারে না, কারণ উহা যন্ত্রণাদায়ক। যদি মেয়েটি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালবাসায় কোন দুঃখকর প্রতিক্রিয়া নাই। ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়া থাকে। ভালবাসিয়া যদি আনন্দ না হয়, তবে উহা ভালবাসা নয়, অন্য কিছুকে আমরা ভালবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামীকে,

স্ত্রীকে, পুত্রকন্যাকে, সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভালবাসিতে সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত কর্ম হইতে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। কর্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন?—জগৎকে ভালবাসি বলিয়া।'[১] ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত। প্রকৃত ভালবাসা আমাদিগকেও অনাসক্ত করে। যেখানেই দেখিবে আসক্তি—পার্থিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণ, সেখানেই জানিবে উহা প্রাকৃতিক আকর্ষণ, কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্ষণ মাত্র—কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে; আর উহারা পরস্পর খুব নিকটবর্তী হইতে না পারিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব হয়; কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এরূপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভালবাসা অটুট থাকিবে, উহা বিনষ্ট হইবে না এবং উহা হইতে কখনও কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হইবে না।

এই অনাসক্তি লাভ করা একরূপ সারা জীবনের সাধনা বলিলেও হয়, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলাম এবং মুক্ত হইলাম। তখন আমাদের প্রকৃতিজাত বন্ধন খসিয়া পড়ে এবং আমরা প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের জন্য আর বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না; আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি এবং কর্মের ফলাফল আর গণ্য করি না। কি ফল হইল, কে তখন গ্রাহ্য করে?

শিশুসন্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য—ঐখানেই উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা কর, তাহা

১ তুলনীয়: গীতা, ৩।২২-২৪

করিয়া যাও, কিন্তু সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা করিও না। যদি সর্বদা দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পারো, প্রত্যুপকারের কোন আশা না রাখিয়া জগৎকে শুধু দিয়া যাইতে পারো, তবেই সেই কর্ম হইতে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আসিবে না। যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই আসক্তি আসে।

যদি ক্রীতদাসের মতো কাজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, তাহা হইলে প্রভুর ভাবে কাজ করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ আসিয়া থাকে। আমরা অনেক সময় ন্যায়ধর্ম ও নিজ নিজ অধিকারের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই—এ-সংসারে ঐগুলি শিশুসুলভ বাক্যমাত্র। দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে—ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতা-প্রয়োগ চিরকালই স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। সকল নরনারীই—তাহাদের শক্তি ও সুবিধা যতটা আছে, তাহার যতটা পারে তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। দয়া স্বর্গীয় বস্তু; ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেই দয়াবান্ হইতে হইবে। এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক; শুধু তাই নয়, পরিণামে উহা দুঃখের কারণ হয়। আর এক উপায় আছে, যাহা দ্বারা এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে; যদি আমরা সগুণ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কর্মকে 'উপাসনা' বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকি। এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিলে আমাদের কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রভু স্বয়ং সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং তাঁহার আসক্তি নাই। জল যেমন পদ্মপত্র ভিজাইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎপন্ন করিয়া কর্ম তেমনি নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অহং-শূন্য ও অনাসক্ত ব্যক্তি জনপূর্ণ ও পাপসঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন, তাহাতে তিনি পাপে লিপ্ত হইবেন না।

এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে: কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাণ্ডব এক মহাযজ্ঞ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাবিধ

বহুমূল্য বস্ত্র দান করিলেন। সকলেই এ-যজ্ঞের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, জগতে পূর্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই। যজ্ঞশেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধ শরীর সোনার মতো রঙ, বাকী অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, 'তোমরা সব মিথ্যাবাদী, ইহা যজ্ঞই নয়।' তাহারা বলিতে লাগিল, 'কি! তুমি বলিতেছ—ইহা যজ্ঞই নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে দরিদ্রদিগকে কত ধনরত্ন প্রদত্ত হইয়াছে, সকলেই ধনবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে? ইহার মতো অদ্ভুত যজ্ঞ আর কেহ কখনও করে নাই।' নকুল বলিল:

শুনুন—এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরীব ছিলেন; শাস্ত্র প্রচার ও ধর্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিকা। সেই দেশে একদা পর পর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল, গরীব ব্রাহ্মণটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেই পরিবারকে পাঁচ দিন উপবাসে থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দিনে পিতা কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহা চার ভাগ করিলেন। তাঁহারা উহা খাদ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। পিতা দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে, এক অতিথি দাঁড়াইয়া। ভারতবর্ষে অতিথি বড় পবিত্র ও মান্য; সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে 'নারায়ণ' মনে করা হয় এবং তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 'আসুন, মহাশয়! আসুন, স্বাগত!' ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছি—এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে আমার জঠরাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল!' তখন ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, 'আমার ভাগও উঁহাকে দিন।' স্বামী বলিলেন, 'না, তা হইবে না।' কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নী জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এ গরীব বেচারা আমাদের নিকট উপস্থিত, আমরা গৃহস্থ—আমাদের কর্তব্য তাঁহাকে খাওয়ানো, আপনার যখন আর কিছু দিবার নাই, তখন সহধর্মিণীরূপে আমার কর্তব্য তাঁহাকে আমার ভাগ দেওয়া।' এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ

তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'আমি এখনও ক্ষুধায় জ্বলিতেছি।' তখন পুত্রটি বলিল, 'আপনি আমার ভাগও গ্রহণ করুন। পুত্রের কর্তব্য—পিতাকে তাঁহার কর্তব্যপালনে সহায়তা করা।' অতিথি তাহারও অংশ খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুত্রবধূও তাঁহার ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে ঐ চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেল। ঐ ছাতুর গুঁড়া কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলাম, তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল; আপনারা সকলে তো ইহা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; আমার ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ স্বর্ণে পরিণত হইল না। সেইজন্যই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নয়।

ভারত হইতে এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে; মহৎ ব্যক্তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। নূতন ইংরেজী শিখিবার সময় আমি একটা গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল—কর্তব্যপরায়ণ বালকের গল্প; সে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহার কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বই-এর তিন-চার পৃষ্ঠা ধরিয়া বালকের এই কাজের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব কি আছে? এই গল্প যে কি নীতি শিক্ষা দেয়, কোন হিন্দু বালকই তাহা ধরিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাব—'প্রত্যেকেই নিজের জন্য' শুনিয়া আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি। এদেশে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা নিজেরাই সব ভোগ করে, বাপ-মা স্ত্রী-পুত্রদিগকে একেবারে ভাসাইয়া দেয়। কোথাও কখনও গৃহস্থের এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

এখন তোমরা বুঝিতেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ—মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোকে তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না, এবং তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি

যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করিও না, বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। যথার্থ ত্যাগীর জীবন অপেক্ষা যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন।

কর্তব্য কি?

কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের জানা আবশ্যক, কর্তব্য কাহাকে বলে। আমাকে যদি কিছু করিতে হয়, তবে প্রথমেই জানিতে হইবে—ইহা আমার কর্তব্য, তবেই তাহা করিতে পারিব। কর্তব্য-জ্ঞান আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাঁহার শাস্ত্র কোরানে যাহা লিখিত আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। হিন্দু বলেন, তাঁহার বেদে যাহা আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। খ্রীষ্টান আবার বলেন, তাঁহার বাইবেলে যাহা আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। সুতরাং আমরা দেখিলাম, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে কর্তব্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন। অন্যান্য সার্বভৌম-ভাববোধক শব্দের ন্যায় 'কর্তব্য' শব্দেরও স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কর্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল জানিয়াই আমরা উহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

যখন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই সেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কার্য করিবার জন্য স্বাভাবিক অথবা পূর্বসংস্কার অনুযায়ী ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। কখন মনে হয়, এরূপ অবস্থায় এইভাবে কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অন্য সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইলেও সেভাবে কর্ম করা অন্যায় বলিয়া মনে হয়। সর্বত্রই কর্তব্যের এই সাধারণ ধারণা দেখা যায় যে, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই নিজ বিবেকের আদেশ অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ কোন্ গুণ কর্মকে কর্তব্যে পরিণত করে? যদি একজন খ্রীষ্টান সম্মুখে গোমাংস পাইয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আহার না করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে না দেয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেলা হইয়াছে। কিন্তু একজন হিন্দু যদি ঐরূপ ক্ষেত্রে উহা ভোজন করিতে সাহস করে অথবা অপর হিন্দুকে উহা খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় সমভাবে বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্য পালন করা হইল না। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার হৃদয়ে ঐরূপ ভাব আনিয়া দিবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত

দস্যুদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল—যাহাকে পাইবে, তাহাকেই মারিয়া সর্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য; আর যে যত বেশী লোক মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সাধারণতঃ একজন পথে বাহির হইয়া আর একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলে অন্যায় কার্য করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শুধু একজনকে নয়, বিশজনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে সে আনন্দিতই হয় এবং ভাবে—সে অতি সুন্দররূপে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কি করা হইয়াছে, বিচার করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না।

সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া একেবারে অসম্ভব; এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য—এরূপ নির্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে ব্যক্তি (Subjective) বা অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে-কোন কার্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, তাহাই সৎ কার্য; এবং যে-কোন কার্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায়, তাহা অসৎ কার্য। অধ্যাত্মভাবের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও মহান্ করে, আর কতকগুলি কার্যের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কার্যের দ্বারা কিরূপ ভাব আসিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তব্যসম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং উহা এই সংস্কৃত শ্লোকার্ধে বর্ণিত হইয়াছে: পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।

ভগবদ্গীতা জন্ম ও অবস্থা (বর্ণাশ্রম)-গত কর্তব্যের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্ ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা ঐ ব্যক্তির বর্ণ আশ্রম ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই অনেকটা নিরূপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে এমন কাজ করা, যাহা দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও

কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ। একজন মার্কিন ভাবেন, তাঁহার দেশের রীতিনীতি অনুসারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল এবং যে-কেহ ঐ রীতি অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। একজন হিন্দু (ভারতবাসী) ভাবে, তাহার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও সত্য, সুতরাং যে-কেহ উহা অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। আমরা সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্রমে পড়িয়া থাকি। ইহা বড়ই অনিষ্টকর; সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখা যায়, তাহার অর্ধেক এই ভ্রম হইতেই উৎপন্ন।

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন চিকাগো মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, পিছন হইতে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরিয়া এক টান মারিল। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, তাঁহাকে বেশ ভদ্রলোকের মতো দেখিতে। আমি তাহার সহিত দুএকটি কথা বলিলাম; আমি ইংরেজী জানি বুঝিবামাত্র লোকটি খুব লজ্জিত হইল। আর একবার ঐ মেলাতেই আর একজন লোক আমাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দেয়। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সেও লজ্জিত হইল, শেষে আমতা আমতা করিতে করিতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'আপনি এরূপ পোশাক পরিয়াছেন কেন?' এই-সকল ব্যক্তির সহানুভূতি তাঁহাদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ—দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে-সকল অত্যাচার করে, সেগুলির অধিকাংশেরই কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্জাত। ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি তাঁহার মতো পোশাক পরি না কেন, এবং আমার বেশের জন্য আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে চাহিলেন, তিনি হয়তো খুব ভাল লোক; হয়তো তিনি সন্তানবৎসল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি; কিন্তু যখনই তিনি ভিন্নবেশপরিহিত কাহাকেও দেখিলেন, তখনই তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা লুপ্ত হইয়া গেল। সকল দেশেই আগন্তুক বিদেশীদের শোষণ করা হয়, কারণ তাহারা যে জানে না, নূতন অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, এইজন্য তাহারাও ঐ দেশের লোকদের সম্বন্ধে একটা

ভুল ধারণা লইয়া যায়। নাবিক, সৈন্য ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবহার করিয়া থাকে, নিজেদের দেশে ঐরূপ করিবার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনারা ইওরোপীয় ও মার্কিনগণকে 'বিদেশী শয়তান' বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল দিকগুলি দেখিলে তাহারা এরূপ বলিতে পারিত না।

সুতরাং একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি, যেন অপর জাতির আচার-ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবর্তিত হয়; কোন বিশেষ সময়ে যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা করাই এ জগতে শ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রথমেই যেন আমরা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত কর্তব্য অনুসারে কাজ করি; তারপর সমাজে ও জীবনে আমাদের পদমর্যাদা অনুসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। মনুষ্য-স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে, মানুষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা করে না। সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। যদি বা সে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। তবেই তাহার উপর উচ্চতর কর্তব্যের ভার অর্পিত হইবে। এ সংসারে যখন আমরা আগ্রহ সহকারে কাজ করিতে আরম্ভ করি, তখন প্রকৃতিই আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীঘ্রই আমরা আমাদের যথার্থ মর্যাদা খুঁজিয়া পাই, বুঝিতে পারি—কোথায় কাহার স্থান। যে যে-কার্যের উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সন্তোষজনকভাবে সেই পদে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি যেরূপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাজ করিতেছে বলিয়াই যে একজন নিম্নস্তরের মানুষ, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও বিচার করা উচিত নয়; যে যেভাবে সেই কর্তব্য নিষ্পন্ন করে, তাহা দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হইবে।

পরে আমরা দেখিব, কর্তব্যের এই ধারণাও পরিবর্তিত হয়; আরও দেখিব যখন কর্মের পশ্চাতে স্বার্থপ্রেরণা থাকে না, তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম করিতে পারে। তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মই আমাদিগকে কর্তব্য-জ্ঞানের অতীত কর্মে লইয়া যায়; তখন কর্ম উপাসনায় পরিণত হয়, শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহা লাভ করিবার উপায় এই 'কর্তব্য'। আমরা দেখিব, কর্তব্যের তত্ত্ব—নীতি বা প্রেম—যে-কোন রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, ইহা অন্যান্য যোগের মতোই; ইহার উদ্দেশ্য—'কাঁচা আমি'কে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করা, যাহাতে 'পাকা আমি' নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারেন, ইহার উদ্দেশ্য—নিম্নস্তরের শক্তিক্ষয় নিবারণ করা, যাহাতে আত্মা উচ্চতর ভূমিতে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। নীচ বাসনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ বা অস্বীকার করিলেই আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বাসনা কমাইতে কমাইতে আমরা মানুষের প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দিই। ভিতরের দিক হইতে দেখিলে কর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা হইতে পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব, আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মসংযম হইতে ধর্মের বিকাশ।

কর্তব্য বিশেষ রুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য-চক্রকে স্নেহসিক্ত করিলে তবেই উহা বেশ সহজভাবে চলিতে থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ! অন্যথা কিভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালন করিতে পারে? আমরা কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতেছি না? প্রেম-মিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাতেই দীপ্তি পায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষার দাস আরও যে শত শত ছোট ছোট ঘটনা জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই, সেগুলির দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা? আমরা জীবনে যে-সব ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সম্মুখীন হই, ঐগুলি সহ্য করাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। নারীগণ নিজেদের

ঈর্ষাপূর্ণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়া স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং মনে করে, তাহারা যেন নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করিতেছে। তাহারা জানে না যে, এইরূপে তাহারা নিজেদের দাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। যে-সকল স্বামী সর্বদাই স্ত্রীর দোষ দেখে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম ; এমন মানুষ নাই বলিলেই হয়—তা সে যতদূর বিপথগামীই হউক না কেন—যাহাকে নম্রা প্রেমিকা সতী স্ত্রী সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে না পারেন। জগৎ এখনও এতটা মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমরা নৃশংস পতি এবং পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, নৃশংস ও অপবিত্র নারীর সংখ্যা যত, ঐরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা যেরূপ সগর্বে বলেন—এবং তাহা শুনিয়া লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে—যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি আছে, যাহা পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না? যে কল্যাণী সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতো দেখেন, এবং তাহাদের প্রতি জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা-শক্তিতে অতিশয় উন্নত হন ; এমন পশুপ্রকৃতি মানুষ একটিও নাই, যে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া অনুভব না করিবে। প্রত্যেক পুরুষও সেইরূপ নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে-ব্যক্তি আবার ধর্মাচার্য হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিবেন, এবং সর্বদা সেরূপ ব্যবহার করিবেন।

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চতর, আর সব ভালবাসা নিম্নতর। মাতার কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয় চিন্তা করা, তারপর নিজের বিষয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন—তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখি এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মতো। পাখির ছানাদের ডানা উঠিলে তাহারা আর বাপ-মাকে চিনিতে পারে না। সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি

নারীকে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূর্তিরূপে দেখিতে সমর্থ। সেই নারীও ধন্য, যাহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক। সেই সন্তানেরাও ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের সত্তারূপে দেখিতে সমর্থ।

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়ঃ আমাদের হাতে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, যে পর্যন্ত না আমরা সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, সেই বড়—অবশ্য তাহার নিজ ব্যবসায় ও কার্যের দৃষ্টিতে।

এক যুবক সন্ন্যাসী বনে গিয়া বহুকাল ধ্যান-ভজন ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। উপরের দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, একটি কাক ও একটি বক গাছের উপর লড়াই করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, 'কি! তোরা আমার মাথায় শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিস?' এই কথা বলিয়া ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া পক্ষীগুলিকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বারা তাঁহার এমনই শক্তি হইয়াছিল! তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল, নিজের এইরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, 'একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক-বক ভস্ম করিতে পারি!' কিছু পরে ভিক্ষা করিতে তাঁহাকে শহরে যাইতে হইল। একটি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, 'মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।' ভিতর হইতে উত্তর আসিল—'বৎস, একটু অপেক্ষা কর।' যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হতভাগিনি, তোর এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস্? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস্ না।' তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন; আবার সেই কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, 'বৎস! এত অহঙ্কার করিও না, এখানে

কাক বা বক নাই।' তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে সেই নারী বাহিরে আসিলেন, যোগী তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, 'মা, আপনি কিরূপে উহা জানিলেন?' তিনি বলিলেন, 'বাবা, আমি তোমার যোগ-তপস্যা কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্যা নারী। তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। সারা জীবন আমি কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে মাতাপিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য পালন করিয়াছি। এখন বিবাহিতা হইয়া স্বামীর প্রতি আমার কর্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য করিয়াই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে চাও তো অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহা শিক্ষা করিলে তোমার পরম আনন্দ হইবে।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'ঐ নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাইব?'

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নগরের নিকটে আসিয়া বাজার দেখিতে পাইলেন। সেখানে দূর হইতে দেখিলেন, এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া বড় ছুরি লইয়া মাংস কাটিতেছে, নানা লোকের সহিত কথা বলিতেছে ও কেনা-বেচা করিতেছে। যুবক ভাবিলেন, 'হায় ভগবান্, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে! এ তো দেখিতেছি একটা পিশাচের অবতার!' ইতিমধ্যে ঐ লোকটি চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'স্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন? আমার বেচা-কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া একটু বসুন।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'এখানে আমার কি হইবে?' যাহা হউক, তিনি উপবেশন করিলেন। ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ হইলে পর সে টাকাকড়ি সব লইয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, 'আসুন, মহাশয়, আমার বাটীতে আসুন।' গৃহে উপনীত হইলে ব্যাধ তাঁহাকে একটি আসন দিয়া বলিল, 'একটু অপেক্ষা করুন।' তারপর বাটীর ভিতরে গিয়া তাহার

পিতামাতার হাত-পা ধোয়াইয়া দিল, তাঁহাদিগকে খাওয়াইল, সর্বপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিল। তারপর সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া একটি আসনে উপবেশন করিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, বলুন—আমি আপনার কি করিতে পারি ?' তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, মহাভারত-গ্রন্থের অংশরূপে তাহা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত—দর্শনের চরম সীমা। তোমরা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, 'আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিত কর্ম করিতেছেন কেন ?' তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 'বৎস, কোন কর্মই অসৎ নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কার্য আমার জন্মগত, ইহা আমার প্রারব্ধ-লব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। অনাসক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্টা করি; আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী করিবার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্ন্যাসীও হই নাই। আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই নাই। তথাপি সমাজে আমার অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অনাসক্তভাবে করিয়াই আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে।'

ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী।[১] আমি জীবনে যে-সব অতি বিস্ময়কর মানুষ দেখিয়াছি, ইনি তাঁহাদের একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি; কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন না; কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত—কখনও উহা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থাপন করিবেন এবং ঐ তত্ত্ব-

১ গাজিপুরের পওহারী বাবা, ১৮৯৮ খৃঃ ইনি দেহরক্ষা করেন।

সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবেন। তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের রহস্য সম্বন্ধে বলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'[১]—যখন তুমি কোন কার্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না; পূজারূপে—সর্বোচ্চ পূজারূপে উহার অনুষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতেই সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ কর।

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও সর্বান্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম করিতেন, ফলে তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল, গৃহস্থ বা সন্ন্যাস—যে-কোন আশ্রমের কর্তব্যই হউক না কেন, যথার্থরূপে অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমরা আত্মজ্ঞান-বিষয়ক চরম অনুভূতি লাভ করিব।

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্মীই—তাহার অদৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং ঐগুলিই অমোঘ অস্ত্র হইয়া তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমরা যে কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ—আমরা সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা নিম্ন-অবস্থানির্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিরও ঠিক ঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে-সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম চিন্তা উঠিত—কখন ভাবিতাম, আমি একটা মস্তবড় সম্রাট; কখন বা নিজেকে অন্য কোনরূপ একটা বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও বাল্যকালে এরূপ চিন্তা করিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র; প্রকৃতিই সর্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধান করিয়া থাকে—তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল

---

১ যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি—উদ্দেশ্য ও উপায় এক।

অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে—যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে—তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়া থাকি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছিতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কর্তব্য পালন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, এবং তাহার জীবনটা বিফলতায় পর্যবসিত হইবে। এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে-কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি—সর্বদাই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবে আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে পাইব।

পরোপকারে নিজেরই উপকার

কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়তা হয়, সে-বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে 'কর্ম' বলিতে ভারতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি করিয়া ভাগ আছে—যথা দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ঐ দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র; উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ঐ দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ঐ দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ—যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্থূলতর রূপ। এই অনুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক ধর্মেই ইহা প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই—যতদিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে, ততদিন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহারা সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়—সূক্ষ্ম ভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধারণা করিবার প্রণালী আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

স্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে আমরা প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি না; শব্দসমূহ তো চিন্তারই প্রতীক। অন্য হিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই প্রতীক রূপে দেখা যাইতে পারে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার পশ্চাতে মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞান পুরাপুরিভাবে মানব-সৃষ্ট নয়। কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বসিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বকপোল-কল্পিত কতকগুলি প্রতীকের সৃষ্টি করিলেন—এরূপ নয়। প্রতীকগুলি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায়

প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। তোমাদের অনেকের ধারণা—খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শেই ক্রুশ-চিহ্ন প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্মের বহু পূর্ব হইতে, মূশা জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব হইতে—এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল। আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির মধ্যেও যে ক্রুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব, সকল জাতিই এই ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহার করিত।

আবার ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার—ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ একটি মানুষের—প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক 'স্বস্তিক' (卐) রহিয়াছে। এক সময়ে লোকে ভাবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহা ছড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিশরে ইহা দেখা যাইত। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে?—এই প্রতীকগুলি শুধু রীতিগত বা কল্পনাপ্রসূত নয়। নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মনুষ্য-মনের সহিত উহাদের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একটা কৃত্রিম বস্তু নয়। কয়েকজন লোক একত্র হইয়া কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবে—এইরূপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা সত্য নয়। কোন ভাবই তাহার অনুরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অথবা কোন শব্দই তাহার অনুরূপ ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেদ্য। ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ- বা বর্ণ-প্রতীক—উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। বধির ও মূক ব্যক্তিদিগকে শব্দপ্রতীক ছাড়া অন্য প্রতীকের সাহায্যে চিন্তা করিতে হয়। মনের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিপূরক হিসাবে একটি করিয়া রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদিগকে 'নাম-রূপ' বলা হয়। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব, সেরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রতীক সৃষ্টি করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকগুলির মধ্যে মানবজাতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্যান্য

বাহ্য আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই—এ-কথা বলা খুব সহজ। আজকাল ছোট শিশুও এ-কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও অতি সহজেই দেখা যায়—যাহারা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না, তাহাদের চেয়ে যাহারা মন্দিরে উপাসনা করে, তাহারা অনেক বিষয়ে অন্যরূপ। এই কারণে কোন কোন ধর্মের সহিত যে-সব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থূল ক্রিয়াকলাপ জড়িত আছে, তাহা সেই সেই ধর্মাবলম্বীর মনে—ঐ স্থূল বস্তুগুলি যে-সব ভাবে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই-সব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। আর অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবারে উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। এই-সকল বিষয়ের চর্চা ও অভ্যাস স্বভাবতই কর্মযোগের একটি অংশ।

এই কর্ম-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি এই—'ভাব' ও 'শব্দে'র মধ্যে যে-সম্বন্ধ আছে এবং শব্দশক্তিদ্বারা কি সাধিত হইতে পারে, তাহা জানা। সকল ধর্মে শব্দশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি কোন কোন ধর্মে সমগ্র সৃষ্টিই 'শব্দ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহ্যভাব 'শব্দ'; আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সঙ্কল্প ও ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু 'শব্দ' হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। এই জড়বাদী ইহসর্বস্ব জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নায়ুগুলি অচেতন ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যতই আমরা বৃদ্ধ হই, যতই আমরা এই জগতে ঘা খাইতে থাকি, ততই আমরা অনুভূতিহীন হইয়া পড়ি; আর যে-সকল ঘটনা বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলিকেও আমরা অবহেলা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজস্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমরা এই-সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়া বিস্মিত হই ও সেগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর এইরূপ বিস্ময়ই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির প্রথম সোপান। শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় করিয়া থাকে। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। আমার কথা দ্বারা বায়ুর যে কম্পন হইতেছে, তাহা তোমার কর্ণে গিয়া তোমার স্নায়ুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পার না।

ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে 'মূর্খ' বলিল—অমনি সে উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তাহার নাকে ঘুষি মারিল। দেখ—শব্দের কি শক্তি! ঐ এক নারী দুঃখে কষ্টে কাঁদিতেছে; আর এক নারী আসিয়া তাহাকে দুই-চারিটি মিষ্টকথা শুনাইলেন। অমনি সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইল, তাহার শোক-দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি! উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচণ্ড শক্তি। এ-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধান না করিয়াও আমরা দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি। এই শক্তির প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং যথাযথভাবে উহার ব্যবহার করা কর্মযোগের অঙ্গবিশেষ।

অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ—অপরকে সাহায্য করা, জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেদেরই সাহায্য করিতেছি। আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়; কিন্তু যদি আমরা বিশেষ বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিব, আমাদের নিকট হইতে এই জগতের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নাই। তুমি আমি আসিয়া উপকার করিব বলিয়া এই জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। আমি একবার এক (খ্রীষ্টীয়) ধর্মোপদেশে পড়িয়াছিলাম, 'এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ এখানে আমরা অপরকে সাহায্য করিবার সময় ও সুবিধা পাই।' বাহ্যতঃ ইহা অতি সুন্দর ভাব বটে, কিন্তু জগতে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন—এইরূপ বলা কি ঈশ্বরনিন্দা নয়? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যত কাজ করি, তাহার মধ্যে অপরকে সাহায্য করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখিব—পরকে সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা। বাল্যকালে আমার কতকগুলি সাদা ইঁদুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে, তাহাতে ছোট ছোট চাকা ছিল। ইঁদুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিত, অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইঁদুরগুলি আর অগ্রসর হইতে পারিত না। এই জগৎ এবং উহাকে সাহায্য করাও সেইরূপ। তবে এইটুকু উপকার

হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি জগৎ-সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার কাছে জগৎ—হয় নরম বা শক্ত, ঠাণ্ডা বা গরম রূপে প্রতিভাত হইবে। আমরা একরাশ সুখ বা দুঃখের সমষ্টিমাত্র। আমরা জীবনে শত শত বার ইহা অনুভব করিয়াছি। যুবকেরা সাধারণতঃ সুখবাদী (optimist), এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী (pessimist) হইয়া থাকে। যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে; বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে—তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে, শত শত বাসনা তাহাদের হৃদয় অলোড়িত করিতেছে, কিন্তু এখন সেগুলি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্খ। আমরা যেরূপ মন লইয়া জীবনকে দেখি, উহা সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নতুবা স্বরূপতঃ এই জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়। স্বরূপতঃ অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন উহা আমাদিগকে সুখতপ্ত রাখে, তখন আমরা বলি—অগ্নি কি সুন্দর! আবার যখন উহা আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, তখন আমর অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি। অগ্নি কিন্তু স্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয় আমরা উহার যেমন ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব জাগ্রত করে; জগৎ-সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ; এ-কথার অর্থ—জগৎ নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলিয় যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না।

তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে; ইহাই আমাদের কর্ম প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্তু আমাদের সর্বদাই জানা উচিত যে, পরোপকা করা এক পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচ পয়সা লইয়া গরীবকে বলিও না, 'এই নে বেচারা', বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও—ঐ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজে উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করি নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে

আমরা খুব বেশী কী করিতে পারি?—একটা হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতব্য আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি! গরীব দুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তো আমরা বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার মধ্যে দশ লক্ষ টাকায় একটা হাসপাতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাকা নাচ-তামাসা-মদে খরচ করিতে পারি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরীবদের কাছে পৌছিল। কিন্তু তাহাতেই বা হইল কি? এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে। তবে করিব কি? এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ি সব উড়িয়া যাইতে পারে। অতএব এস, জগতের উপকার করিব—এই অজ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, সর্বদাই লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের পক্ষে এক আশীর্বাদস্বরূপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। আমরা যে-সব ভিখারীদের সাহায্য করি, তাহারা কেহই আমাদের এক পয়সা ধারে না; আমরাই তাহাদের নিকট ঋণী, কারণ সে তাহার উপর আমাদের দয়া-বৃত্তি অনুশীলন করিতে অনুমতি দিয়াছে। আমরা জগতের কিছু উপকার করিয়াছি বা করিতে পারি, অথবা অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি—এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা মূর্খের চিন্তা, আর ঐরূপ চিন্তা দুঃখজনক। আমরা মনে করি, আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি; এবং আশা করি, সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে; আর সে ধন্যবাদ না দিলে আমরা মনে কষ্ট পাই। আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশা করিব? যাহাকে সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। মানুষকে সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়? যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম, তবে এই বৃথা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাম এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল কাজ করিতে পারিতাম। আসক্তিশূন্য হইয়া কাজ করিলে অশান্তি বা দুঃখ কখনই আসিবে না। এই জগৎ সুখ-দুঃখ লইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে এবং আমরা উহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছু করি বা না করি, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি:

একজন গরীব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াছিল যে, কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়া সে অর্থ বা যাহা কিছু চায়, সবই পাইতে পারে। অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাকে ভূত দিতে পারে এমন একটি লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে মহা-যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন এক সাধুর সহিত তাহার দেখা হইল। সে ঐ সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিল। সাধু বলিলেন, 'ভূত লইয়া তুমি কি করিবে?' সে বলিল, 'আমার একটি ভূত চাই। সে আমার হইয়া কাজকর্ম করিবে। কিরূপে একটি ভূত পাইব তাহার উপায় শিখাইয়া দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়োজন।' সাধু বলিলেন, 'অত বিক্ষুব্ধ হইও না, বাড়ি যাও।' পরদিন সে পুনরায় সাধুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে একটি ভূত দিন। কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাই-ই চাই।'

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই যাদুমন্ত্র লও; ইহা জপ করিলে একটি ভূত আসিবে—তাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে তাহাই করিবে। কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রাণী—তাহাকে অবিরত কাজে ব্যস্ত রাখিতে হয়; তাহাকে কাজ দিতে না পারিলে সে তোমার প্রাণ লইবে!' লোকটি বলিল, 'ইহা তো অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাহাকে তাহার জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পারি।' এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনেক দিন ধরিয়া ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার সম্মুখে এক বিরাট ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'আমি ভূত—আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াছি; কিন্তু আমাকে সর্বদা কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। যে মুহূর্তে কাজ দিতে না পারিবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব।' লোকটি বলিল, 'আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দাও।' ভূত বলিল, 'হাঁ, প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে।' লোকটি বলিল, 'টাকা আনো।' ভূত বলিল, 'এই লও টাকা।' লোকটি বলিল, 'এই বন কাটিয়া এখানে একটি শহর তৈরি কর।' ভূত বলিল, 'তাহাও হইয়াছে। আর কিছু করিতে হইবে?' তখন লোকটির ভয় হইল; সে ভাবিতে লাগিল,—'ইহাকে তো আর কোন কাজ দিবার নাই, এ তো দেখিতেছি, এক মুহূর্তে সব সম্পন্ন করে!' ভূত বলিল, 'আমাকে কিছু কাজ দাও, নইলে তোমায় খাইয়া

ফেলিব।' ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বেচারা অতিশয় ভয় পাইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাধুর নিকট পৌঁছিয়া বলিল, 'প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।' সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' লোকটি বলিল, 'ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি যা বলি, তাই সে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে; আর যদি তাহাকে কাজ না দিই, তাহা হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।' ঠিক তখনই 'তোমাকে খাইয়া ফেলিব' বলিতে বলিতে ভূত আসিয়া হাজির হইল। খায় আর কি! লোকটি ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার জীবন-রক্ষার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাধু বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি; ঐ কুকুরটির দিকে চাহিয়া দেখ—উহার বাঁকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া উহার লেজটি কাটো, তারপর ভূতটিকে উহা সোজা করিতে দাও।' লোকটি কুকুরের লেজ কাটিয়া ভূতকে দিয়া বলিল, 'ইহা সোজা করিয়া দাও।' ভূত উহা লইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সোজা করিল, কিন্তু যেমনি ছাড়িয়া দিল, অমনি উহা গুটাইয়া গেল। আবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া লেজটি সোজা করিল—ছাড়িয়া দিতেই উহা গুটাইয়া গেল। আবার সে ধৈর্য সহকারে লেজটি সোজা করিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিবামাত্র উহা বাঁকিয়া গেল। এইরূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'জীবনে কখনও এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই। আমি পুরাতন পাকা ভূত, কিন্তু জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই'। অবশেষে লোকটিকে বলিল, 'এস তোমার সঙ্গে আপোস করি। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমিও তোমাকে যাহা যাহা দিয়াছি সবই রাখিতে দিব, এবং প্রতিজ্ঞা করিব—কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না।' লোকটি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত এই চুক্তি স্বীকার করিল।

এই জগৎটা কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মতো; মানুষ শত শত বৎসর যাবৎ ইহা সোজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যখনই একটু ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহা আবার গুটাইয়া যায়। অন্যথা আর কিরূপ হইবে? প্রথমেই জানা উচিত, আসক্তিশূন্য হইয়া কি ভাবে কাজ করিতে হয়; তাহা হইলেই আর গোঁড়ামি আসিবে না। যখন আমরা জানিতে পারি, এই জগৎ কুকুরের

কোঁকড়ানো লেজের মতো, এবং উহা কখনও সোজা হইবে না, তখনই আমরা আর গোঁড়া হইব না।

অনেক প্রকার গোঁড়া আছে—মদ্যপান-নিবারক, চুরুট-নিবারক ইত্যাদি। এক সময়ে এই ক্লাসে একজন যুবতী মহিলা আসিতেন। তিনি এবং আর কয়েকজন মহিলা মিলিয়া চিকাগোয় একটি হল-বাড়ি করিয়াছেন; সেখানে শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। একদিন তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এই-সকল দোষের প্রতিকারের উপায় তিনি জানেন। আমি সেই উপায়টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি কি হল-বাড়িটির কথা জানেন না?' তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার মতে মানবজাতির যাহা কিছু অশুভ, ঐ 'হল-বাড়ি'টি তাহার অব্যর্থ মহৌষধ। ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাঁহারা মনে করেন, মেয়েদের যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। এই সবই গোঁড়ামি; আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখন গোঁড়া হইতে পারেন না।

গোঁড়ারা ঠিক ঠিক কাজ করিতে পারে না। জগতে যদি গোঁড়ামি না থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিত। গোঁড়ামি দ্বারা মানবজাতির উন্নতি হয়—এরূপ চিন্তা করা ভুল। পক্ষান্তরে উহাতে বরং উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া যায়। আমরা যাহা করি বা আমাদের যাহা আছে, মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা আমাদের নাই, তাহার কোন মূল্য নাই।

অতএব যখনই গোঁড়ামির ভাব আসিবে, তখন সর্বদাই সেই কুকুরের লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোমার উদ্বিগ্ন অথবা বিনিদ্র হইবার প্রয়োজন নাই; তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে। যখন তোমার এই গোঁড়ামি থাকিবে না, কেবল তখনই তুমি ভালভাবে কাজ করিতে পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা উত্তমরূপে বিচার করিয়া কাজ করে, যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাজ

করে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গোঁড়ারা নির্বোধ—সহানুভূতিহীন; তাহারা জগৎকে তো সোজা করিতে পারেই না, নিজেরাও পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তোমাদের নিজেদের ইতিহাসে 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত ব্যক্তিদের কথা কি স্মরণ নাই? যখন তাঁহারা প্রথমে এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা 'পিউরিটান' ছিলেন, নিজেদের খুব পবিত্র ও সাধু-প্রকৃতি মনে করিতেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহারা অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। যাহারা নিজেরা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসে, তাহারাই আবার সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আমি দুইটি অদ্ভুত জাহাজের কথা শুনিয়াছি—প্রথম 'নোয়ার আর্ক' ও দ্বিতীয় 'মে-ফ্লাওয়ার'। য়াহুদীরা বলেন, সমুদয় সৃষ্টি 'নোয়ার আর্ক' হইতে আসিয়াছে; আর মার্কিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আসিয়াছে। এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আসেন নাই। এ আর এক রকমের গোঁড়ামি। গোঁড়াদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ নব্বইজনের যকৃৎ দূষিত, অথবা তাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অথবা তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেরাও বুঝিবেন যে, গোঁড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ—আমি ইহা যথেষ্ট দেখিয়াছি। প্রভু আমাকে গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করুন।

এই গোঁড়ামি-সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের কোনপ্রকার গোঁড়া বা একঘেয়ে সংস্কার-কার্যের সহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা কি বলিতে চাও যে, মদ্যপান-নিবারক গোঁড়ারা মাতাল-বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে? গোঁড়াদের গোঁড়ামির কারণ এই যে, তাহারা এই গোঁড়ামি করিয়া নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ইহারা লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়। এই গোঁড়ার দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই শিখিবে—কিরূপে প্রকৃতভাবে ভালবাসিতে হয় এবং সহানুভূতি করিতে হয়, তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহানুভূতি করা সম্ভব হইবে;

তখনই বুঝিবে—সেও তোমাদের মতো একজন মানুষ; তখনই তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নানা অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার মতো অবস্থায় পড়িতে, হয়তো আত্মহত্যা করিতে। আমার একটি নারীর কথা মনে হইতেছে—তাহার স্বামী ছিল ঘোর মাতাল। স্ত্রীলোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত পানদোষ-সম্বন্ধে অভিযোগ করিত। আমার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা—অধিকাংশ লোক তাহাদের স্ত্রীর দোষে মাতাল হইয়া থাকে। তোষামোদ করা আমার কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে-সকল অবাধ্য মেয়েদের মন হইতে সহগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুঠোর ভিতর রাখিবে, এবং যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলে, তখনই চীৎকার করিতে থাকে—এরূপ মেয়েরা জগতের মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এই নারীগণ অর্ধাশন-পীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে, আর তাহারাও বলিতেছে, 'মহিলাগণ, আপনারাই জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব।' তখন আবার ঐ রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, 'ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক', আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে; কিন্তু জীবনটা তো এরূপ একটা তামাসা নয়; জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় অনেক আছে।

এখন তোমাদিগকে আজিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি পুনরালোচনা করিতে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী, জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান।

তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন বিশ্ব জগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কাজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য—দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা। এ জগৎ একটি বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশালা—এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে দিন দিন আমরা আরও বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারি। চতুর্থতঃ আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিপরীত। গোঁড়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসে, 'আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে, এমন মানুষ দেখিবার জন্য আমি দূর-দূরান্তরে যাইতেও প্রস্তুত। ঐরূপ বলা খুব সহজ! যদি আমরা উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারি, তবে তো আমরা সিদ্ধ হইয়া যাই! ঐরূপ করা বড় সহজ নয়। অধিকন্তু যতই আমরা ধীরস্থির হইব এবং আমাদের স্নায়ুসমূহও যতই শান্ত হইবে, ততই আমরা অধিকতর প্রেমসম্পন্ন হইব এবং আরও ভালরূপে কর্ম করিতে সমর্থ হইব।

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কায় মন ও বাক্য দ্বারা কৃত প্রত্যেক কার্যই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের কার্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তোমরা হয়তো সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কেহ যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সে ক্রমশঃ আরও মন্দ হইতে থাকে এবং যখন সৎকার্য করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে—সর্বদাই ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আর এক মনের উপর কার্য করে—এই তত্ত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্তিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, আমি যখন কোন কর্ম করিতেছি, তখন আমার মন কোন নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একসুরে বাঁধা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও সেই সুরে বাজিয়া উঠিবার প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইরূপ যে-সকল মন একসুরে বাঁধা, একরূপ চিন্তা তাহাদের উপর সমভাবে কার্য করিবে। অবশ্য দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হইবে, কিন্তু মনের প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদা থাকিবে। মনে কর, আমি কোন মন্দ কাজ করিতেছি, আমার মন কম্পনের এক বিশেষ সুরে রহিয়াছে, তাহা হইলে জগতের সেইরূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এইরূপে যখন আমি কোন ভাল কাজ করি, তখন আমার মন আর এক সুরে বাজিতেছে এবং সেই সুরে বাঁধা সকল মনই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। তানশক্তির তারতম্য অনুসারে মনের উপর মনের এই প্রভাব-বিস্তারের শক্তিও কম-বেশী হয়।

এই উপমাটি লইয়া আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা যাইবে যে, আলোক-তরঙ্গগুলি যেমন কোন বস্তুতে প্রতিহত হইবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর শূন্যমার্গে

ভ্রমণ করিতে পারে, এই চিন্তাতরঙ্গগুলিও যতদিন না সমভাবে স্পন্দিত হইবার মতো একটি বস্তু লাভ করে, ততদিন হয়তো শত শত বৎসর ঘুরিতে থাকিবে। খুব সম্ভব আমাদের এই বায়ুমণ্ডল এইরূপ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত প্রত্যেকটি চিন্তাই যেন এইরূপ স্পন্দিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে—যতদিন না উহা একটি উপযুক্ত আধার প্রাপ্ত হয়। যে-কোন চিত্ত এই আবেগসমূহের কিছু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত শীঘ্রই ঐভাবে স্পন্দিত হয়। সুতরাং যখন কেহ কোন অসৎ কর্ম করে, তখন তাহার মন এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়; আর সেই সুরের যে-সকল তরঙ্গ পূর্ব হইতেই বায়ুমণ্ডলে রহিয়াছে, সেগুলি তাহার মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই যে অসৎ কাজ করে, সে সাধারণতঃ দিন দিন আরও বেশী অসৎ কাজই করিতে থাকে। তাহার কর্ম ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। যে ভাল কাজ করে, তাহার পক্ষেও এইরূপ। তাহার বায়ুমণ্ডলে শুভতরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাহার শুভকর্মগুলি অধিক শক্তিলাভ করিবে। অতএব অসৎ কর্ম করিতে গিয়া দুই প্রকার বিপদে আমরা পড়িতে পারি—প্রথমতঃ আমাদের চারিদিকের অসৎ প্রভাবগুলিতে আমরা যেন গা ঢালিয়া দিই; দ্বিতীয়তঃ আমরা নিজেরা এরূপ সব অশুভ তরঙ্গ সৃষ্টি করি, যেগুলি শত শত বৎসর পরেও অপরকে আক্রমণ করিতে পারে। হইতে পারে আমাদের অশুভ কার্য অপরকে আক্রমণ করিবে। অসৎ কর্ম করিয়া আমরা নিজেদের এবং অন্যেরও অনিষ্ট করি; সৎ কর্ম করিয়া নিজেদের এবং অন্যেরও উপকার করি। অন্যান্য শক্তির ন্যায় মানুষের অভ্যন্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির হইতে বল সঞ্চয় করে।

কর্মযোগের মতে কৃত কর্ম ফল প্রসব না করিয়া কখনই নষ্ট হইতে পারে না; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কোন অসৎ কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব; জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা উহাকে রোধ করিতে পারে না। এইরূপে কোন সৎ কর্ম করিলেও জগতে কোন শক্তিই উহার শুভ ফল রোধ করিতে পারে না। কারণ থাকিলে কার্য হইবেই; কিছুই উহাকে বাধা দিতে পারে না—রোধ করিতে পারে না। এখন কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতেছে, যথা—আমাদের

এই-সকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। আমরা একটি সীমারেখা টানিয়া বলিতে পারি না—এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ মন্দ। এমন কোন কর্ম নাই, যাহা একই কালে শুভ অশুভ দুইপ্রকার ফলই প্রসব না করে। একটি নিকটের উদাহরণ লওয়া যাক: আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি; তোমাদের মধ্যে হয়তো কেহ কেহ ভাবিতেছে, আমি ভাল কাজ করিতেছি। কিন্তু ঐ একই সময়ে হয়তো আমি বায়ুমণ্ডলস্থ সহস্র সহস্র কীটাণু ধ্বংস করিতেছি। এইরূপে আমি কাহারও অনিষ্ট করিতেছি। যখন আমাদের কাজ নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমরা ঐ কাজকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণ-স্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমরা ভাল বলিতে পারো, কীটাণুগুলি কিন্তু তা বলিবে না। কীটাণুগুলিকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, নিজেদেরই দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর আমার কথা বলার প্রভাব প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগুলির উপর উহার প্রভাব তত প্রত্যক্ষ নয়। এইরূপে যদি আমরা আমাদের অসৎ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব—ঐগুলি দ্বারাও হয়তো কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে। যিনি শুভ কর্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আবার অশুভের মধ্যে কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম-রহস্য বুঝিয়াছেন।[১]

কিন্তু ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ অপবিত্র—এখানে হিংসা বা অহিংসা এই অর্থে 'অপবিত্রতা' অথবা 'পবিত্রতা' গ্রহণ করিতে হইবে। অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমরা বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুনই অপর কতকগুলি প্রাণীর কষ্ট হইতেছে; হইতে পারে তাহারা মানুষ অথবা প্রাণী অথবা কীটাণু, কিন্তু যাহারই হউক না, আমরা কোন-না-কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কুচিত করিতেছি, স্থানসঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। এইরূপই যদি হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্মদ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ

১ তুলনীয়: গীতা, ৪।১৮

করা যায় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার-রূপ গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইবে না; তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারো, কর্মফলে শুভ ও অশুভের অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নাই।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই: কর্মের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময়ে এই জগৎ পূর্ণতা লাভ করিবে; তখন ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ বা দুর্নীতি থাকিবে না। ইহা খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহা খুবই প্রেরণা জোগায়, কিন্তু যদি আমরা এক মুহূর্ত চিন্তা করি, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিব, এরূপ কখনও হইতে পারে না। কিরূপে ইহা হইতে পারে? —ভাল-মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কিরূপে পাওয়া যায়? পূর্ণতার অর্থ কি? 'পরিপূর্ণ জীবন' একটি স্ব-বিরোধী বাক্য। প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তুর সহিত আমাদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমরা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছি, যদি আমরা ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহার ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা—এই তো জীবন। আহার বা বায়ু না পাইলেই আমাদের মৃত্যু। জীবন একটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, উহা রীতিমত একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে যে জটিল সংগ্রাম, তাহাকেই আমরা জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে।

আদর্শ সুখ বলিতে বুঝায়—এই সংগ্রামের সমাপ্তি। কিন্তু তাহা হইলে জীবনও শেষ হইবে, কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ হইতে পারে যখন জীবনের শেষ। এই অবস্থার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমরা থাকিব না। অতএব অন্যত্র যা হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ—এই আদর্শ-যুগ—কখনই আসিতে পারে না।

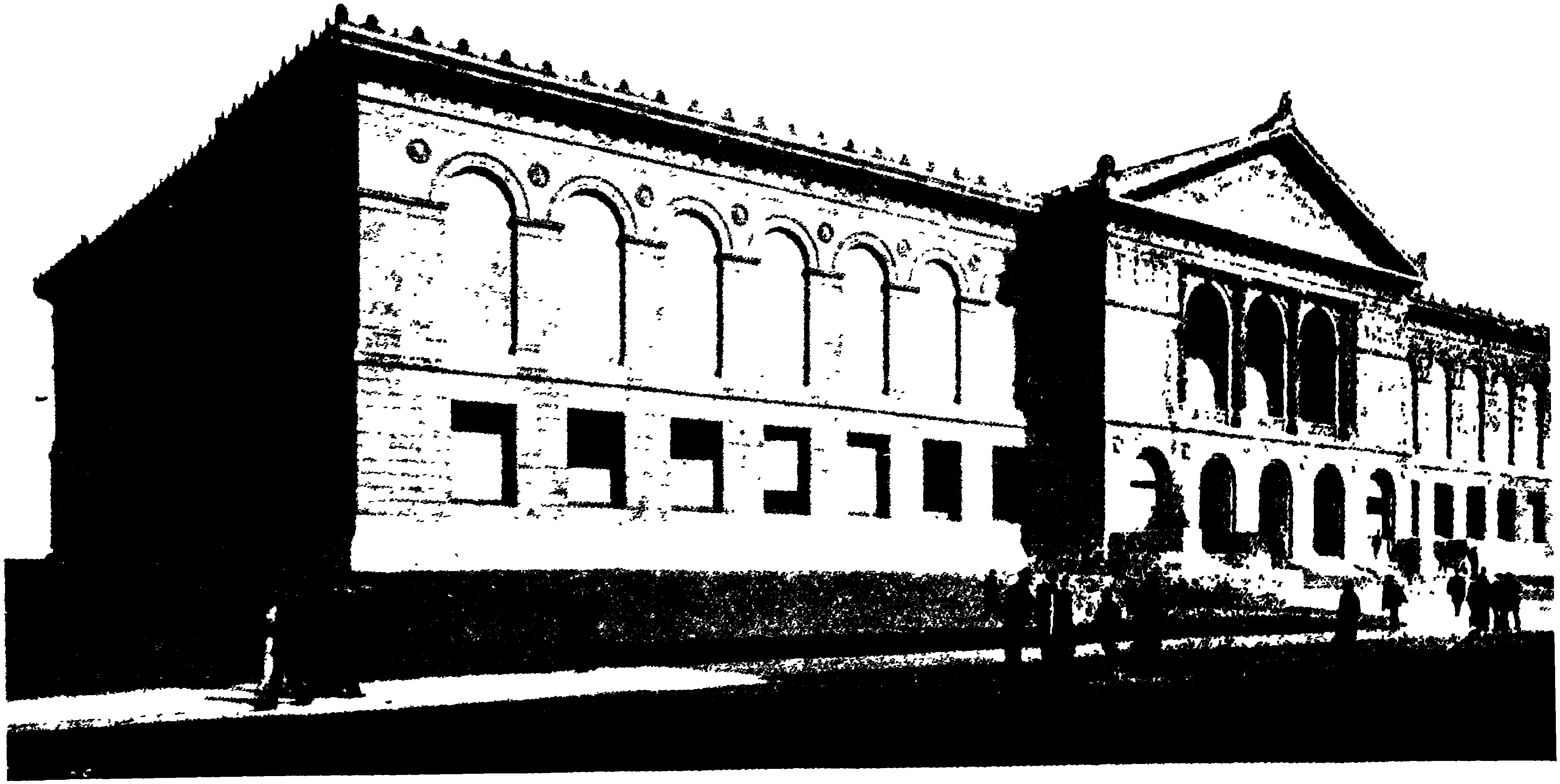
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য করি, তাহার মুখ্য ফল—আমাদের চিত্তশুদ্ধি। সর্বদা অপরের কল্যাণ-

চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি। এই আত্মবিস্মৃতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। মানুষ মূর্খের মতো মনে করে, স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে, এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

পরোপকার-মূলক প্রতিটি কার্য, সহানুভূতি-সূচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে আমরা যেটুকু সাহায্য করি—এরূপ প্রত্যেকটি সৎকার্য আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'র গরিমা কমাইতেছে এবং আমাদের ভাবিতে শিখাইতেছে, আমরা অতি সামান্য, সুতরাং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদর্শ—অনন্তকালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোন 'আমি' নাই, সব 'তুমি'। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মানুষকে ঐ লক্ষ্যেই লইয়া যায়।

একজন ধর্মপ্রচারক নির্গুণ (ব্যক্তিভাবশূন্য) ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ভয় পাইতে পারেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব—এগুলির তাৎপর্য তিনি যাহাই বুঝুন—অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে নৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাই সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই ভাবটি মনুষ্যে পশুতে বা দেবতায়—সর্বত্র সমভাবে একমাত্র 'মাপকাঠি'রূপে প্রয়োগ করিতে পারো; এই আত্মত্যাগই সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে অনুস্যূত একমাত্র মূল তত্ত্ব—ইহাই প্রধান ভাব।

এ জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ দেব-প্রকৃতি মানব—ইহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করেন। ইহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি কোন দেশে এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিগণ—যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক—ইহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। একজন সংস্কৃত



আর্ট ইনিষ্টিটিউট্, চিকাগো

কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু-মহাত্মারা ভালোর জন্যই ভালো করিয়া থাকেন, তেমনই সর্বনিম্ন প্রান্তে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাহাদের স্বভাব।

দুইটি সংস্কৃত শব্দ আছে: একটি—'প্রবৃত্তি', সেইদিকে আবর্তিত হওয়া অর্থাৎ যাওয়া; আর একটি—'নিবৃত্তি', সেদিক হইতে নিবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ ফিরিয়া আসা। 'সেইদিকে বর্তিত হওয়া'কে সংসার বলি। এই 'আমি-আমার'—যাহা কিছু এই 'আমি'কে টাকা-কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বারা সর্বদাই সমৃদ্ধ করিতেছে—এগুলি সব প্রবৃত্তির অন্তর্ভূত। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি সব কিছু আঁকড়াইয়া ধরা। সর্বদাই সব জিনিস এই 'আমি'-রূপ কেন্দ্রে জড়ো করা। ইহাই প্রবৃত্তি—ইহাই মনুষ্যমাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, চারিদিক হইতে যাহা কিছু সব গ্রহণ করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ো করা। সেই কেন্দ্র তাহার নিজের মধুর 'আমি'। যখন এই প্রবণতা ভাঙিতে থাকে, যখন নিবৃত্তি বা 'সেইদিক হইতে চলিয়া যাওয়ার ভাব' আসে, তখনই নীতি এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' উভয়ই কর্ম; প্রথমটি অসৎ কর্ম, দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার পূর্ণতাই সম্পূর্ণ 'আত্মত্যাগ'—পরের জন্য মন, শরীর, এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্ম-যোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎকর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র জীবনে একটি দর্শনশাস্ত্রও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনও কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তো সারা জীবনে একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাঁহার জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাসনা দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং দেখি—জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত সকলে একই স্থানে উপনীত হইলেন, মিলিত হইলেন। এই একস্থান—

আত্মত্যাগ। মানুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধর্মবিষয়ক পদ্ধতি যতই ভিন্ন হউক না কেন, পরার্থে আত্ম-বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র মানবজাতি সসম্ভ্রমে ও ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার মতবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না,—এমন কি, যাহারা সর্বপ্রকার ধর্মভাবের বিরোধী, তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জনের কোন কাজ দেখে, তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা করিতেই হইবে। তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া খ্রীষ্টানও যখন এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলোক' (Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন—যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই প্রচার করেন নাই? ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে, তাহার ও যাহাদের সহিত তাহার মত-বিরোধ, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। উপাসক ভক্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরের ভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ রক্ষা করিয়া অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'। তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। ইহাই আত্মত্যাগ। দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা দেখেন, এই আপাতপ্রতীয়মান 'আমি' ভ্রমমাত্র, এবং সহজেই উহা পরিত্যাগ করেন। ইহাও সেই আত্মত্যাগ। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারকগণ যে শিখাইয়াছেন 'ভগবান্ জগৎ নন'—তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ। জগৎ এক জিনিস, ভগবান্ আর এক জিনিস—এই পার্থক্য অতি সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর। এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। তাহা হইলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন। আর একজন হয়তো কুটীরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই; তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন।

এখন আমাদের মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক। আমরা বলি, ভাল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তার সঙ্গে কিছু ভাল না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা জানিয়া আমরা কর্ম করিব কিরূপে? এই তত্ত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহারা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে

আত্মহত্যা করাই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় ; কারণ জীবন-ধারণ করিতে গেলেই মানুষকে ছোট ছোট জীবজন্তুর ও বৃক্ষলতার জীবন নষ্ট করিতে হইবে, অথবা কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং তাহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—মৃত্যু। এই মতবাদকে জৈনগণ তাঁহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গীতাতেই ইহার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়—ইহাই অনাসক্তির তত্ত্ব, জীবনে কাজ করিয়া কিছুতেই আসক্ত না হওয়া। জানিয়া রাখো—যদিও তুমি জগতে রহিয়াছ, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; যাহাই কর না কেন, তাহা নিজের জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কার্য যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ করিতে হইবে, অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন কার্যই হউক, তাহা যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যঞ্জক একটি বাক্য পাওয়া যায় : 'যদি কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াও হত্যা করেন না, বা হত হন না।'[১] এইজন্যই কর্মযোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়, 'সংসার ত্যাগ করিও না ; সংসারে বাস কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা গ্রহণ কর ; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্য কাজ একেবারেই করিও না।' ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে মারিয়া ফেল, তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া দেখ, যেমন প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা বলিতেন, 'পুরাতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।' 'পুরাতন মানুষ' শব্দের অর্থ : জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নির্মিত হইয়াছে—এই স্বার্থপর ভাব। অজ্ঞ পিতামাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শেখান, 'হে প্রভো, তুমি এই সূর্য চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ'। প্রভুর যেন এই সব শিশুর জন্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল

১ তুলনীয় : গীতা, ২।২ , কঠ-উপ. ১।২।১৮

না! ইহা আমাদের কামনারূপ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করা মাত্র। সন্তানদিগকে এমন বাজে কথা শিখাইও না। তারপর আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আবার আর এক ধরনের নির্বোধ। তাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন, আমরা মারিয়া খাইব বলিয়াই এই-সকল জীবজন্তু সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই জগৎ মানুষের ভোগের জন্য। এও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা। বাঘও বলিতে পারে, 'মানুষ আমার জন্য সৃষ্ট' এবং ভগবান্‌কে বলিতে পারে, 'প্রভো, মানুষগুলি কি দুষ্ট! তাহারা স্বেচ্ছায় আমাদের সম্মুখে আহাররূপে আসিয়া হাজির হয় না। তাহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে।' যদি জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরাও জগতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—এই অতি দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবৎসর ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে, জগতের সেদিকে খেয়ালই নাই। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। জগৎ যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখানি জগতের জন্য।

অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হইলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হৈচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও না; নিজে সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও। আমার গুরুদেব বলিতেন, 'নিজ সন্তানদের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর।' দাসী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে, অতি যত্নের সহিত লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান; কিন্তু দাসীকে বিদায় দিবামাত্র সে গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যায়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাব পোষণ কর। তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর, যাহা কিছু তোমার মনে কর, সবই তাঁহার। অত্যধিক দুর্বলতাই অনেক সময় মহত্তম কল্যাণ ও শক্তির ছদ্মবেশে দেখা দেয়। আমার উপর কেহ নির্ভর করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত দুর্বলতা। এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তি জন্মায় এবং এই

আসক্তি হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব। আমাদের মনকে জানানো উচিত যে, এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিই সকলকে সাহায্য করিতেছে। আমরা কোটি কোটি মানুষ না থাকিলেও এইরূপ সাহায্য চলিবে। তোমার আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অপরকে সাহায্য করিয়া আমরা নিজেরাই শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাই তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য। সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ শিক্ষাই শিখিতে হইবে। যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে ইহা শিক্ষা করিতে পারিব, তখন আর আমাদের দুঃখ থাকিবে না, তখন আমরা সমাজে যেখানে খুশি সেখানে গিয়া মিশিতে পারিব, কোন ক্ষতি হইবে না। তোমাদের পতি-পত্নী দাস-দাসী—রাজ্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্ত্বটি হৃদয়ে রাখিয়া কাজ কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্য নয়, আর তুমি সাহায্য না করিলে চলিবে না, এমনও নয়, তবেই ঐ-সকল বস্তু তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই বৎসরই হয়তো তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগৎ কি স্বীয় গতি রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহার স্রোত কি বন্ধ হইয়া আছে? না, ইহা ঠিকই চলিয়া যাইতেছে। অতএব তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়া দাও যে, তোমাকে জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্যই আমার জন্ম—এ-কথা চিন্তা করা কোন মানুষের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। উহা নিছক অহঙ্কার। উহা স্বার্থপরতা—ধর্মের রূপ ধরিয়া প্রতারণা করিতেছে। তোমার অথবা অন্য কাহারও উপর জগৎ নির্ভর করে না—এই ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য যখন তোমার স্নায়ু ও পেশীগুলিকে গঠিত করিবে, তখন কর্মজনিত কোন প্রতিক্রিয়া তোমাকে পীড়িত করিবে না। যখন তুমি কোন লোককে কিছু দাও এবং পরিবর্তে কিছুই আশা না কর, সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকুক এটুকুও না চাও, তখন তাহার অকৃতজ্ঞতা তোমার উপর কোন প্রতিক্রিয়া করিবে না, কারণ তুমি কিছুই প্রত্যাশা কর নাই, কখনই চিন্তা কর নাই যে, তোমার প্রতিদান পাইবার কোন অধিকার আছে। তাহার

যাহা প্রাপ্য ছিল, তুমি তাহাই দিয়াছিলে। তাহার নিজ কর্মের ফলেই সে উহা পাইয়াছে, তোমার কর্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মাত্র। কিছু দান করিয়া তুমি গর্ববোধ করিবে কেন—তুমি তো উহার বাহক মাত্র? জগৎ নিজ কর্মের দ্বারা উহা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিল। ইহাতে তোমার অহঙ্কারের কারণ কি? জগৎকে তুমি যাহা দিতেছ, তাহা এমন একটা বড় কিছু নয়। অনাসক্তির ভাব লাভ করিলে তোমার পক্ষে আর ভাল বা মন্দ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। স্বার্থই কেবল ভালমন্দের প্রভেদ করিয়া থাকে। এইটি বুঝা বড় কঠিন, কিন্তু সময়ে বুঝিবে—যতক্ষণ না তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও, ততক্ষণ জগতের কোনকিছুই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যতক্ষণ না আত্মা অজ্ঞের মতো হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা হারায়, ততক্ষণ কোন শক্তিই আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, অতএব অনাসক্তির দ্বারা তুমি তোমার উপর কোন কিছুর প্রভাব জয় কর—অস্বীকার কর। কোন জিনিসের তোমার উপর কিছু করিবার অধিকার নাই—এ-কথা বলা খুব সহজ; কিন্তু যিনি বাস্তবিকই কোন শক্তিকে তাঁহার উপর কাজ করিতে দেন না, বহির্জগৎ যাঁহার উপর কাজ করিলে যিনি সুখীও হন না, দুঃখিতও হন না—সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি? লক্ষণ এই যে, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য কিছুই তাঁহার মনে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না; সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে থাকেন।

ভারতে ব্যাস-নামক এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বেদান্ত-সূত্রের লেখক-রূপে পরিচিত, তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। ইঁহার পিতা সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই; তাঁহার পিতামহও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও পারেন নাই; এইরূপে তাঁহার প্রপিতামহও চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র শুকদেব সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্যাস সেই পুত্রকে জ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। নিজে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া তিনি শুকদেবকে জনক-রাজার সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি একজন বড় রাজা ছিলেন এবং 'বিদেহ জনক' নামে অভিহিত হইতেন; 'বিদেহ' শব্দের অর্থ 'দেহজ্ঞানশূন্য' যদিও তিনি একজন রাজা, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্বদা 'আত্মা' বলিয়াই অনুভব করিতেন।

বালক শুককে শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। রাজা জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তিনি পূর্ব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন এই বালক গিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরিগণ তাঁহার কোন খবরই লইল না। তাহারা কেবল তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি আসন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না; তিনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন—কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না! তিনি এত বড় একজন ঋষির পুত্র, তাঁহার পিতা সমগ্র দেশে সম্মানিত, তিনি নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহসা রাজার মন্ত্রিগণ এবং বড় বড় কর্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিতরে এক সুশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন, সুগন্ধি জলে স্নান করাইলেন, খুব ভাল ভাল পোশাক পরিতে দিলেন, আট দিন ধরিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিলাসের ভিতর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু এই ব্যবহারের পরিবর্তনে শুকের শান্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল না। দ্বারে অপেক্ষা করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-সকল বিলাসের মধ্যেও তিনি ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল। রাজা তাঁহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাটি দুধ দিয়া বলিলেন, 'এই দুধের বাটিটি লইয়া সাতবার রাজসভা প্রদক্ষিণ করিয়া এস; সাবধান, যেন এক ফোঁটা দুধও না পড়ে!' বালকও সেই বাটিটি লইয়া এইসব গীত-বাদ্য ও সুন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয়া সাতবার সভা প্রদক্ষিণ করিলেন, এক ফোঁটা দুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছু দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে না। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়া আসিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন 'তোমার পিতা তোমাকে যাহা শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলব্ধি করিয়াছ; এখন গৃহে গমন কর।'

অতএব দেখা গেল, যে-ব্যক্তি নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, বাহিরের কোন বস্তু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার যোগ্য। আমরা সচরাচর দুই মতের মানুষ দেখিতে পাই। কেহ কেহ দুঃখবাদী—তাঁহারা বলেন, এ পৃথিবী কি ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতকগুলি ব্যক্তি সুখবাদী—তাঁহারা বলেন, এই জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব! যাঁহারা নিজেদের মন জয় করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখে পূর্ণ, অথবা সুখদুঃখমিশ্রিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা যখন আমাদের মনকে বশীভূত করিতে পারিব, তখন এই সংসার আবার সুখের বলিয়া মনে হইবে। তখন কোন কিছুই আমাদের মনে ভাল বা মন্দ ভাব উৎপন্ন করিতে পারিবে না। আমরা সবই বেশ যথাস্থানে সামঞ্জস্য-পূর্ণ দেখিতে পাইব। যাহারা প্রথমে সংসারকে নরককুণ্ড বলিয়া মনে করে, তাহারাই আত্মসংযমে সমর্থ হইলে এই জগৎকে স্বর্গ বলিবে। আমরা যদি প্রকৃত কর্মযোগী হই এবং নিজদিগকে এই অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা যেখানেই আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় উপনীত হইবই; যখনই এই কল্পিত 'অহং' চলিয়া যায়, তখনই যে-জগৎ প্রথমে অমঙ্গলপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহা পরমানন্দে পূর্ণ এবং স্বর্গ বলিয়া বোধ হইবে। ইহার হাওয়া পর্যন্ত শান্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে, প্রত্যেক মানুষের মুখচ্ছবি ভাল বলিয়া বোধ হইবে। ইহাই কর্মযোগের চরম গতি ও উদ্দেশ্য, এবং ইহাই কর্মজীবনে পূর্ণতা বা সিদ্ধি।

অতএব দেখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগ পরস্পর-বিরোধী নয়। প্রত্যেকটিই আমাদিগকে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটিই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসই সিদ্ধির সমগ্র রহস্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস—প্রত্যেক যোগ সম্বন্ধেই ইহা সত্য। প্রথমে শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে; অনেক বিষয় যাহা একেবারে বুঝিতে পার না, তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মননের ফলে স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সব বিষয় শোনামাত্রই বুঝা বড় কঠিন। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে

কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে—বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষও স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ-সকল তত্ত্ব অনুভব করিব এবং এই অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতে এমন প্রবল কর্মের শক্তি আসিবে যে, তাহা প্রতি শিরায়, প্রতি স্নায়ুতে, প্রতি পেশীতে ক্রিয়া করিতে থাকিবে—যতক্ষণ না তোমার সমুদয় শরীরটি এই নিষ্কাম কর্মযোগের একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ—পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। ইহা কোন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। খ্রীষ্টানই হও, য়াহুদীই হও আর জেণ্টাইলই হও, তাহাতে কিছু আসে যায় না; একমাত্র জিজ্ঞাস্য—তুমি কি স্বার্থশূন্য? যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি ধর্মপুস্তকও না পড়িয়া এবং কোন গির্জায় বা মন্দিরে না গিয়াও সিদ্ধ হইবে। আমাদের বিভিন্ন যোগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র সহায়তা না লইয়া মানুষকে পূর্ণ করিতে সমর্থ; কারণ প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য একই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—সকল যোগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ ও অন্যনিরপেক্ষ উপায়। 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ'—অজ্ঞেরাই কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নয়। জ্ঞানীরা জানেন, আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শেষ পর্যন্ত ঐ দুই পথ মানুষকে পূর্ণতারূপ একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

মুক্তি

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'কার্য' এই অর্থ ব্যতীত 'কর্ম'-শব্দদ্বারা মনোবিজ্ঞানে কার্য-কারণ-ভাবও বুঝাইয়া থাকে। যে কোন কার্য বা যে-কোন চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাকেই 'কর্ম' বলে। সুতরাং 'কর্মবিধানে'র অর্থ কার্য-কারণের নিয়ম—অর্থাৎ কারণ ও কার্যের অনিবার্য সম্বন্ধ। আমাদের (ভারতীয়) 'দর্শনে'র মতে এই 'কর্মবিধান' সমগ্র বিশ্বজগতের পক্ষেই সত্য। যাহা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, অথবা যে-কোন কাজ করি—বিশ্বজগতে যাহা কিছু কাজ হইতেছে—সবই একদিকে পূর্বকর্মের ফলমাত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কারণ হইয়া অন্য ফল উৎপাদন করে। এই সঙ্গে বিচার করা আবশ্যক 'বিধি' বা 'নিয়ম' বলিতে কি বুঝায়। ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমরা দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা ঘটিতেছে, কখন বা ঘটনা-দুইটি যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমরা আশা করি, সর্বদাই এরূপ ঘটিবে। আমাদের দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'ব্যাপ্তি' বলিতেন। তাঁহাদের মতে নিয়মসম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণার কারণ 'অনুষঙ্গ'। ঘটনাপরম্পরা আমাদের মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত থাকে। সেইজন্য যখনই আমরা কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলির সহিত ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব—অথবা আমাদের মনোবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। মনোবিজ্ঞানে ইহাকেই 'ভাবানুষঙ্গ-বিধান' বলে, আর 'কার্য কারণ-সম্বন্ধ' এই ব্যাপক বিধানের একটি দিকমাত্র। ভাবানুষঙ্গের এই ব্যাপকতাকেই সংস্কৃতে 'ব্যাপ্তি' বলে। অন্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতেও তেমনি বিধান বা নিয়মের ধারণা একই প্রকার; একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটিবে—তাহা এবং ঘটনাপরম্পরা বার বার ঘটিতে থাকিবে, আমরা এইরূপই আশা করি। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই। কার্যতঃ ইহা বলা ভুল যে, মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথবা প্রকৃতির কোন স্থলে বস্তুগতভাবে কোন নিয়ম আছে। যে প্রণালীতে আমাদের মন

কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা ধারণা করে, সেই প্রণালীই নিয়ম; এই নিয়ম আমাদের মনে অবস্থিত। কতকগুলি ঘটনা একটির পর আর একটি অথবা একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিবে; ঘটনাপরম্পরা কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের মন এইভাবেই তাহা ধরিতে পারে। ইহাকেই বলা হয়—নিয়ম।

এখন জিজ্ঞাস্য—'নিয়ম সর্বব্যাপক' বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের জগৎ অনন্ত সত্তার সেইটুকু অংশ, যাহাকে আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ 'দেশ-কাল-নিমিত্ত' বলেন এবং ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাহা স্থান কাল ও কারণ (space, time, causation) বলিয়া পরিচিত। এই জগৎ সেই অনন্ত সত্তার এতটুকু অংশমাত্র, একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা, দেশ-কাল-নিমিত্তে গঠিত। ঐরূপ ছাঁচে ঢালা অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। অপরিহার্যভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই কার্য-কারণ-নিয়ন্ত্রিত জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। যখন আমরা এই জগতের কথা বলি, তখন আমরা বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, যে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ আমরা অনুভব করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্তা করি এবং কল্পনা করি, সেইটুকুই কেবল নিয়মাধীন; কিন্তু ইহার বাহিরের সত্তা নিয়মের অধীন নয়, যেহেতু কার্য-কারণ-ভাব আমাদের মনোজগতের বাহিরে আর যাইতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের অতীত কোন বস্তুই এই কার্য-কারণ-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়, কারণ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভাবানুষঙ্গ-সম্বন্ধ নাই, এবং ভাব-সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। নাম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা বা চৈতন্য কার্য-কারণ-নিয়ম মানিয়া চলেন এবং তখনই বলা হয়, উহা নিয়মের অধীন, যেহেতু কার্য-কারণ-সম্বন্ধই সকল নিয়মের মূল। এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; ঐ শব্দগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কারণ ইচ্ছা জ্ঞানের অন্তর্গত, এবং যাহা কিছু আমরা জানি, সে-সবই আমাদের জগতের অন্তর্গত। আবার জগতের অন্তর্গত সবকিছুই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে ঢালা। যাহা কিছু আমরা জানি, বা যাহা কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সবই কার্য-কারণের অধীন; এবং যাহা কিছু কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন, তাহা

কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্যান্য বস্তু ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং ইহাও আবার অপরের কারণ হয়, এইরূপ চলিতেছে। যাহা পূর্বে 'ইচ্ছা' ছিল না, কিন্তু ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে পড়িয়া মানুষের ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মুক্তস্বভাব; আর যখন এই ইচ্ছা কার্য-কারণ-চক্র হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন আবার স্বাধীন বা মুক্ত হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা আসে, এই বন্ধনের ছাঁচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আসে, কোথায় অবস্থান করে এবং কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে—মুক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি, বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যখন আমরা বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হইবে সেই সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মানুষ। এই দেহ ও এই মন—যাহা আমরা দেখিতেছি, এগুলি সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই সেই অনন্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমাদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, আনন্দ ও বিষাদ, আমাদের সুখ ও আশা—সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। আমাদের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতে সীমাবদ্ধ। অতএব দেখিতেছ, আমাদের মনের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্র জগৎ চিরকাল থাকিবে—এরূপ আশা করা এবং স্বর্গে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করা কি ছেলেমানুষি! স্বর্গের অর্থ—আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। স্পষ্টই দেখিতেছ, অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা কি ছেলেমানুষি ও অসম্ভব বাসনা! অতএব যখন মানুষ বলে, সে এইভাবেই চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে, তাহা লইয়াই চিরদিন থাকিবে, অথবা আমি যেমন-কখন কখন বলি, যখন মানুষ 'আরামের ধর্ম' চায়, তখন তোমরা নিশ্চয় জানিও—তাহার এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নততর কিছুই ধারণা করিতে পারে না; সে নিজের অনন্ত স্বরূপ ভুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিন্তা এইসব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ এবং সাময়িক ঈর্ষায় আবদ্ধ। এই সান্ত জগৎকেই সে অনন্ত বলিয়া মনে করে। শুধু তাই নয়, সে এই মূর্খতা কোনমতে ছাড়িবে না। সে প্রাণপণে 'তৃষ্ণা'কে—জীবন-বাসনাকে আঁকড়াইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'তঞ্ঞ্হা বা তিস্সা' বলে।

আমাদের জ্ঞাত ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে অসংখ্য প্রকার সুখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতি এবং অসংখ্য প্রকার কার্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু এ-সবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশমাত্র।

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'বুদ্ধির অতীত শান্তি' বলিয়া থাকেন, তাহা এই জগতে পাওয়া যাইতে পারে না—স্বর্গেও নয়, অথবা এমন কোন স্থানেও নয়, যেখানে আমাদের চিন্তাশক্তি ও মন যাইতে পারে, যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করিতে পারে, অথবা কল্পনা-শক্তি যাহা কল্পনা করিতে পারে—এরূপ কোন স্থানেই সেই মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এ-সকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের অন্তর্গত হইবে, এবং সেই জগৎ দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্থান থাকিতে পারে, যেখানে ভোগ তীব্রতর, কিন্তু সে-সকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, সুতরাং নিয়মের বন্ধনের ভিতর; অতএব আমাদিগকে এ-সকলের বাহিরে যাইতে হইবে, এবং যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান—সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। যতদিন না আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জন দিতে পারি, যতদিন না এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন জগতের অতীত সেই অনন্ত মুক্তির এটুকু আভাসও পাইবার আশা আমাদের নাই। অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্য-জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য 'মুক্তি' লাভ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, সে উপায়—এই ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র জগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বর্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু সীমাবদ্ধ—সব ত্যাগ করা। যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা এখনই মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়—সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্য-কারণ-শৃঙ্খল বর্তমান।

কিন্তু এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকেই এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আসক্তি-

ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে বলে নিবৃত্তিমার্গ—উহাতে 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) করিয়া সব ত্যাগ করিতে হয়; আর একটিকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ—উহাতে 'ইতি ইতি' করিয়া সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল উন্নতমনা অসাধারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারা শুধু বলেন, 'না, আমি ইহা চাই না'; শরীর ও মন তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে, এবং তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হন। কিন্তু এরূপ মানুষ অতি বিরল। অধিকাংশ লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ—সংসারেরই পথ বাছিয়া লয়; এবং বন্ধনগুলিকেই ঐ বন্ধন ভাঙিবার উপায়রূপে ব্যবহার করে। ইহাও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে—ক্রমশঃ ত্যাগ করা হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিয়া, এইরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইয়া মন অবশেষে ঐগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্তি-লাভের প্রথমোক্ত মার্গের সাধন—বিচার, আর শেষোক্ত পথের সাধন—কর্ম ও অভিজ্ঞতা। প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকার কর্ম করিতে অস্বীকার করাই এ পথের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি নাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, যাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চান না, যাঁহাদের মন কখনও আত্মা হইতে অন্যত্র গমন করে না, আত্মাই যাঁহাদের সর্বস্ব, শুধু তাঁহারাই কর্ম করিবেন না।[১] অবশিষ্ট সকলকে অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে।

একটি জলস্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে নামিতেছে। একটি গর্তের ভিতর পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে পরিণত হইল; সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বাহির হইয়া দুর্বারবেগে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্য-জীবন এই প্রবাহের মতো। উহাও ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে—নাম-রূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ 'আমার পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ' প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করে, অবশেষে বাহির হইয়া নিজের মুক্ত-ভাব ফিরিয়া পায়। সমুদয় জগৎ ইহাই করিতেছে, আমরা জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে

১ তুলনীয়: গীতা, ৩।১৭

আমরা সকলেই জগৎরূপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্য কাজ করিতেছি। সংসার-আবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

কর্মযোগ কি ?—কর্ম-রহস্য অবগত হওয়াই কর্মযোগ। আমরা দেখিতেছি সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে। কিসের জন্য ? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভের জন্য। পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা। সকল বস্তুই সর্বদা মুক্তিলাভ করিতে এবং বন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ—সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎটাকে এই কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি বলা যাইতে পারে। কর্মযোগ আমাদিগকে কর্মের রহস্য—কর্মের প্রণালী শিখাইয়া দেয়। এই জগতে চতুর্দিকে কেবল ধাক্কা না খাইয়া, অনেক বিলম্বে অনেক তর্কবিতর্কের পর প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-জিজ্ঞাসু আমরা কর্মযোগ হইতে কর্মের রহস্য, কর্মের প্রণালী এবং কর্মের সংগঠনী শক্তি শিক্ষা করি। ব্যবহার করিতে না জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্মযোগ কাজ করাকে একটি রীতিমত বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে। এই বিদ্যা দ্বারা জানিতে পারিবে, এই জগতের সকল কর্মের সদ্ব্যবহার কিভাবে করিতে হয়। কর্ম করিতেই হইবে, ইহা অপরিহার্য—কিন্তু উচ্চতম উদ্দেশ্যে কর্ম কর। কর্মযোগের সাধনায় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহার মধ্য দিয়াই আমাদের চলিতে হইবে ; আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। জগতের বন্ধনের বাহিরে যাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে নিশ্চিতভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। এমন সব অসাধারণ মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, যাঁহাদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তাঁহারা একেবারে জগতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন—যেমন সর্প উহার ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া থাকে। এইসব অসাধারণ মানুষ কয়েকজন আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশিষ্ট মানবগণকে ধীরে ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে।

অল্প শক্তি নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্য ও উপায় দেখাইয়া দেয় কর্মযোগ।

কর্মযোগ কি বলে?—বলে, 'নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ কর।' কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও না। মনকে মুক্ত রাখো। যাহা কিছু দেখিতেছ, দুঃখ-কষ্ট—সবই জগতের অপরিহার্য পরিবেশ মাত্র, দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহারা মোটেই আমাদের স্বভাবগত নয়। আমাদের স্বরূপ দুঃখ ও সুখের পারে—প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি আমাদিগকে সর্বদাই কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। 'আসক্তি হইতেই দুঃখ আসে, কর্ম হইতে নয়।'

যখনই আমরা কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই আমরা দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মের সহিত ঐরূপ এক না হইয়া গেলে সেই দুঃখ অনুভব করি না। কাহারও একখানি সুন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাহার নিজের ছবিখানি পুড়িয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? দুইখানিই সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্রে অপেক্ষা অন্যক্ষেত্রে অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ—একক্ষেত্রে মানুষ ছবির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। এই 'আমি ও আমার' ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই স্বার্থ আসে এবং ঐ স্বার্থপরতা হইতেই দুঃখ আরম্ভ। প্রতিটি স্বার্থপর কার্য বা চিন্তা আমাদিগকে কোন-না-কোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর দাস হইয়া যাই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ হইতে 'আমি ও আমার' ভাব উত্থিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করে, যতই আমরা 'আমি ও আমার' বলি, ততই দাসত্ব বাড়িতে থাকে, ততই দুঃখও বাড়িতে থাকে। অতএব কর্মযোগ বলে—জগতে যত ছবি আছে, সবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কিন্তু কোনটির সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিও না; 'আমার' কখনও বলিও না। আমরা যখনই বলি, 'এটি আমার', তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিবে। 'আমার সন্তান'—এ-কথা মনে মনেও বলিও না; ছেলেকে আদর কর, তাহাকে নিজ আয়ত্তে রাখো, কিন্তু 'আমার' বলিও না। 'আমার' বলিলেই

দুঃখ আসিবে। 'আমার বাড়ি', 'আমার শরীর' এরূপও বলিও না। এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে, যাইতেছে; কিন্তু আমরা মুক্ত—সাক্ষিস্বরূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, শরীরের তদপেক্ষা বেশী নাই। একটা শরীরের প্রতি আমরা এত আসক্ত হইব কেন? যদি কেহ একখানি ছবি আঁকে, সেটি শেষ করিয়া অন্যটিতে হাত দেয়। 'আমি উহা অধিকার করিব'—বলিয়া স্বার্থজাল বিস্তার করিও না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ।

অতএব কর্মযোগে বলা হয়: প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার করিবার প্রবণতা বিনষ্ট কর, যখন উহা দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, তখন মনকে আর স্বার্থপরতার তরঙ্গে পরিণত হইতে দিও না। তারপর সংসারে গিয়া যত পারো কর্ম কর, সর্বত্র গিয়া মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছা যাও, মন্দের স্পর্শ তোমাকে কখনই দূষিত করিতে পারিবে না। পদ্মপত্র জলে রহিয়াছে, উহাতে জল যেমন কখনও লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে; ইহাই 'বৈরাগ্য' বা অনাসক্তি। মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসক্তি ব্যতীত কোন প্রকার 'যোগ'ই হইতে পারে না। অনাসক্তি সকল যোগেরই ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং সুখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিতে গিয়া থাকে, সে অতিশয় আসক্ত হইতে পারে। তাহার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বস্ব হইতে পারে, ক্রমশঃ তাহাকে তাহার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। অনাসক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়া নয়, অনাসক্তি মনে। 'আমি ও আমার'—এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই রহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ না থাকে, তবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যাহাই হই না কেন, আমরা অনাসক্ত। একজন—সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়তো ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়াই ভয়ানক আসক্ত। প্রথমে আমাদিগকে এই অনাসক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইবে, তারপর নিরন্তর কার্য করিতে হইবে। যে কর্মপ্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে সাহায্য করে, কর্মযোগ আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা অতি কঠিন।

সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি—যাহারা ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য। তাহারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে হইবে—তাহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি নিশ্চয় অনাসক্ত হইব'। অন্যটি—যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, অনুভব করেন, শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য। আমরা যে-কোন ভাল কাজ করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংসা বা সুবিধা দাবি না করি। উহা প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমরা প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃত্তি প্রতি মুহূর্তে তাঁহা হইতেই আসিতেছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥[১]

—'যাহা কিছু কাজ কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু পূজা হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর।' আমরা নিজেরা যেন সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সব-কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহং'কে আহুতি-দানরূপ মহাযজ্ঞ কর।

'জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনস্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজিতে গিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।' দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবেঃ 'আমার জন্য

১ গীতা, ৯।২৭

কিছুই নয়; কোন বস্তু শুভ, অশুভ বা নিরপেক্ষ—যাহাই হউক না কেন, আমার পক্ষে সবই সমান; আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না, আমি সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।'

দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান 'অহং'ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে পর্যন্ত না ঐ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পর্যন্ত না উহা শিরায় শিরায়, মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে ঐ আত্মত্যাগরূপ ভাবের অনুগত হইয়া যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের গর্জন- ও কোলাহল-পূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত ও শান্ত।

কর্মযোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—কর্তব্যের সাধারণ ভাব কেবল নিম্নভূমিতেই বর্তমান; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই অদ্ভুত কর্তব্যবোধ অনেক সময় আমাদের দুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগ-বিশেষ হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সর্বদা টানিয়া লইয়া যায়। কর্তব্য আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। ইহা মনুষ্য-জীবনের ধ্বংসের কারণ। এই কর্তব্য—এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন-সূর্য; উহা মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য ক্রীতদাসদের দিকে ঐ চাহিয়া দেখ! কর্তব্য—বেচারাদের ভগবান্‌কে ডাকিবার অবকাশটুকুও দেয় না, স্নানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না! কর্তব্য যেন সর্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহারা বাড়ির বাহিরে গিয়া কাজ করে, তাহাদের মাথার উপর কর্তব্য! তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে; কর্তব্যের হাত হইতে মুক্তি নাই! এ তো ক্রীতদাসের জীবন—অবশেষে ঘোড়ার মতো গাড়িতে জোতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথেই পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ! কর্তব্য বলিতে লোকে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় কর্ম করা এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য। আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের। আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়াছি, সেজন্য আমরা ধন্য। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যাইতেছি; কে জানে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে

কর্ম করিলেও আমরা ফল ভোগ করিব না, মন্দভাবে করিলেও চিন্তান্বিত হইব না। শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা কর, কেন তাহারা উহা করিতেছে, তাহারা বলিবে, 'ইহা আমাদের কর্তব্য'। বাস্তবিক উহা কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা কতকগুলি ফুল দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

তবে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহা কেবল দেহ-মনের আবেগ—আসক্তির তাড়না। কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা তাহাকে কর্তব্য বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ: যে-সব দেশে বিবাহ নাই, সে-সব দেশে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কোন কর্তব্যও নাই। সমাজে যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিবশতঃ একত্র বাস করে। পুরুষানুক্রমে এরূপ থাকার পর একত্র বাস করা রীতিতে পরিণত হয়, তখন উহা কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার পুরাতন ব্যাধি। রোগ যখন প্রবলাকারে দেখা দেয়, তখন আমরা উহাকে 'ব্যারাম' বলি; যখন উহা স্থায়ী দাঁড়াইয়া যায়, উহাকে আমরা 'স্বভাব' বলিয়া থাকি। যাহাই হউক, উহা রোগমাত্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়া যায় তখন উহাকে 'কর্তব্য'রূপ আড়ম্বরপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই, তদুপলক্ষে তুরীভেরীও বাজানো হয়, উহার জন্য শাস্ত্র হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ ঐ কর্তব্যের অনুরোধে সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ-সহকারে অপহরণ করিতে থাকে।

কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভাল যে, উহাতে পশু-ভাব কিছুটা সংযত হয়। যাহারা অতিশয় নিম্নাধিকারী, যাহারা অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে; কিন্তু যাঁহারা কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই। জগৎকে যাহা দিবার আছে অবশ্যই দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয়। উহার জন্য

কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হইয়া কিছু করিও না। বাধ্য হইয়া কেন করিবে? বাধ্য হইয়া যাহা কিছু কর; তাহা দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয়। কর্তব্য বলিয়া তোমার কিছু থাকিবে কেন?

'সবই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।' এই সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহে—যেখানে কর্তব্যরূপ অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই অমৃত পান করিয়া সুখী হও। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতেছি, পুরস্কার বা শাস্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাকে শাস্তিও লইতে হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায় পুরস্কার ত্যাগ করা। দুঃখ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সুখের ভাবও ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে একসূত্রে গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন, অপরদিকে মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—জীবনের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে দেখা। অতএব 'দুঃখশূন্য সুখ' এবং 'মৃত্যুহীন জীবন' কথাগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, বাক্যগুলি স্ববিরোধী, সুতরাং তিনি দুই-ই পরিত্যাগ করেন। যাহা কিছু কর, তাহার জন্য কোন প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি, অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করি। যখনি আমরা কোন চাঁদা দিই, অমনি আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি—কাগজে আমাদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাঁহারা জীবনযাপন করিয়া নীরবে চলিয়া যান; সময়ে তাঁহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতো মহামানবে ব্যক্তভাব ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হন। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য কোন নাম-যশ আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয়া যান, তাঁহারা নিজেদের জন্য

কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমত স্থাপন করিয়া যান না। ঐরূপ করিতে তাঁহাদের সমগ্র প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়। তাঁহারা শুদ্ধ-সাত্ত্বিক; তাঁহারা কখনও কোন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন যোগী[১] দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত আমিত্বের ভাব এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, তাঁহার মনুষ্যভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তে শুধু ব্যাপক ঈশ্বরীয় ভাব তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাঁহার এক হাতে দংশন করে, তিনি তাহাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত, এবং বলেন—ইহা প্রভুর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাঁহার কাছে আসে, তিনি মনে করেন—সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লোকের সম্মুখে বাহির হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিসম্পন্ন বা সংগ্রামশীল পুরুষগণের স্থান। তাঁহারা সিদ্ধপুরুষগণের ভাবরাশি গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার করেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহান্ ভাবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, এবং বুদ্ধ-খ্রীষ্টগণ সেইসব ভাব স্থানে স্থানে গিয়া প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করেন। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্বে যে চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহারা অপরিচিত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ তাঁহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরই নিজ ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা জানেন—ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদূর। তাঁহারা নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাঁহারা কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি সংচিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সত্যই সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া

---

১ গাজীপুরের পওহারী বাবা

এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, যাঁহারা জীবনে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্যে পরিণত করিবে। পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়া জগতে পরোপকার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি কর্ম করা সম্ভব নয়। কর্মীরা যতই ভাল হউন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবে একটু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কর্ম করিতে পারি—কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা অভিসন্ধি ও আসক্তি দ্বারা চালিত হয়। সদাক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াই-পাখিটির পতন পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন; তাঁহার সমক্ষে মানুষ তাহার নিজ কার্যের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির পর্যন্ত খবর রাখিতেছেন, তখন ঐরূপ করা কি একপ্রকার ঈশ্বরনিন্দা নয়? আমাদের শুধু কর্তব্য সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলা, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক'। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেরা কর্ম করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মনে কোন আসক্তি নাই। 'যিনি আত্মাতেই আনন্দ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কার্য নাই।'[১] ইঁহারাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইঁহারা কার্য করিতে পারেন না, তা-ছাড়া প্রত্যেককেই কার্য করিতে হইবে। এইরূপ কার্য করিবার সময় আমাদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জগতের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পারি; তাহা আমরা পারি না। এই জগৎরূপ শিক্ষালয়ে পরোপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার করিয়া থাকি। কর্ম করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্তব্য। যদি আমরা এইভাবে কার্য করি, যদি আমরা সর্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম করিতে সুযোগ পাওয়া আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, তবে আমরা কখনও উহাতে আসক্ত হইব না। তোমার আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করে, এ জগতে আমরা সব মস্ত লোক, কিন্তু আমরা সকলেই মরিয়া যাই, তারপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের ভুলিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের জীবন অনন্ত—'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ

---

১ গীতা, ৩।১৭

আনন্দো ন স্যাৎ।'[১] যদি সেই সর্বশক্তিমান্ প্রভু ইচ্ছা না করিতেন, তবে কে এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিত, কে এক মুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত? তিনিই নিয়ত-কর্মশীল বিধাতা। সকল শক্তিই তাঁহার এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥[২]

—তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সর্বেসর্বা, তিনিই সব, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমরা কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎকর্মের জন্যই সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। এইরূপে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, এবং আমরা পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযোগের লক্ষ্য।

---

১ তৈত্তিরীয় উপ., ২।৭

২ কঠ উপ., ২।৩।৩

কর্মযোগের আদর্শ

বেদান্ত-ধর্মের মহান্ ভাব এই যে, আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া থাকি : কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবাঁধা নয়, অত্যন্ত পৃথক্ নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায়; তবে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ। এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি ব্যতীত যাহার অন্য কোন শক্তি নাই, যে শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্যে। আমরা দেখিয়াছি, শেষ পর্যন্ত এই চারিটি পথ একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন-প্রণালীই আমাদিগকে সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।

সেই চরম লক্ষ্যটি কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি—ঐ লক্ষ্য মুক্তি। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি, পরমাণু হইতে মনুষ্য, অচেতন প্রাণহীন জড়কণা হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান সর্বোচ্চ সত্তা—মানবাত্মা পর্যন্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎ এই মুক্তির সংগ্রাম বা চেষ্টার ফল। সকল যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুই অন্যান্য পরমাণুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং অপরগুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্যের নিকট হইতে এবং চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক পদার্থই অনন্ত বিস্তারের জন্য উন্মুখ। আমরা জগতে যা-কিছু পদার্থ দেখিতেছি, এই জগতে যত কার্য বা চিন্তা আছে, সব-কিছুর একমাত্র ভিত্তি—এই মুক্তির চেষ্টা। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাসনা করেন এবং চোর চুরি করে। যখন কর্মপ্রণালী যথাযথ হয় না, তখন আমরা তাহাকে মন্দ বলি, এবং যখন কর্মপ্রণালীর প্রকাশ যথাযথ ও উচ্চতর হয়, তখন তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণা উভয়ত্র সমান—সেই মুক্তির চেষ্টা। সাধু নিজের বন্ধনের বিষয় ভাবিয়া কষ্ট পান; তিনি বন্ধন হইতে মুক্তি

পাইতে চান, সেজন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন। চোরও এই ভাবিয়া কষ্ট পায় যে, তাহার কতকগুলি বস্তুর অভাব ; সে ঐ অভাব হইতে মুক্ত হইতে চায় এবং সেইজন্য চুরি করে। চেতন, অচেতন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য এই মুক্তি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ ঐ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সাধুর ঈপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়া অনন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে।

প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। ইহা সমুদয় নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তি। নিঃস্বার্থপরতার অর্থ : 'আমি এই ক্ষুদ্র শরীর'—এইভাব হইতে মুক্ত হওয়া। যখন আমরা দেখিতে পাই, কোন লোক ভাল কাজ করিতেছে, পরোপকার করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—সেই ব্যক্তি 'আমি ও আমার'-রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। এই স্বার্থপরতার গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার কোন সীমা নাই। চরম স্বার্থত্যাগ সকল বড় বড় নীতি-শাস্ত্রেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচারিত। মনে কর, একজন এই চরম স্বার্থত্যাগের অবস্থা লাভ করিল, তখন তাহার কি হইবে? তখন সে আর ছোটখাট শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক থাকে না ; সে তখন অনন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে তাহার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়। সে তখন অনন্ত-স্বরূপ হইয়া যায়। এই অনন্ত বিস্তৃতিই সকল ধর্মের, সকল নীতিশিক্ষার ও দর্শনের লক্ষ্য। ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্ত্বটি দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত দেখেন, তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। নীতি প্রচার করিতে গিয়া তিনি নিজেই আবার সেই একই তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনিও মানুষের নিঃস্বার্থপরতার কোন সীমা নির্দেশ করেন না। মনে কর, এই ব্যক্তিত্ববাদ-মতে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইলেন। তাঁহাকে তখন অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিব কি করিয়া? তিনি তখন সারা বিশ্বের সহিত এক হইয়া যান ; এইরূপ হওয়াই তো চরম লক্ষ্য। হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তাঁহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিবার সাহস পায় না। নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মানব-প্রকৃতির চরম লক্ষ্য এই মুক্তিলাভ করাই কর্মযোগ। সুতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্যই আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে বাধাস্বরূপ, আর প্রত্যেক নিঃস্বার্থ

কর্মই আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়। এইজন্য নীতির এই একমাত্র সংজ্ঞা: যাহা স্বার্থশূন্য, তাহাই নীতিসঙ্গত; আর যাহা স্বার্থপর, তাহা নীতিবিরুদ্ধ।

খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাপারটি এত সহজ দেখাইবে না। অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একই কার্য এক ক্ষেত্রে স্বার্থশূন্য এবং অপর ক্ষেত্রে সত্যই স্বার্থপ্রণোদিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা কেবল কর্তব্যের একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে পারি; বিশেষ বিশেষ কর্তব্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া নিরূপিত হইবে। এক দেশে একপ্রকার আচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। অপর দেশে আবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার কারণ—পরিবেশ পৃথক্। সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর এই মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা হইতেই লাভ করা হয়। আর প্রত্যেক স্বার্থশূন্য কার্য, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে ঐ আদর্শের অভিমুখে লইয়া যায়; সেইজন্যই ঐ কার্যকে নীতিসঙ্গত বলা হয়। ক্রমশঃ বুঝিবে—এই সংজ্ঞাটি সকল ধর্ম এবং সকল নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধেই খাটে। নীতিতত্ত্বের মূলসম্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। কোন কোন প্রণালীতে নীতি কোন উন্নততর পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'মানুষ কেন এ কাজ করিবে এবং ও কাজ করিবে না?' উত্তরে ঐ-সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলিবেন—'ইহা ঈশ্বরের আদেশ'! কিন্তু যেখান হইতেই তাঁহারা ইহা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের নীতিতত্ত্বের মূল কথা—'নিজের' চিন্তা না করা, 'অহং'কে ত্যাগ করা। এই প্রকার উচ্চ নীতিতত্ত্ব সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে ভয় পান। যে ব্যক্তি এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ভাব আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়, তাহাকে বলিতে পারি, এমন এক জনের চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ—যাহার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, যে নিজের জন্য কিছু করে না, যে নিজের পক্ষে কোন কথা বলে না; এখন বলো দেখি, তাহার 'নিজত্ব' কোথায়? যতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা করে, কাজ করে বা কথা বলে, ততক্ষণই সে তাহার 'নিজেকে' বোধ করে। সে যদি কেবল অপরের সম্বন্ধে—জগতের সকলের সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তাহা

হইলে তাহার 'নিজত্ব' কোথায়? তাহার 'নিজত্ব' তখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।

অতএব কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মযোগীর কোন প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, আত্মা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই হইবে উহার উপলব্ধি, কারণ জ্ঞানী যুক্তি-বিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা সমাধান করিতেছেন, তাঁহাকে কোন প্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্মদ্বারা সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে।

এখন পরবর্তী প্রশ্ন: এই কর্ম কি? 'জগতের উপকার করা'-রূপ এই ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের কোন উপকার করিতে পারি? উচ্চতম দৃষ্টি হইতে বলিলে বলিতে হইবে, 'না'; কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে ধরিলে 'হাঁ' বলিতে হইবে। জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার করা যাইতে পারে না; তাহা যদি করা যাইত, তাহা হইলে ইহা আর এই জগৎ থাকিত না। আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারি, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত হইবে। আমরা মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য-আবর্তনশীল সুখ-দুঃখরাশি একেবারে চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে না। জগৎকে কি কাহাকেও কোন নিত্য-সুখ দেওয়া যাইতে পারে? না, তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। সমুদ্রের কোথাও গহ্বর সৃষ্টি না করিয়া একটি তরঙ্গও তুলিতে পারা যায় না। মানুষের প্রয়োজন ও লোভের অনুপাতে জগতে ভালোর সমষ্টি বরাবর একই প্রকার, সর্বদাই সমান। উহা বাড়ানো বা কমানো যায় না। বর্তমান-কাল পর্যন্ত পরিজ্ঞাত মনুষ্যজাতির ইতিহাস আলোচনা কর। সেই পূর্বের মতোই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পদমর্যাদার তারতম্য দেখিতে পাই নাকি? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ নিম্নপদস্থ; কেহ সুস্থ, কেহ বা অসুস্থ—তাই নয় কি? প্রাচীন মিশরবাসী, গ্রীক ও রোমানদের যে-অবস্থা

ছিল, আধুনিক আমেরিকানদেরও সেই এক অবস্থা। জগতের ইতিহাস যতটা জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, মানুষের অবস্থা বরাবর একই প্রকার; তথাপি আবার ইহাও দেখিতে পাই, সুখ-দুঃখের এই দুরপনেয় বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি দূর করিবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এমন সহস্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবনের পথ সহজ করিবার জন্য কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন; তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন? আমরা একটি বলকে (ball) একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাওয়া-রূপ খেলাই খেলিতে পারি। আমরা শরীর হইতে দুঃখবেদনা দূর করিলাম, উহা মনে আশ্রয় লইল। ইহা ঠিক দান্তের (Dante) সেই নরক-চিত্রের মতো—পাহাড়ের উপর ঠেলিয়া তুলিবার জন্য কৃপণদিগকে রাশীকৃত সুবর্ণ দেওয়া হইয়াছে। যতবার তাহারা একটু ঠেলিয়া তুলিতেছে, ততবারই উহা গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে। সুখের স্বর্ণযুগ (millenium) সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হয়, সে-সবই স্কুলের ছেলেদের উপযোগী সুন্দর গল্প, তদপেক্ষা ভাল কিছু নয়। যে-সকল জাতি এই সুখের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহারা আবার এরূপও ভাবিয়া থাকে যে, ঐ সময়ে তাহারাই সর্বাপেক্ষা সুখে থাকিবে। এই স্বর্ণযুগ-সম্বন্ধে ইহাই বড় অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব!

আমরা এই জগতের সুখ এতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারি না; তেমনি ইহার দুঃখও বাড়াইতে পারি না। এই জগতে প্রকাশিত সুখদুঃখের শক্তিসমষ্টি সর্বদাই সমান। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মাত্র, কিন্তু উহা চিরকালই একরূপ থাকিবে, কারণ এইরূপ থাকাই উহার স্বভাব। এই জোয়ার-ভাঁটা, এই উঠা-নামা জগতের স্বভাবগত। অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করা—'মৃত্যুহীন জীবন সম্ভব' বলার মতোই অযৌক্তিক।

মৃত্যুশূন্য জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ জীবনের ধারণার মধ্যেই মৃত্যু নিহিত রহিয়াছে, সুখের মধ্যেই দুঃখ নিহিত। এই আলোটি ক্রমাগত পুড়িয়া যাইতেছে, ইহাই উহার জীবন। যদি জীবন চাও তবে ইহার জন্য তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মরিতে হইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিসের দুইটি বিভিন্ন রূপ মাত্র—শুধু বিভিন্ন দিক হইতে উহারা একই তরঙ্গের উত্থান ও পতন এবং

দুইটি একত্র করিলে একটি অখণ্ড বস্তু হয়। একজন পতনের দিকটা দেখিয়া দুঃখবাদী হন; আর একজন উত্থানের দিকটা দেখেন এবং সুখবাদী হন। বালক যখন বিদ্যালয়ে যায়—পিতামাতা তাহার যত্ন লইতেছেন, তখন বালকের পক্ষে সবই সুখকর মনে হয়। তাহার অভাব খুব সামান্য, সুতরাং সে খুব সুখবাদী। কিন্তু বৃদ্ধ—বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হইবে। এইরূপে প্রাচীন জাতিগুলি—যাহাদের চতুর্দিকে কেবল পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ—তাহারা নূতন জাতিগুলি অপেক্ষা কম আশাশীল। ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে—'হাজার বছর শহর, আবার হাজার বছর বন।' শহরের এই বনে পরিবর্তন এবং বনের শহরে পরিবর্তন সর্বত্র চলিয়াছে। মানুষ এই চিত্রের যখন যে দিকটি দেখে, তখন সে তদনুযায়ী সুখবাদী বা দুঃখবাদী হয়।

এখন আমরা সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। এই স্বর্ণযুগের ধারণা অনেকের পক্ষে কর্ম করিবার শক্তি—প্রচণ্ড প্রেরণাশক্তি। অনেক ধর্মেই ধর্মের একটি অঙ্গরূপে প্রচারিত হয়: ঈশ্বর জগৎ শাসন করিতে আসিতেছেন, এবং মানুষের ভিতর আর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে না। যাহারা এই মতবাদ প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া, এবং গোঁড়ারাই সর্বাপেক্ষা অকপট। খ্রীষ্টধর্মও ঠিক এই গোঁড়ামির মোহ দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, ইহারই জন্য গ্রীক ও রোমক ক্রীতদাসগণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল—এই ধর্মে তাহাদিগকে আর দাসত্ব করিতে হইবে না, তাহারা যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবে; সেইজন্যই তাহারা খ্রীষ্টধর্মের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে যাহারা উহা প্রচার করিয়াছিল, তাহারা অবশ্য গোঁড়া অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহারা প্রাণের সহিত ঐসব কথা বিশ্বাস করিত। বর্তমানকালে এই স্বর্ণযুগের আকাঙ্ক্ষা—সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাও গোঁড়ামি। যথার্থ সাম্যভাব জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কখন হইতেও পারে না। এখানে কি করিয়া আমরা সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলিতে সমষ্টি-বিনাশই বুঝায়! জগতের এই যে বর্তমান রূপ, তাহার কারণ কি?—সাম্যের অভাব। জগতের আদিম অবস্থায়—সৃষ্টির পূর্বে সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকে। তবে বিশ্বগঠনকারী বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় কিরূপে?—বিরোধ,

সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা। মনে কর, পদার্থের পরমাণুগুলি সব সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে কি সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে? বিজ্ঞানের সাহায্যে জানি, ইহা অসম্ভব। জলাশয়ের জল নাড়িয়া দাও, দেখিবে প্রত্যেক জলবিন্দু আবার শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আর একটির দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই একইভাবে—'বিশ্বজগৎ' বলিয়া কথিত এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চ—ইহার অন্তর্গত সকল পদার্থই তাহাদের পূর্ণ সাম্যভাবে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আবার বিক্ষোভ দেখা দেয়, আবার সংযোগ হয়—সৃষ্টি হয়। বৈষম্যই সৃষ্টির ভিত্তি। সৃষ্টির জন্য সাম্যভাব-বিনাশকারী শক্তির যতটা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকারী শক্তিরও ততটা প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ সাম্যভাব—যাহার অর্থ সর্বস্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির পূর্ণ সামঞ্জস্য, তাহা এ-জগতে কখনই হইতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই জগৎ জীব-বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এখানে আর কেহই থাকিবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, এই স্বর্ণযুগ বা পূর্ণ সাম্যভাব-সম্বন্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহা নয়, পরন্তু যদি আমরা ঐ ধারণাগুলি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রলয়ের দিন ঘনাইয়া আসিবে। মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ কি?—প্রধানতঃ মস্তিষ্কের ভিন্নতা। আজকাল পাগল ছাড়া আর কেহই বলিবে না যে, আমরা সকলেই একরূপ মস্তিষ্কের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া আমরা জগতে আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ বা সামান্য হইয়া আসিয়াছি, জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ অতিক্রম করা যায় না। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ এই দেশে বাস করিতেছিল, আর তোমাদের অতি অল্পসংখ্যক পূর্বপুরুষ এদেশে আসিয়াছিলেন। দেশের চেহারায় তাঁহারা কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন! যদি সকলেই সমান, তবে রেড ইণ্ডিয়ানরা নানাপ্রকার উন্নতি এবং নগরাদি নির্মাণ করে নাই কেন? কেনই বা তাহারা চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইল? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারসমষ্টি আসিয়া একযোগে কাজ করিয়া নিজেদের উন্নতি করিয়াছে। আত্যন্তিক বৈষম্যশূন্যতাই মৃত্যু। যতদিন

এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্য থাকিবে; সৃষ্টিচক্র যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের স্বর্ণযুগ আসিবে। তাহার পূর্বে সাম্যভাব আসিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমাদের এক প্রবল প্রেরণাশক্তি। সৃষ্টির জন্য যেমন বৈষম্য প্রয়োজন, তেমনি ঐ বৈষম্য সীমাবদ্ধ করার চেষ্টাও প্রয়োজন। বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকিত না, আবার সাম্য বা মুক্তিলাভের ও ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও সৃষ্টি থাকিত না। এই দুই শক্তির তারতম্যেই মানুষের অভিসন্ধিগুলির প্রকৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের এই বিভিন্ন প্রেরণা চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে।

এই সংসার 'চক্রের ভিতরে চক্র'—এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহাতে যদি হাত দিই, তবে আটকা পড়িলেই সর্বনাশ! আমরা সকলেই ভাবি কোন বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই আমরা বিশ্রাম লাভ করিব; কিন্তু ঐ কর্তব্যের কিছুটা করিবার পূর্বেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বিশাল ও জটিল জগৎ-যন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটিমাত্র উপায় আছে: একটি—এই যন্ত্রের সহিত সংস্রব একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়া দাঁড়ানো—সকল বাসনা ত্যাগ করা। ইহা বলা খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ অসম্ভব। দুই কোটি লোকের মধ্যে একজন ইহা করিতে পারে কি না, জানি না। আর একটি উপায়—এই জগতে ঝাঁপ দিয়া কর্মের রহস্য অবগত হওয়া—ইহাকেই 'কর্মযোগ' বলে। জগৎ-যন্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না; উহার ভিতরে থাকিয়া কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাকিয়া যথাযথভাবে কর্ম করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার বাহিরে যাইবার পথ।

আমরা এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ম প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ—কর্মপ্রবাহ সর্বদাই বহিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহারা জানেন—ঈশ্বর এমন একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন। যদিও এই জগৎ চিরকাল চলিতে থাকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য স্বার্থশূন্যতা। কর্মযোগ অনুসারে কর্মের দ্বারাই আমাদিগকে ঐ লক্ষ্যে



চিকাগো ধর্মমহাসভায় উপবিষ্ট স্বামীজী, ১৮৯৩

উপনীত হইতে হইবে। এই জন্যই আমাদের কর্মরহস্য জানা প্রয়োজন। জগৎকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার যাবতীয় ধারণা গোঁড়াদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে ভালই হইতে পারে; কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, গোঁড়ামি-দ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মযোগী জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম করিবার জন্য মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রেরণার প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'[1] কর্মযোগী বলেন, মানুষ এ তত্ত্ব অবগত হইয়া অভ্যাস করিতে পারে। যখন লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন আর তাহার বাহিরের কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার কেন করিব?—ভাল লাগে বলিয়া। আর কোন প্রশ্ন করিও না। ভাল কাজ কর, কারণ ভাল কাজ করা ভাল। কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে বলিয়া যে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এতটুকু স্বার্থযুক্ত অভিসন্ধি লইয়া যে কর্ম করা যায়, তাহা মুক্তির পরিবর্তে আমাদের পায়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে আমরা স্বর্গ-নামক একটি স্থানে আসক্ত হইব। আমাদিগকে স্বর্গে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হইবে; উহা আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনস্বরূপ হইবে।

অতএব একমাত্র উপায়—সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত হওয়া। এইটি জানিয়া রাখো: জগৎ আমরা নয়, আমরাও এই জগৎ নই; বাস্তবিক আমরা শরীরও নই, আমরা প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমরা আত্মা—চিরস্থির, চিরশান্ত। আমরা কেন কিছুর দ্বারা বদ্ধ হইব? আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই নাই। এমন কি, অপরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কাঁদিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ কান্নাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমরা কল্পনা করি যে, ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাঁদিতেছেন। ঈশ্বর কাঁদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন তো বন্ধনের চিহ্ন—দুর্বলতার চিহ্ন। একবিন্দু

[1] গীতা, ২।৪৭

চোখের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? 'সম্পূর্ণ অনাসক্ত হও'—বলা খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া যে-কোন ভাল কাজ করি, তাহা আমাদের পায়ে একটি নূতন শৃঙ্খল সৃষ্টি না করিয়া যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি শিকলি ভাঙিয়া দেয়। আমরা প্রতিদানে কিছু পাইবার আশা না করিয়া যে-কোন সৎচিন্তা চারিদিকে প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে—আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটি শিকলি চূর্ণ করিবে, এবং আমরা ক্রমশই পবিত্রতর হইতে থাকিব—যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই। কিন্তু লোকের নিকট ইহা যেন কেমন অস্বাভাবিক ও অত্যধিক দার্শনিক এবং কার্যকর অপেক্ষা বেশী তাত্ত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়াছেন—অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষ কাজ করিতে পারে না। ইহারা গোঁড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন 'নিঃস্বার্থ' কার্য কখন দেখে নাই, সেইজন্যই এইরূপ বলিয়া থাকে।

উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব; একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ একমাত্র তাঁহাকে ব্যতীত জগতের সকল মহাপুরুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে: এক শ্রেণী বলেন—তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন—তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ; উভয়েরই কার্যের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আসে, আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জগৎ হইতেই পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।'

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি

চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এত উর্ধ্বে উঠিয়াছেন! সমুদয় মনুষ্য-জাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্রই উদ্ভূত হইয়াছে, এতদূর উন্নত দর্শন, এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান্ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে—যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ—অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত! জগতে তিনিই প্রথম একজন মহান্ সংস্কারক। তিনিই প্রথম সাহসপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'কোন প্রাচীন পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যকাল হইতে তোমাকে বিশ্বাস করিতে শেখানো হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না; বিচার করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ—উহা সকলের পক্ষে উপকারী, তবেই উহা বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর।'

যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত।

কর্মযোগ-প্রসঙ্গ

কর্ম ও তাহার রহস্য

[১৯০০ খৃঃ ৪ঠা জানুআরি ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেসে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমার জীবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম এই যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা আমি যাঁহার নিকট লাভ করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ, এবং তাঁহার জীবন ছিল এই মহতী নীতির বাস্তব রূপায়ণ। এই একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদা মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছি; এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের রহস্য সেখানেই—অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়ি—লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হইয়া যায় যে, আমরা উপায়গুলি খুঁটিনাটিভাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু যখনই বিফলতা আসে, তখন যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই বলিয়াই আমরা বিফল হইয়াছি। উপায়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করার দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। উপায়গুলি যথাযথ হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবেই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন করে; কার্য কখনই নিজে নিজে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণগুলি ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী না হইলে কার্য কখনও উৎপন্ন হইবে না। একবার যখন আদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর আদর্শের কথা না ভাবিলেও পারি; কারণ উপায়গুলি নিখুঁত করিতে পারিলে আদর্শের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি; যেখানে কারণ আছে, সেখানে কার্য সম্বন্ধে আর কোন বাধা নাই, কার্য অবশ্যই হইবে; আমরা যদি কারণ-বিষয়ে যত্নবান্ হই, তাহা হইলে কার্যও হইবে। আদর্শের উপলব্ধিই কার্য, উপায়গুলিই কারণ; সুতরাং উপায়ের প্রতি মনোযোগ-দানই

জীবন-সমস্যা-সমাধানের রহস্য। এই বিষয়টি আমরা গীতাতেও পাঠ করিয়া থাকি; সেখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের কাজ করিতে হইবে, সমগ্র শক্তি দিয়া নিয়ত কাজ করিয়া যাইতে হইবে; এবং যে-কোন কাজেই আমরা নিযুক্ত হই না কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমাহিত করিতে হইবে; অথচ দেখিতে হইবে, আমরা যেন কর্মে আসক্ত হইয়া না পড়ি, অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর প্রভাবে যেন কর্ম হইতে সরিয়া না যাই, কিন্তু তবু সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমরা কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই।

আমরা যদি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এই: আমরা কোন কার্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি; হয়তো তাহা নিষ্ফল হইল, তথাপি আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা জানি, কর্ম আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আসক্তি আমাদের কেবল দুঃখই দিতেছে—তথাপি আমরা ঐ কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মক্ষিকা মধুপান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পাগুলি মধুভাণ্ডে আটকাইয়া গেল! সে আর বাহির হইতে পারিল না। বার-বারই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। আমাদের সমগ্র জীবনই এইরূপ একটা রহস্যে আবৃত। কেন আমরা এ-জগতে আসিয়াছি? আমরা এখানে মধুপান করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি—আমাদের হাত-পা উহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে! আমরা জগৎকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই ধৃত হইয়া পড়িলাম; ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমরাই ভুক্ত হইতেছি; শাসন করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই শাসিত হইতেছি, কাজ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু অপরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়িতেছি! এইরূপ ব্যাপার আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। অপরের মন-বুদ্ধি দ্বারা আমরা চালিত হইতেছি; আবার আমরা সর্বদাই অপরের মনবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে। আমরা চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে; কিন্তু পরিণামে দেখিতে পাই, প্রকৃতিই আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লয়—আমাদিগকে

একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়। যদি এইরূপ না হইত, তবে জীবন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত! এগুলি কখনও গ্রাহ্য করিও না! আমরা যদি ত্রিযন্ত্রে জড়িত হইয়া না পড়ি, তাহা হইলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে।

দুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমরা আসক্ত হই; আমরা নিত্য আবদ্ধ হইতেছি। এইজন্য গীতা বলিতেছেন (নিয়ত কর্ম কর; কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত হইও না; কর্মে বদ্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিবার শক্তি সঞ্চিত রাখো—কোন বস্তু যত প্রিয়ই হউক না কেন, তাহা পাইবার জন্য মন যত বেশীই ব্যাকুল হউক না কেন, তাহা ত্যাগ করিতে গেলে যত তীব্র বিয়োগ অনুভব কর না কেন, প্রয়োজনকালে তাহা পরিত্যাগের শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখো) এই জীবনেই হউক বা অন্য কোন জীবনেই হউক দুর্বলের স্থান নাই, দুর্বলতা দাসত্ব আনে। দুর্বলতা সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু। শতসহস্র জীবাণু আমাদের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু যে পর্যন্ত না আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, যে পর্যন্ত না আমাদের দেহ ঐগুলি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত ঐ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারিদিকে ভাসমান থাকিতে পারে; ঐগুলিকে গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। যে পর্যন্ত আমাদের মন দুর্বল না হয়, সেগুলি আমাদের নিকট আসিতে সাহস করিবে না; আমাদিগকে আয়ত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এই: শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।

এই জীবনে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখের উৎস আসক্তি। আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আসক্ত হই; নিজেদেব মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আসক্ত হই; যাবতীয় বাহ্যবস্তুতে আসক্ত হই, যাহাতে ঐগুলির সাহায্যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কী আছে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে আমাদিগকে আসক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছামাত্র অনাসক্ত হইবার শক্তি

যদি আমাদের থাকিত, তবে কোন দুঃখই থাকিত না। (কেবল সেই ব্যক্তিই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুলাভে সমর্থ হইবেন, যিনি সমগ্র শক্তি দিয়া কোন বস্তুতে আসক্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসক্ত করিবারও শক্তিধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই—যতটুকু আসক্ত হইবার ক্ষমতা থাকা দরকার, ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থাকা উচিত। আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোন-কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তাহারা ভালবাসিতে পারে না; তাহারা কঠিনহৃদয় ও উদাসীন; অবশ্য জীবনের অধিকাংশ দুঃখ তাহারা এড়াইয়া যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনও দুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঘাতও পায় না; তাহা হইলেও উহা দেওয়ালই থাকে। নিতান্ত অনুভূতিহীন দেওয়াল হওয়া অপেক্ষা কোন-কিছুর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব করা বরং ভাল। যে কখন কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাষাণতুল্য, সে জীবনের অধিকাংশ দুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ অবস্থা আমরা কামনা করি না। ইহা দুর্বলতা, ইহা মৃত্যুতুল্য। যে-হৃদয় কখনও দুর্বলতা অনুভব করে না, দুঃখ অনুভব করে না, সে-হৃদয় কখনই জাগ্রত হয় নাই। তাহা স্পন্দনহীন জড়াবস্থা; এ-রূপ অবস্থা আমরা চাই না।)

এইসঙ্গে কেবল প্রেমের এই মহাশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ, একটিমাত্র বস্তুর উপর সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নিজ সত্তাকে যেন অপরের জন্য নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার শক্তি—যাহা দেবতাদেরই শক্তি—আমাদের কাম্য নয়; পরন্তু আমরা দেবগণ অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর হইতে চাই। পূর্ণজ্ঞানী প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও অনাসক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরূপে আসে? আর এই একটি রহস্যই আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। সে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে থাকে করুণা ও ঘৃণা; ভিক্ষুক যে নীচ ব্যক্তি, অন্ততঃ এইরূপ মনোভাব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা কখনও যথার্থরূপে উপভোগ করিতে পারে না।

আমরা সকলেই ভিক্ষুক। আমরা যাহাই করি, তাহারই একটা প্রতিদান

চাই। আমরা সকলেই জীবন ও ধর্ম লইয়া ব্যবসা করি! হায়, আমরা প্রেম লইয়াও ব্যবসা করি!

তোমরা যদি ব্যবসা করিতে আসিয়া থাকো, আদান-প্রদান—ক্রয়-বিক্রয়ের প্রশ্নই যদি তোমাদের প্রধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ কর। ব্যবসা-ক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, মূল্যের উত্থান-পতনও আছে; সব সময়ে আঘাতের আশঙ্কাও আছে। ব্যাপারটি দর্পণে মুখ দেখার মতো; তোমার মুখ প্রতিবিম্বিত হইল: মুখভঙ্গি কর, দর্পণেও মুখভঙ্গি দেখা যাইবে; তুমি যদি হাসো, দর্পণও হাসিবে—তাহাতে হাসি প্রতিবিম্বিত হইবে। ইহাই ক্রয়-বিক্রয়, ইহাই আদান-প্রদান।

আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি? যাহা দিই তাহার জন্য নয়, পরন্তু যাহা আশা করি তাহার জন্যই। প্রেমের প্রতিদানে পাই আমরা দুঃখ—ভালবাসি বলিয়া নয়, পরন্তু প্রতিদানে ভালবাসা চাই বলিয়া। আকাঙ্ক্ষা যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে থাকে না। বাসনা—অভাববোধই সকল দুঃখের মূল। সফলতা ও বিফলতার নিয়মে বাসনাসমূহ আবদ্ধ। বাসনা অবশ্যই দুঃখ আনিবে।

সুতরাং প্রকৃত সফলতা, প্রকৃত সুখের শ্রেষ্ঠ রহস্য এই: যিনি প্রতিদান চান না—যিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য। কথাটি হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। আমরা কি জানি না—প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত হন, আঘাতপ্রাপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই বটে। 'যীশুখ্রীষ্ট নিঃস্বার্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন।' সত্য বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, এক মহান্ বিজয়ের—কোটী কোটী মানুষের জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মণ্ডিত করিবার জন্যই তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতা।

কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহা তোমার দিবার আছে দাও; ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ইহা ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ কর, দাও—ব্যস্, সেখানেই শেষ। শিক্ষা কর—দান করিবার জন্যই এ-জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর।

শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—যাহা দেয় তাহা দিতেই হইবে। তুমি এই সংসারে আসো সঞ্চয় করিবার জন্য। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তুমি গ্রহণ করিতে চাও; কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপিয়া তোমাকে দান করিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই হইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, 'আমি দিব না', সেই মুহূর্তেই আঘাত আসিয়া তোমাকে দুঃখ দিবে। এমন কেহই নাই যে পরিণামে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য না হইবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশী সংগ্রাম করিবে, সে তত বেশী দুঃখ অনুভব করিবে। আমরা ত্যাগ করিতে সাহস করি না বলিয়াই, প্রকৃতির এই বিরাট দাবি বিনীতভাবে মানিয়া লইতে স্বীকার করি না বলিয়াই দুঃখ পাই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ আমরা সূর্যের উত্তাপ পাই। সূর্য সাগর হইতে জল আহরণ করিয়া বৃষ্টিধারারূপে উহা প্রত্যর্পণ করে। তুমি আদান-প্রদানের যন্ত্রস্বরূপ; তুমিও দান করিবার জন্যই গ্রহণ কর। সুতরাং প্রতিদানে কিছুই চাহিও না; যতই দান করিবে, ততই সব-কিছু তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যত শীঘ্র এই কক্ষটি বায়ুশূন্য করিবে, তত শীঘ্র ইহা বাহিরের বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইবে; কিন্তু সমস্ত দরজা, সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকিবে, বাহিরের বায়ু কখনও ভিতরে আসিবে না; ফলে ভিতরের বায়ু গতিহীন হইয়া দূষিত ও বিষাক্ত হইবে। নদী অবিরত সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছে এবং পূর্ণ হইতেছে। সাগরের মধ্যে নদীর নির্গমন রুদ্ধ করিও না; যে মুহূর্তে ইহা করিবে, সেই মুহূর্তে তুমি মৃত্যুর কবলে পড়িবে।

সুতরাং ভিক্ষুক হইও না; অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের সর্বাধিক দুষ্কর কার্য। এই পথের যে কি বিপদ তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না। এমন কি, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই পথের বাধাবিঘ্নগুলি অবগত হইয়াও যতক্ষণ না মনেপ্রাণে অনুভব করি, ততক্ষণ ঐগুলিকে ঠিক ঠিক আমরা জানিতে পারি না। দূর হইতে একটি প্রমোদ-উদ্যানের সাধারণ দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যখন আমরা উদ্যানের মধ্যে থাকি, তখনই উহা কিরূপ অনুভব করি, এবং যথার্থরূপে জানিতে পারি। যদিও আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং আমরা মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হই, তথাপি সকল বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের

হৃদয়বৃত্তিকে সতেজ রাখিতে হইবে—এই সমস্ত বিঘ্ন-বিপর্যয়ের মধ্যেও আমাদের আভ্যন্তরীণ দেবত্বকে দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রকৃতি চায়—আমরা প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি, প্রতারণার বিনিময়ে প্রতারণা করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই, আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা আঘাতের সমুচিত উত্তর দিই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত না করিতে হইলে নিজেকে সংযত করিতে—সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্য শক্তির প্রয়োজন।

প্রতিদিন আমরা নিত্য নূতনভাবে অনাসক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হই। আমরা আমাদের অতীত ভালবাসা ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে তাকাই এবং অনুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিরূপ দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের 'ভালবাসা'র জন্যই আমরা নৈরাশ্যের অতলগর্ভে চলিয়া গিয়াছি! বুঝিতে পারিলাম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত ক্রীতদাস; আমাদের টানিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থায় নামানো হইয়াছে! আবার আমরা নূতনভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হই: এখন হইতে আমি নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব। কিন্তু কার্যকালে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়! আবার জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে, আর বাহির হইতে পারে না। জীব-পক্ষী জালে আবদ্ধ—পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ইহাই আমাদের জীবন!

আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কষ্টকর! বাধাবিপত্তিগুলি প্রচণ্ড; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি; কালক্রমে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখবাদী হইয়া সাধুতা, প্রেম এবং জীবনে যাহা কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তাঁহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ-পরা মিথ্যাচারীতে পরিণত হন। তাঁহাদের মন যেন স্তূপীকৃত জটিলতা! হয়তো বা তাঁহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ্য বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, তাঁহারা উগ্র-মস্তিষ্ক নন; তাঁহারা বিশেষ কথা বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ দেন না, ক্রুদ্ধও হন না; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতে পারাও তাঁহাদের পক্ষে ভাল ছিল, অভিশাপ দিতে পারাও সহস্রগুণ ভাল ছিল। তাঁহারা তাহা পারেন

না; তাঁহাদের হৃদয়বৃত্তি স্তব্ধ, কারণ তাঁহাদের দেহে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগিয়াছে, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়, এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না।

এ-সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। তাই বলি— আমাদের অসাধারণ ঐশী শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, অসাধারণ ঐশী শক্তিই একমাত্র উপায়—মুক্তির একমাত্র পথ। একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমরা সব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি— অক্ষতদেহে অজস্র দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খণ্ডবিখণ্ড হইতে পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে।

ইহা খুবই কঠিন, কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আমরা এই কাঠিন্য অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের বুঝিতে হইবে—আমাদের কোন বিপদই ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমরা সেই বিপদ বরণ করিতে সমর্থ হই। আমি বলিয়াছি, যতক্ষণ দেহ রোগের জন্য প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ কোন রোগ আমার কাছে আসিতে পারে না; রোগ কেবল জীবাণুর উপর নির্ভর করে না, পরন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ রোগপ্রবণতার উপরও নির্ভর করে। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পাইয়া থাকি। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ইহাই যেন আমরা উপলব্ধি করি—দুঃখ কখনও সঙ্গত কারণ ছাড়া হয় না; দুঃখের অনধিকারী কখনও দুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনও কোন আঘাত অকারণে আসে নাই; কখনও এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয় নাই, যাহার জন্য আমি নিজহস্তে পথ প্রস্তুত করি নাই। ইহাই আমাদের জানিতে হইবে। নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন আঘাত পাইয়াছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলে বলিয়াই তাহা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা করিয়াছ অর্ধেক প্রস্তুতি, বাকী অর্ধ করিয়াছে বহির্জগৎ। এইপ্রকারেই আঘাত আসিয়াছিল। এই উপলব্ধিই আমাদিগকে শান্ত করিবে। একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই একটি আশার বাণী আসিবে এবং সেই আশার বাণী এইরূপ: বাহ্য প্রকৃতির উপর আমার কোন প্রভাব নাই; কিন্তু যাহা আমার ভিতরে, যাহা আমার নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগৎ, তাহা আমার

নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনে ব্যর্থতা ঘটাইতে যদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে আঘাত দিতে যদি উভয়েরই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই দুইটির মধ্যে যাহা আমার হাতে, তাহা আমি ছাড়িয়া দিব না; এক্ষেত্রে কেমন করিয়া আঘাত আসিতে পারে? আমি যদি নিজের উপর যথার্থ প্রভাব বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলে আঘাত কখনই আসিবে না।

শৈশব হইতে সর্বদাই আমরা বাহিরের কোন বস্তুর উপর দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা সর্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সংশোধন করিতে প্রস্তুত নই। দুর্দশায় পড়িলে আমরা বলি, 'হায়! এ জগৎ দানবের রাজ্য।' আমরা অন্য লোককে অভিশাপ দিয়া বলি, 'কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূর্খের দল!' কিন্তু আমরা নিজেরা যদি প্রকৃতই এত সৎ হই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ যদি শয়তানের-রাজ্য হয়, তবে আমরাও দানব, নতুবা কেন আমরা এ জগতে থাকিব? 'হায়! এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর!'—এ-কথা সত্য, কিন্তু আমরা যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমরা বাস করিব? এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ।

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আছে, সেটুকুই আমরা পাইয়া থাকি। এ কথা বলা মিথ্যা যে, জগৎ অসৎ আর আমরা কেবল সৎ। ইহা কখনই হইতে পারে না, এইরূপ আমরা বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহা সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ।

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয়: বাহিরের কোন-কিছুকে অভিসম্পাত না দিতে অথবা কাহারও উপর দোষারোপ না করিতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ হও, উঠিয়া দাঁড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদা সত্য পথ। নিজেকে বশে আনো।

ইহা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখন কখন নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বড় বড় বড় কথা বলি, বলিয়া থাকি আমরা দেবস্বরূপ, ঘোষণা করি আমরা সব-কিছুই জানি, আমরা সব-কিছুই করিতে পারি, আমরা নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ; আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়; কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও আমাদিগকে পীড়া দেয়—পথের যে-কোন নির্বোধ ব্যক্তিও 'এই সব

দেবতাদের' জীবন দুঃখময় করিয়া তোলে! আমরা যদি সত্যই দেবস্বরূপ হই, তাহা হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হওয়া উচিত? বাহ্য জগৎই আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী—এইরূপ অভিযোগ করা কি সত্য হইবে? যে-ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, মহৎ হইতেও মহীয়ান্, সেই ঈশ্বরকে কি আমাদের কোন ছল-চাতুরী-প্রবঞ্চনার দুঃখ-দুর্বিপাক পর্যুদস্ত করিতে পারে? তোমরা যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহা হইলে বলিতে হইবে—তোমরা ঈশ্বরতুল্য। কোন্ বহির্জগৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে পারে? তোমার অক্ষতদেহে সপ্তম নরকও অতিক্রম করিতে পারো, কিছুই তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিযোগ কর, বহিঃপ্রকৃতির উপর দোষারোপ কর—তাহাই প্রমাণ করে যে, তোমরা বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদের এইরূপ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের স্বরূপ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তোমরা যে দাবি কর, বস্তুতঃ তোমরা তাহা নও। দুঃখের উপর দুঃখ স্তূপীকৃত করিয়া, কেবল বহিঃপ্রকৃতি তোমাদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং 'হায়! কি ভীষণ শয়তানের জগৎ!' 'লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, ঐ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিতেছে' ইত্যাদি চীৎকার করিয়া তোমরা নিজেদের অপরাধ, দুঃখ দুর্দশা বাড়াইয়া তুলিতেছ। একে তো দুঃখ পাইতেছ, তদুপরি মিথ্যা আরোপ করিতেছ। কিছুকালের জন্য অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে; এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। চল, আমরা কর্মের উপায়গুলি নির্দোষ করিয়া তুলি; তাহা হইলে উদ্দেশ্য ও নিজ সম্বন্ধে নিজেই সজাগ হইবে। আমাদের জীবন যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পারে। জগৎ কার্য-স্বরূপ, আমরা কারণ-স্বরূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের নিষ্কলুষ ও পূর্ণ করিয়া তুলি।

কর্মযোগ-প্রসঙ্গে

যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই অবস্থা লাভ হইলে বোধ হইবে, আত্মা সর্বকালে একাই বিদ্যমান ছিলেন—তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। সুখী হইবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকিব, ততদিন আমরা ক্রীতদাস। 'পুরুষ' যখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাঁহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই এবং এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তখন মুক্তি বা 'কৈবল্য' লাভ হয়।

কয়েকটা ডলারের প্রত্যাশায় মানুষ ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে তাহার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে যে, তখন তাহারা ইচ্ছা করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করিতে পারিবে। তখন তাহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। কিন্তু আমরা সব বড়ই নির্বোধ!

একজনের ভুলত্রুটির কথা সর্বসমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবে ত্রুটি সংশোধিত হয় না। কারণ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্যই চেষ্টা করিয়া উন্নতিলাভ করিতে হইবে। যাহারা দৃঢ় এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহানুভূতিশীল। যে-কাজ মানব-জাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অর্পিত, তাহাই আসক্তি বা বন্ধনের কারণ হয় না।

কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিম্নতর কার্য করে বলিয়াই একজন—যে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিম্নস্তরের হয় না। কে কিরূপ কর্তব্য করিতেছে দেখিয়া মানুষকে বিচার করা উচিত নয়; সেই কর্তব্য সে কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বিচার করা উচিত। ঐ কার্য করিবার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ ব্যবসায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতে পারে, সে বড়।

প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। বদ্ধ ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানালোক দিতে কর্তব্য প্রভৃত সহায়তা করে, সন্দেহ নাই।

আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে—যাহা এখন আমাদের হাতে আছে, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সম্মানজনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমরা লাভ করিব।

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়া থাকে।

সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল বা মন্দ কোনটিই নয়।

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্যতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বর্তমান। ইহাই তাহার জীবনে বিরাট সফলতার হেতু। সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইতে পারে নাই, কিন্তু সে ক্রমশঃ এই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইতে পারিত, তবে তাহার জীবন বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবনের মতো মহান্ ও সার্থক হইতে পারিত। স্বার্থশূন্যতার তারতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার তারতম্য নির্ভর করে।

মানবজাতির মহান্ নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর কর্মক্ষেত্রের জন্যই আসেন।

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ পবিত্র বা একেবারে অপবিত্র—এখানে 'পবিত্রতা' অথবা 'অপবিত্রতা' হিংসা বা অহিংসা অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা অপরের অনিষ্ট না করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমাদের বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাভাব হইতেছে—হয়তো কোন মানুষের বা অপর প্রাণীর বা কোন ছোট উদ্ভিদের—কিন্তু যাহারই হউক না কেন, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতই ইহা বুঝা

যাইতেছে যে, কর্মের দ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনন্ত-কাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার-যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পথ পাইব না; আমরা ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু কাজ কখনও শেষ হইবে না।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাসকে চাবুক মারার প্রয়োজন হয়; ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ। জনসভার কোন বক্তা একটু বাহবা চায়। এইগুলি না দিয়া যদি তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেননা এইগুলি তাহার প্রয়োজন। ইহাই ক্রীতদাসের ভাবে কাজ করা। এরূপ অবস্থায় প্রতিদানে কিছু আশা করা অভ্যাস হইয়া পড়ে। ইহার পর ভৃত্যের মতো কর্ম করা। ভৃত্যের প্রয়োজন পারিশ্রমিকের—'আমি ইহা দিতেছি, তুমি উহা দাও।' 'কর্মের জন্য কর্ম করি'—এ-কথা বলার মতো সহজ আর কিছুই নাই। কিন্তু এইভাবে কর্ম করার মতো কঠিন আর কিছুই নাই। কর্মের জন্য কর্ম করে—এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও বহুদূর যাইতে রাজি আছি। কোথাও হয়তো একটি অভিসন্ধি থাকে। যদি অর্থের অভিসন্ধি না হয়, তবে প্রভুত্বের মতলব। যদি প্রভুত্ব না হয়, তবে লাভের উদ্দেশ্য। কোনরূপে কোথাও একটি প্রেরণা থাকিবেই। তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমার জন্য তোমার সহিত কাজ করিতে চাই। এ পর্যন্ত বেশ চমৎকার এবং প্রতিমুহূর্তে আমি আমার আন্তরিকতা ঘোষণা করিতে পারি। কিন্তু সাবধান, তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইতে হইবে। যদি তুমি একমত হইতে না পারো, তবে আমি আর তোমায় দেখিব না বা তোমায় সাহায্য করিব না! এরূপ অভিসন্ধিমূলক কর্ম দ্বারা দুঃখ হয়। মনকে বশে রাখিয়া আমরা যে কাজ করি, সে কাজই অনাসক্তি ও আনন্দের কারণ হয়।

একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে বিচার করিলে চলিবে না। প্রত্যেক লোককে তাহার ভাব অনুযায়ী বিচার করিতে হইবে, প্রত্যেক জাতিকে উহার আদর্শ অনুযায়ী এবং প্রতিটি দেশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজস্ব যুক্তি ও অবস্থা অনুসারে বিচার করিতে

হইবে। আমেরিকানরা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করে, তাহার প্রভাবেই আমেরিকাবাসীদের রীতি-নীতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ভারতবাসীদের পরিবেশের ফলেই ভারতীয় রীতি-নীতির উদ্ভব। এইভাবে চীন জাপান প্রভৃতি দেশের পক্ষেও এ-কথা প্রযোজ্য।

আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের পরিবেশ গড়িয়া ওঠে। খেলার সময় প্রতিটি গোলক উহার যথানির্দিষ্ট গর্তে গিয়া পতিত হয়। যদি একজনের কর্মক্ষমতা অপরের চেয়ে বেশী হয়, তবে সাংসারিক বিন্যাসে তাহা ধরা পড়িবেই। সুতরাং অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন একজন ধনী হয়তো দুষ্ট, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে, যাহার ফলে সে ধনী হইয়াছে। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকিলে সেও ধনশালী হইতে পারিবে। পরস্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করিয়া কি ফল? ইহা দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিব না। কাহাকেও ছোট কিছু করিতে হইতেছে বলিয়া যদি সে অভিযোগ করে, তবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অভিযোগ করিবে। সর্বক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত কিছুই পণ্ড হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য কর্মে নিয়ত অবিচল থাকিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, সে-ই আলোকের সন্ধান পায় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্তব্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

কর্মই উপাসনা

শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন না—কারণ তাঁহার মধ্যে কোন বন্ধনের ভাব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ এক চুম্বকের পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল। জাহাজের লোহার স্ক্রু পেরেক নাট বোল্টগুলি আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল এবং জাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। অজ্ঞানের অবস্থাতেই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই নাস্তিক। যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ম করিতে

পারেন না। আমরা অল্পবিস্তর নাস্তিক। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও নাই। তিনি আমাদের নিকট কথার কথা মাত্র, অর্থাৎ 'ঈশ্বর' এই শব্দমাত্র, ইহার বেশী কিছু নন। অনেক সময় আমরা মনে করি যে. তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্তু তারপর আবার পূর্বাবস্থায় পতিত হই। তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহার জন্য কর্ম করিবে? ঈশ্বরকে সাহায্য করা! আমাদের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যাহার অর্থ: বিশ্বকর্মাকে কি শিখাইতে হইবে, কি করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়? সুতরাং মানবজাতির মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা কোন কর্ম করেন না। অতঃপর যখন তোমরা জগৎ সম্বন্ধে এবং ভগবান্‌কে আমরা কিরূপে সাহায্য করিতে পারি, তাঁহার জন্য ইহা করিতে পারি, উহা করিতে পারি ইত্যাদি মূর্খের মতো কথাগুলি শুনিবে, তখন ঐ উক্তি মনে রাখিও। এইরূপ কোন চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতরে স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত। তুমি যে-সকল কর্ম কর, সবই তোমার নিজের জন্য, এগুলি তোমার নিজের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাকো। ঈশ্বর এমন কিছু খানায় পড়িয়া যান নাই যে, তুমি বা আমি একটি হাসপাতাল বা অনুরূপ কিছু নির্মাণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইব। তিনি তোমাকে কর্মের সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার এই বিরাট ব্যায়ামশালায় তোমার পেশীসমূহ চালনা করিবার জন্যই তিনি তোমাকে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়; তুমি যাহাতে নিজেকে সাহায্য করিতে পারো, এইজন্য। তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাও তোমার সাহায্য ব্যতীত মরিয়া যাইবে? ইহা পুরাদস্তুর ঈশ্বরনিন্দা! জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। জগৎ চলিতে থাকিবে--তুমি এই মহাসমুদ্রে একটি বারিবিন্দু মাত্র। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না—বাতাস বহিতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি—তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়। 'সাহায্য' এই শব্দটি তোমরা মন হইতে মুছিয়া ফেলো। সাহায্য তুমি করিতে পার না। এরূপ বলা ঈশ্বরের নিন্দা করা। তাঁহার কৃপাতেই তোমার অস্তিত্ব --তুমি কি মনে কর, তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তাঁহার উপাসনা করিতেছ। যখন কুকুরকে একটুকরা খাবার দাও, তখন ঐ

কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। ঐ কুকুরের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন। তিনি কুকুররূপে প্রকাশিত। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র। সমগ্র বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ, তবেই পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। ইহাই তোমার কর্তব্য হউক। ইহাই কর্মের যথার্থ মনোভাব। কর্মযোগ এই রহস্যই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

স্বার্থরহিত কর্ম

১৮৯৮ খৃঃ ২০ মার্চ কলিকাতা বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২তম অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় এইভাবে বলিয়াছিলেন :

গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মত-বিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং ঐ প্রকার কর্ম-সমূহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানমার্গী। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষের একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁহার নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর-বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিলেন। অনেকের ধারণা যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই—পরবর্তীকালে মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি মহাভারতের অংশ হিসাবে বিবেচিত না হয় এবং বাদ দেওয়া হয়, তবে মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেইগুলিও সমভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এখন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহা এই অর্থে বুঝেন যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ বা দুঃখ কোনটিই কর্মীর মন

স্পর্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে, বলিতে হইবে। কোন কোন প্রাণী তাহাদের শাবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্ম তাহাদের কোন দুঃখই হয় না। দস্যুরা অন্যের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করে। এই কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন প্রকার অনুভূতি তাহাদের না থাকে, তবে তাহারাও তো নিষ্কাম হইয়া কাজ করে বলিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। দেওয়ালের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি নাই, একটি প্রস্তরখণ্ডেরও ঠিক তাই—এই কারণে এ-কথা বলা যায় না যে, উহারাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে। ঐভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহারা দুষ্কর্ম করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিতেছে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীতা একটি ভয়াবহ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ নয়। অধিকন্তু গীতা-প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অর্জুন যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণকে বধ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি, বাসনা এবং ক্ষুদ্র আমিত্বকে লক্ষবার বিসর্জন দিয়াছিলেন।

গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং'-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করিলে 'আমি ইহা করিতেছি—উহা করিতেছি' এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বলে যে, যদি এই 'অহং'-বোধ না থাকে, যদি ইহা বিলুপ্ত হয়, তবে মানুষ কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে। আমরা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি; অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপে যেন সমাধিমগ্ন হইয়া করি। চিত্রকর যদি অহংবোধ ভুলিয়া চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন

হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রসমূহ আঁকিতে পারিবে। উত্তম পাচক যে-সকল খাদ্যবস্তু লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্য বোধসকল তিরোহিত হয়। এইরূপেই তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন না; এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহারা এইভাবে কর্ম করেন, তাঁহারা নিজের জন্য কখনও কিছু করেন না।

প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভাশুভ-মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, যাহাতে অশুভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুর্দিকে যেমন ধূম থাকে, তেমনি কর্মের সহিত কিছু অশুভ সর্বদাই থাকে। (আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়।) অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না, অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত, এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ—কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের জন্য করেন নাই। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দীপালোকে আমরা গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু কিছুসংখ্যক পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। যাঁহারা কাঁচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন, দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাঁহারা কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও মুক্তিলাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের এই রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন।

জ্ঞান ও কর্ম

[১৮৯৫ খৃঃ ২৩শে নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি পাওয়া যায়। বস্তু যত সূক্ষ্ম, ইহার শক্তিও ততই বেশী। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মানুষকেও প্রভাবিত করে, কারণ মন এক, আবার বহু। জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, মনগুলি যেন মাকড়সা।

এই জগৎ সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তারই প্রকাশ। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই সত্তা এই জগৎ। ইহাই মায়া। অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, অর্ধেক প্রকাশ—প্রভাতে যেমন সূর্যকে একটা লাল বলের মতো দেখায়। এইভাবে যা কিছু অশুভ ও মন্দ, তা প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা মাত্র, ভালোরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ।

(সরলরেখাকে অনন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। ভালোর সন্ধান আত্মানুসন্ধানেই ফিরিয়া আসে। 'আমি'ই রহস্যের সমগ্র রূপ—ঈশ্বর। কাঁচা আমিই দেহ; আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর।)

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হইবে কেন?—কারণ ইহাতে তাহার ইচ্ছা-শক্তি দৃঢ় হইবে। যাহা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনন ও ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, তাহাই নৈতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, তাহাই দুর্নীতি। দেশভেদে ব্যক্তিভেদে ইহার মানও পৃথক্। মানুষকে বিধিনিষেধ শাস্ত্রবচন প্রভৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হইব, তখন ইচ্ছা স্বাধীন। সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার নামই ত্যাগ। ইন্দ্রিয়-দ্বারেই ক্রোধ আসে, দুঃখ অনুভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া যাও।

একদা আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল, আমি জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম এবং মরিয়া গেলাম: কি ভয়াবহ প্রহেলিকা! দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তির জন্য কাতর ক্রন্দন!

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে? তাহা হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? ত্যাগের অর্থ তপস্বী

হওয়া নয়। সকল ভিক্ষুকই কি খ্রীষ্ট? দারিদ্র্য ও সাধুতা সমার্থক নয়; অনেক সময় ঠিক বিপরীত। প্রকৃত ত্যাগ মনের ব্যাপার। কিভাবে এই ত্যাগ আসে? মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি একটি হ্রদ দেখিলাম—চারিদিকে মনোরম দৃশ্যাবলীতে বৃক্ষরাজির বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই মরীচিকা বলিয়া প্রমাণিত হইল। তখন বুঝিলাম, মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্য দেখিয়াছি; শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি ঠেকিয়া শিখিলাম যে, উহা মিথ্যা। পরেও—প্রতিদিনই আমি ইহা আবার দেখিব, কিন্তু সত্য বলিয়া আর কখনও স্বীকার করিব না। সুতরাং আমরা যখন ঈশ্বরলাভ করি, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে। এগুলি পরে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তখন আমরা এগুলি মিথ্যা বলিয়াই জানিব।

পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতো মহাপুরুষদের জীবনেতিহাস। নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ করেন। দীন-দরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কথা ভাবো। দুঃখের পারে স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভাই সব, তোমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান।' তাঁহার কর্ম শান্ত, নীরব। দুঃখের কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই জানিবে যে, এই কর্ম নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু করিতে পারিবে। এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে কৃত হয়, ততই ভাল হয়, কারণ তাহা হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরও উর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন হয়। ভাল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও মঙ্গল দুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষা সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা কাঁটা বিঁধিয়াছিল, আর একটি কাঁটা দিয়া সে ইহা তুলিয়া ফেলিল। এই প্রথম কাঁটাটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্মা সেই শান্তি, যাহা ভাল ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে। বিশ্বসংসার বিলীন হইয়া যায়, তখনই মানুষ ভগবানের নিকটবর্তী হইতে থাকে। ক্ষণেকের জন্য সে স্বরূপ ফিরিয়া পায়, ঈশ্বরই হইয়া যায়। আবার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরূপে তিনি আবির্ভূত হন; তখন জগৎ-সংসার তাঁহার সম্মুখে কাঁপিতে থাকে। মূর্খ নিদ্রিত হয়, মূর্খরূপেই জাগরিত হয়। অজ্ঞান মানুষ—অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া, অনন্ত শক্তি পবিত্রতা ও প্রেমের অধিকারী হইয়া দেব-মানবরূপে ফিরিয়া আসে। অতীন্দ্রিয় অবস্থার ইহাই কার্যকারিতা।

যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধনা করা চলে। গীতা তো এইভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছে: সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত। নিষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং শান্তভাবের বৈশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন। আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। দেহ রথ, ইন্দ্রিয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম, এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবেই মানুষ মায়া অতিক্রম করে; সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির অধীন, ততক্ষণ সে এই সংসারের। যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় করে, তখন সে যথার্থ ত্যাগী।

দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না; সেক্ষেত্রে সংগ্রামই ভাল। পার্থসারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, 'আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত' এবং বলিয়াছিলেন, 'অর্জুন, তুমি মহাজ্ঞানীর মতো কথা বলিতেছ, কিন্তু তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ।' জলে থাকিয়াও যেমন পদ্মপত্র জলদ্বারা সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকিবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র—এখান হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে থাকো। সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলাভের একটি প্রয়াস। ত্যাগের বলে বলীয়ান্ ইচ্ছাশক্তির বিকাশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া তোল। জ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে।

(প্রথম সোপান হইল জীবনযাপনের আনন্দ। কৃচ্ছ্রসাধন পৈশাচিক। প্রার্থনা করা অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া হাসা অনেক ভালো। গান কর। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই দুঃখের ভাব সংক্রামিত করিও না। কখনও ভাবিও না যে, ঈশ্বর একটু সুখ বা একটু দুঃখ লইয়া ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকো। মুনিঋষিরা প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশিখরে যাইতেন।

দ্বিতীয় সোপান পবিত্রতা।

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সদসৎ বিচার কর। অনুভব কর, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। যদি ক্ষণেকের জন্যও মনে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 'মহদ্ভয়ে' আক্রান্ত হইবে। যখনই চিন্তা করিবে 'সোঽহং', তখনই অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত কর। কেহ আমাকে অভিশাপ দিলেও তাহার মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। আমার

দুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাপকারী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির তুমি উপকার কর, সেও তোমাকে উপকার করার সুযোগ দিতেছে। ঈশ্বরই কৃপাবশতঃ তোমাকে ঐভাবে তাঁহার পূজা করিবার অধিকার দেন।

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পারো। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্নবান্ হও না বলিয়াই বিফল হও। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ।

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভদ্র গালাগালির দ্বারা দাবানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই মুষ্টিমেয় 'গ্রীক' কথা বলে। ভুল-ত্রুটি কিছু না কিছু সর্বদাই থাকিবে। সেজন্য দুঃখ করিও না। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আহা! যদি আরও ভাল হইত!' মানুষের মধ্যে যদি দেবত্ব না থাকিত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা করিতে করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত।

কেহই পড়িয়া থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে না। সকলেই পরিণামে পূর্ণতা লাভ করিবে। দিনরাত বলো, 'ভ্রাতৃগণ, ওঠ, এস। তোমরাই পবিত্রতার অনন্ত সাগর! দেবতা হইয়া যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও।'

সভ্যতা কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অনুভব করাই সভ্যতা। যখনই সময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কর। এরূপ করিলেই সব হইবে। যাহা কিছু ঈশ্বর নয়, তাহা অস্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বরভাবান্বিত, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কর। দিনরাত মনে মনে এ-কথা বলো। এভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আবরণ পাতলা হইয়া যাইবে।

আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই। আমি স্ত্রী বা পুরুষ নই। আমার কোন সীমা নাই। আমি চিৎ-স্বরূপ—আমি সেই ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘৃণা নাই। আমার দুঃখ বা সুখ নাই। জন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই। কারণ আমি যে জ্ঞানস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ। হে আমার আত্মা, আমি সেই, 'সোঽহং'।

নিজেকে দেহভাবশূন্য—অনুভব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল না। ইহা আগাগোড়া কুসংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, রোগপীড়িত—সকলের মধ্যে দিব্য চেতনা জাগাইয়া তোল।

বাহ্যতঃ প্রায় প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাব-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উত্থিত হয়; কিন্তু একটি অন্যগুলিকে গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে। যে ভাব-তরঙ্গের পিছনে সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইরূপ করিয়া থাকে।

কনফ্যুসিয়স, মুসা, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার, ক্যালভিন, ও শিখগুরুগণ এবং থিওসফি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্নিহিত ভাব দেবত্ব প্রচার করা।

কখনও বলিও না, মানুষ দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতোই। প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা করে না। প্রেমই ঈশ্বর। সুতরাং এই ভক্তির পথেও আমরা আত্ম-স্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করি। 'সোঽহম্'। নগর, দেশ, জীব, জগৎকে ভাল না বাসিলে কিভাবে কাজ করা যায়? বিচারের দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরা সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করুক। এইভাবেই ঈশ্বর অনুভূত হন।

কিন্তু একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবে: কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। জানিও—ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই ধর্ম, অনুভূতিই ধর্ম। মানুষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। সর্বনিম্নস্তরের মানুষ পশু, উচ্চতম মানুষ সিদ্ধ বা পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব্দ, বর্ণ, মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতে হয়।

পৌত্তলিকতা যে শেষ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা: যখন বলো, 'আমি', তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না? যদি শরীর-চিন্তা আসে, তবে তুমি তখনও পুতুলপূজক। ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়—ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। যদি ঈশ্বর-বিষয়ে 'চিন্তা' কর, তবে তুমি নিতান্তই মূর্খ। অজ্ঞ সাধক প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করিতে পারে। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। অপরের বিশ্বাস নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

সর্বোপরি সর্বতোভাবে আন্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিলেই আসক্তি ও কামনা উদ্ভূত হয়, তাহা হইতেই মানুষ দুঃখ পায়। এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোনা দেখিয়া সোনার আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিস্বরূপ হও। যাহাতে কখনও কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর।

কর্মবিধান ও মুক্তি

মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের অর্থ কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ সৃষ্টি করে।

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থাকিয়া আমরা যে প্রকার মুক্তি অনুভব করি, উহা মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়।

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি—এ ধারণার সহিত আমি একমত নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, উচ্চতর নিয়মের দ্বারা নিম্নতর নিয়ম জয় করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; এবং যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় করিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই। ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না। তা বলিয়া ইহারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা; এবং এই নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বস্তু করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা

যায়, নিশ্চয় জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখিবে হিন্দুদের মতো আর কোন জাতির এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাতি-হিসাবে বিনাশ। কিন্তু হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব—তাঁহারা ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ বা গোঁড়ামির সৃষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে। নিয়ম চিরন্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ 'চিরন্তন বস্তু নিয়মের অন্তর্গত'—এ-কথা বলিলে চিরন্তনকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মানুষের সমান হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহা দ্বারা বদ্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ: গালিচা-নির্মাতা একখণ্ড গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল (যাহা সে গালিচায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে)। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক যেমন বড় বড় সম্রাটগণ কখন বা পুতুল লইয়া খেলা করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা করেন; এবং ইহাকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ সেটুকু বেশ চলে। আমরা ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই; সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবদ্ধ। এ-কথা বলা মূর্খতা যে নিয়ম অনন্ত—প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে। সকল যুক্তিই যদি অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? সুতরাং বিধি বা নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমরা আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি—মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। বেদান্ত সর্বদা মুক্তির বাণীই ঘোষণা করে। বেদান্তবাদী নিয়মকে বড় ভয় পায়; চিরন্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্তু। কারণ তাহা হইলে

আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, তবে তৃণখণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমরা বস্তুসম্পর্কশূন্য নিয়মে বিশ্বাস করি না।

আমরা বলি, মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবানই সেই মুক্তি। অন্যান্য বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ; কিন্তু সসীম বস্তুতে খুঁজিলে মানুষ সুখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে যে-আনন্দ লাভ করে, চোর চুরি করিয়া সেই একই আনন্দ পায়; কিন্তু চোর দুঃখরাশির সহিত [illegible] পায়। ভগবান্‌ই প্রকৃত সুখ। প্রেমই ভগবান্, মুক্তিই [illegible] যাহা [illegible]ছু বন্ধন, তাহা ভগবান্ নয়।

[illegible] র্ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহা আবিষ্কার করিতে হইবে। মানুষ তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ-কথা ভুলিয়া যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করাই প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবন। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞলোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহা জ্ঞাতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞ লোক আবিষ্কার করে অজ্ঞাতসারে। প্রত্যেকেই—অণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত—মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাঁহাকে আরও দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি রেড ইণ্ডিয়ানের স্বাধীন ভাবকে মোটেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন না।

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত ভাব, এবং মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য। ইহার জন্যই মানুষ চেষ্টা করিতেছে। শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ: বিজ্ঞানী কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি ঐ তরঙ্গাঘাত অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পারে। তবে আমরা প্রকৃতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করি না কেন? নিয়ম আমরা চাই না, আমরা চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য। আমরা বিধিবহির্ভূত হইতে চাই। নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইলে মৃৎপিণ্ড হইয়া যাইবে। তুমি নিয়মের বাহিরে গিয়াছ কিনা—সেইটি প্রশ্ন নয়; কিন্তু আমরা নিয়মের ঊর্ধ্বে—এই

চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, একজন বনে বাস করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষা পায় নাই। সে একটি পাথরের টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল—এ তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা, সে কিন্তু ভাবে, ইহা মুক্তি; সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে, ইহার অন্তর্নিহিত ভাব মুক্তি। কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের টুকরাটি অবশ্যই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে স্বভাব বলে, অচেতন যন্ত্রবৎ কর্ম বলে। আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই মানুষ-হিসাবে আমার গৌরব। যদি আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন ওখানে যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া আমি যন্ত্রে পরিণত হই। অনন্ত শক্তি সত্ত্বেও প্রকৃতি একটি যন্ত্রমাত্র; মুক্তিই সচেতন জীবনের উপাদান।

বেদান্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। সে এই প্রকৃতিকে মুক্ত বলিয়া মনে করে, নিয়মের দ্বারা শাসিত মনে করে না। মানব-জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার পরই আমরা এই প্রকার চিন্তা করিতে শিখিব, কিন্তু আরও দার্শনিক অর্থে। উদাহরণ-স্বরূপ: আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই। ইচ্ছার প্রেরণা পাইলাম, তারপর থামিয়া গেলাম; ইচ্ছা হওয়া ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে-সময়টুকুর ব্যবধান, সেই সময়ে আমি সমভাবে কাজ করিতে থাকি। কর্মের সঙ্গতিকেই আমরা নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেজন্যই আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পাঁচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের আবেগ দিয়াছিল। সুতরাং মানুষ বলে যে, সে স্বাধীন, কারণ তাহার সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়; এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সে-সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খণ্ডগুলি দেখিতে পাই; কিন্তু আদি ও অন্ত অবশ্যই স্বাধীন আবেগ। প্রথমেই মুক্তির প্রেরণা প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমাদের কার্যকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, আমরা স্বাধীন বা মুক্ত

নই। তথাপি এই চেতনা থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। এই চেতনা কিভাবে আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের মধ্যে এই দুইটি প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে, সব কার্যেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণাদ্বারা আমরা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই—মুক্তি বা স্বাধীনতা ভিতরেই আছে, আত্মা যথার্থই মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের ভিতর দিয়া পরিক্রুত হইয়া আসিতেছে; এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়।

যখনই আমরা কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। ঐ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত-স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তু বা অতি দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা মুনি জন্তু বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহজীবনেই তাঁহারা আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব বা সমদর্শনের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি; প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতি, মানবজাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই প্রচেষ্টা। যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে—দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্বই উপাসনা করিতেছে; মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও সে আর একভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহারা অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কখনও ভাবে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করা কঠিন।

আমরা সীমাবদ্ধ—এই বিশ্বাস বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই হয়, তবে শক্তি বর্ধিত কর, এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্য অবগত হইয়া মাত্র বারো বৎসরে উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত বৎসর।

সরল রাজযোগ

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের (Mrs. Sara C. Bull) বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহিত 'যোগ' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, মিসেস বুল তাহা লিখিয়া রাখেন। পরে ভক্ত স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণের জন্য আমেরিকার বন্ধুগণ ১৯১৩ খৃঃ তাহা প্রকাশ করেন। বর্তমান পুস্তিকা তাহারই ভাষান্তর।

*　　　*　　　*

ভারতীয় ইংরেজী সংস্করণ (Six Lessons on Raja Yoga) ১৯২৮ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের নিবেদন হইতে শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তির অনুবাদ দেওয়া হইল :

এই পাঠগুলি সম্বন্ধে বলা যায়—আধ্যাত্মিক সাধনার কথা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত, উপরন্তু আছে—বিশেষতঃ রাজযোগ-সাধনার বহু মূল্যবান্ ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ।

*　　　*　　　*

প্রস্তাবনা

রাজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মনের বিশ্লেষণ; অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যসংগ্রহ দ্বারাই এতে আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলা হয়। সকল দেশের মহান আচার্যেরাই বলে গেছেন, 'দেখেছি ও জানি।' যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, তাঁদের প্রচারিত সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগ-লব্ধ।

স্মৃতি বা চেতনা সত্তার সীমা হ'তে পারে না; কেন না আর একটা অতীন্দ্রিয় অবস্থা আছে; সেখানে এবং অচেতন অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নেই, কিন্তু এই দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, যেমন—জ্ঞান আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেটা ঠিক বিজ্ঞানের মতোই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

যোগ আমাদের শিক্ষা দেয়—কিভাবে জড়কে অধীন ক'রে রাখা যায়; জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে।

'যোগ' মানে (Yoke) জুড়ে দেওয়া; অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ক'রে দেওয়া।

মন চেতন-ভূমিতে ও তার নিম্নস্তরে কাজ করে। আমরা যাকে চেতনা বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা শিকলি-মাত্র।

একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই 'আমি', আর তার চারদিকে বিরাট অচেতন সত্তা; এই 'আমি'র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি।

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যোগ অভ্যাস করলে মনের স্তর একটার পর একটা উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের সামনে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়। আমরা দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্তু মাঝ-রাস্তায় আমরা যেন থেমে না যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাঁচের 'মালা' যেন আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে না দেয়।

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারলে আমাদের বিনাশ।

যাঁরা সাধক—সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁদের তিনটি জিনিস দরকার।

প্রথম: ইহলোকের ও পরলোকের সব ভোগ-বাসনা ছাড়তে হবে; চাইতে হবে শুধু ভগবান্ আর সত্য।

দ্বিতীয়: সত্য আর ভগবানকে লাভ করবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই। যে-মানুষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি ব্যাকুল হও; সত্য ও ভগবানের জন্য ঐরকম অধীর হও।

তৃতীয়: ছ-টি শিক্ষা। ১ম—মনকে বহির্মুখ হ'তে না দেওয়া। ২য়—মনকে অন্তর্মুখ ক'রে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা। ৩য়—প্রতিবাদ না ক'রে সব জিনিস সহ্য করা। ৪র্থ—শুধু ঈশ্বরকে চাও, আর কিছুই নয়। আপাত-মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাতে না পারে। সব ত্যাগ ক'রে শুধু ভগবানকেই চাও। ৫ম—উপস্থিত কোন একটা বিষয় নাও, তার শেষ পর্যন্ত বিচার কর, সমাধান না ক'রে ছেড়ো না। সময়ের হিসাব ক'রো না। আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জন্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুরা করুক, আমরা কখনও তাদের মতো ভোগ করতে পারি না। মানুষ মননশীল; মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের সন্ধান পায়, ততদিন সে সংগ্রাম করবেই। নিষ্ফল বৃথা কথাবার্তায় সে নিজের শক্তিক্ষয় করবে না। সামাজিকতা ও লোকমতের পূজাই হচ্ছে পৌত্তলিকতা। আত্মা—লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ষ্ঠ—সর্বদা নিজের স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কারের পারে যাও। ক্রমাগত 'আমি ছোট, আমি ছোট'—এই ভেবে নিজেকে ছোট ক'রে ফেলো না, যতদিন না ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বলো—তোমার স্বরূপের কথা।

এই সব কঠোর সাধননিষ্ঠা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়।

নিরপেক্ষ পরব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনও তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না; যে মুহূর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাঁকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলি; ফলে অনন্ত হয়ে পড়েন সান্ত।

ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে হবে, আর এ শক্তি আমাদের আছে।

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস ক'রে শিষ্য গুরুকে জানাবে।

প্রথম পাঠ

প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব অনুশীলন করতে হবে। সকলেই এক কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হবে।

'কল্পনাই প্রেরণার উৎস ও চিন্তার ভিত্তি।'

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথর পড়ে—এটা বাইরের ঘটনা, কিন্তু 'মাধ্যাকর্ষণ'-আবিষ্কারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, বাইরে নয়।

যে বেশী খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় বা যে খুব কম ঘুমোয়, সে যোগী হ'তে পারে না।[১]

অজ্ঞান, চঞ্চলতা ঈর্ষা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি—এই ক-টি যোগাভ্যাসের পরম শত্রু। যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়:

প্রথম—দেহ ও মনের পবিত্রতা। সব রকমের মলিনতা, যা মনকে নীচে নামিয়ে দেয়, যোগী তা পরিত্যাগ করবে।

দ্বিতীয়—ধৈর্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য দর্শনাদি হবে, তারপর সে-সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু ধরে থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই।

তৃতীয়—অধ্যবসায়। সম্পদে বিপদে, স্বাস্থ্যে রোগে—সব সময়ে যোগ অভ্যাস ক'রে যাও; একটি দিনও বাদ দিও না।

যোগ-সাধনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ—সে-সময় দেহ ও মন খুব শান্ত থাকে, চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই তখন প্রাবল্য থাকে না। যদি সে-সময় না পারো, তা হ'লে ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে যাবার আগে সাধন অভ্যাস করবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা খুব পরিপাটিভাবে প্রয়োজন (প্রত্যহ স্নান করবে)।

স্নানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে, মনে করবে, তুমি যেন পাহাড়ের মতো অটল, কোন কিছুই তোমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের উপর

১ গীতা, ৬।১৬

জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা ঋজুভাবে রাখবে। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়েই সব ক্রিয়া হয়, কাজেই সেটিকে দুর্বল করা চলবে না।

পায়ের আঙুল থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা কর, দরকার মনে হয় তো প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করবে।

মাথায় না পৌছনো পর্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের প্রতি অঙ্গ স্থির করতে করতে ওপরের দিকে আসবে, যেন একটি অঙ্গও বাদ না যায়। তারপর সমস্ত দেহটি স্থির ক'রে রাখবে। সত্য লাভ করবার জন্তে ভগবান তোমায় এই দেহ দিয়েছেন ; এই নৌকা আশ্রয় করেই সংসার-সমুদ্রের পরপারে চিরন্তন সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে।

এইটি করা হয়ে গেলে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবে, তারপর দুই নাসা দিয়েই নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তারপর যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে পারো, শ্বাস রুদ্ধ ক'রে থাকবে। এইরকম চারবার করা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবে এবং জ্ঞানালোকের জন্ম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে।

'যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন'—আসনে বসে দশ-পনর মিনিট এই মন্ত্রটির[১] অর্থ চিন্তা কর।

যে-সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে, গুরু ছাড়া আর কাকেও তা বলবে না।

যতটা সম্ভব কম কথা বলবে।

সৎ চিন্তা করবে, আমরা যা চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎ চিন্তা মনের সকল মলিনতা দগ্ধ করতে সাহায্য করে।

যোগী ছাড়া আর সকলেই যেন ক্রীতদাস। মুক্তিলাভের জন্ম বন্ধনের পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে।

অতীন্দ্রিয় সত্তাকে সকলেই জানতে পারে। ভগবান যদি সত্য হন, তবে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে ; আত্মা যদি থাকে, তবে নিশ্চয় আমরা তাকে দর্শন ও অনুভব করতে পারবো।

আত্মবস্তু আছে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপায়—এমন একটা কিছু হওয়া, যা দেহ নয়।

যোগীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় (অথবা জ্ঞান ও কর্ম)।

অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের স্তর চারটি :

প্রথম—মনঃ, মনন বা চিন্তাশক্তি। একে সংযত না করলে এর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায় ; সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়—বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি (তাকে বোধশক্তিও বলা যায়)।

তৃতীয়—অহংকার বা 'অহং'-বুদ্ধি।

চতুর্থ—চিত্ত, এইটিই হ'ল উপাদান, যাতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে, মনের ভিত্তিতল, সকল বৃত্তির আধার। এ যেন সমুদ্র, আর বৃত্তিগুলি যেন এরই তরঙ্গ।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নামই যোগ—'যোগ' এক প্রকার বিজ্ঞান, যার সাহায্যে আমরা চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া বন্ধ করতে পারি। সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আত্মার প্রতিবিম্বও তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মতো শান্ত হয়, তখনই তাতে চাঁদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই ; তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত হয়, তখনই আত্মদর্শন ঘটে।

মনের উপাদান চিত্ত শরীর নয়—সূক্ষ্মতর জড়বিশেষ, এবং চিরকাল দেহ দ্বারা আবদ্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে আমাদের দেহ-বন্ধন যে শিথিল হয়ে যায়, তাই এর প্রমাণ। ইন্দ্রিয়সমূহ বশে এনে আমরা ইচ্ছামত এই অবস্থালাভ করবার অভ্যাস করতে পারি।

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হ'লে আমরা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কারণ ইন্দ্রিয়গণ যে-সব বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়, সেগুলি নিয়েই তো আমাদের জগৎ। স্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহ্ন। ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ।

যে ইন্দ্রিয়ের অধীন সেই সাংসারিক, সেই ক্রীতদাস।

চিত্তবস্তুর বিভিন্ন বৃত্তি-তরঙ্গে ভেঙে পড়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলেই আমাদের দেহবোধ চলে যায়। এই দেহগুলি তৈরি করতে কোটি কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সেই প্রচেষ্টার মধ্যে এই দেহপ্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাভ করা, তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ভাবি, এই দেহটাকে তৈরি করাই বুঝি আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ; ইহাই মায়া। এই মায়া আমাদের ভাঙতে হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরতে হবে ; আর উপলব্ধি করতে হবে—আমরা দেহ নই, দেহ আমাদের ভৃত্য।

মনকে দেহ থেকে আলাদা ক'রে দেখতে শেখো, ভাবো—মন দেহ থেকে পৃথক্। এই জড় দেহটাকে আমরাই চেতনা ও জীবন দিই, তারপর ভাবি এটা চেতন ও বাস্তব। আমরা এত দীর্ঘকাল ধরে এই পোশাকটা প'রে আসছি যে, এখন ভুলে গেছি আমরা ও এই পোশাক অভিন্ন নই ; এবং ইচ্ছামত এই পোশাক ছেড়ে ফেলা যায়। যোগ এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে। দেহ একটা যন্ত্রমাত্র, আমাদের দাস—প্রভু নয় ; মনঃশক্তি-সমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাভ্যাসেব মুখ্য ও মহান্ উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—যে-কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে মনের শক্তিগুলি নিয়োগ করা।

যদি বেশী কথা বলো, তাহ'লে যোগী হ'তে পারবে না।

দ্বিতীয় পাঠ

এই যোগের নাম অষ্টাঙ্গযোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি। যথা—

প্রথম—যম। যোগের এই অঙ্গটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইটি সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত :

(১) কায়মনোবাক্যে হিংসা না করা।

(২) কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।

(৩) কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা।

(৪) কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া।

(৫) কায়মনোবাক্যে বৃথা দান গ্রহণ না করা (অপ্রতিগ্রহ)।

দ্বিতীয়—নিয়ম। শরীরের যত্ন, স্নান, পরিমিত আহার ইত্যাদি।

তৃতীয়—আসন। মেরুদণ্ডের উপর জোর না দিয়ে কটিদেশ, স্কন্ধ ও মাথা ঋজুভাবে রাখতে হবে।

চতুর্থ—প্রাণায়াম। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযম।

পঞ্চম—প্রত্যাহার। মনকে বহির্মুখ হ'তে না দিয়ে অন্তর্মুখ ক'রে কোন জিনিস বোঝবার জন্য বারংবার আলোচনা।

ষষ্ঠ—ধারণা। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

সপ্তম—ধ্যান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

অষ্টম—সমাধি। জ্ঞানের আলোক লাভ করাই আমাদের সকল সাধনার লক্ষ্য।

যম ও নিয়ম সারা জীবন ধরে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। জোঁক যেমন একটা ঘাস দৃঢ়ভাবে না ধরা পর্যন্ত আর একটা ছেড়ে দেয় না, তেমনি একটি সাধন ছাড়বার আগে অপরটি বেশ ক'রে বোঝা এবং অভ্যাস করা চাই।

আজকের আলোচ্য বিষয়—প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মন। রাজযোগের সাধনায় প্রাণবায়ু চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়ে যায়। প্রাণবায়ু বা শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে সমগ্র দেহ-যন্ত্রের নিয়ামক মূল চক্র (Fly-wheel)। প্রাণ প্রথমে ফুসফুসে, ফুসফুস থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে রক্ত-প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে, সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ করে। ইচ্ছা-শক্তি বাহ্য সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে, বাহ্য সংবেদনও ইচ্ছা-শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। আমাদের ইচ্ছা দুর্বল; আমরা এতই বদ্ধ যে, ইচ্ছার যথার্থ শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমাদের অধিকাংশ কার্যের প্রেরণা আসে বাইরে থেকে; বহিঃপ্রকৃতি আমাদের অন্তরের সাম্যভাব নষ্ট করে, কিন্তু আমরা তার সাম্যভাব নষ্ট করতে পারি না (যেটা আমাদের পারা উচিত)। কিন্তু এ-সবই ভুল, প্রকৃতপক্ষে, অধিকতর শক্তি রয়েছে আমাদের ভেতরে।

যাঁরা নিজেদের অন্তরের চিন্তারাজ্য জয় করেছেন, তাঁরাই বড় বড় সাধু ও আচার্য, তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী। উচ্চ দুর্গে আবদ্ধ কোন মন্ত্রীকে তাঁর স্ত্রী গুবরে-পোকা, মধু, রেশমের সুতো, দড়ি ও কাছি দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন—এই রূপকের[১] সাহায্যে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে—প্রাণের নিয়মন থেকে কি ক'রে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় করা যায়। প্রাণায়াম-রূপ রেশমসুতার সাহায্যেই একটার পর একটা শক্তি আয়ত্ত ক'রে আমরা একাগ্রতা-রূপ রজ্জু ধ'রব, আর সেই রজ্জুর সাহায্যে দেহ-কারাগার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ ক'রব। মুক্তি লাভ ক'রে তার সাধনগুলি আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটি: ১ম: পূরক—শ্বাসগ্রহণ। ২য়: কুম্ভক—শ্বাসরোধ। ৩য়: রেচক—শ্বাসত্যাগ।

দুটি শক্তি-প্রবাহ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ড বয়ে তার শেষভাগে পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে আবার মস্তিষ্কে ফিরে যায়। প্রবাহ-দুটির একটির নাম সূর্য (পিঙ্গলা), এটি মস্তিষ্কের দক্ষিণার্ধ থেকে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের বাঁদিকে মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার মেরুর নীচে চার (৪)-এর অর্ধেকের মতো আকারে আর একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে যায়।

অন্য প্রবাহটির নাম চন্দ্র (ঈড়া), এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উলটো এবং ৪-এর আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে চার (৪)-এর মতো হলেও এর নীচের দিকটা উপরের দিকের চেয়ে অনেকটা লম্বা। এই দুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, আর বিভিন্ন কেন্দ্রে যাকে আমরা 'চক্র' (plexuses) বলি, এরা প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে, কিন্তু তা আমরা প্রায় জানতে পারি না। একাগ্রতার দ্বারা এই শক্তিসমূহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অনুভব করতে পারি। এই 'সূর্য ও চন্দ্রে'র প্রবাহ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ক'রে আমরা সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়া এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

১ এই খণ্ডের 'রাজযোগ' গ্রন্থের ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

রথী আত্মা ও সারথি বুদ্ধি সেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিরূপ ঘোড়াকে সংযত করতে না পারে, তা হ'লে কখনও লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না, দুষ্ট ঘোড়ার মতো ইন্দ্রিয়গুলি রথকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে গিয়ে রথীকে ধ্বংস করেও ফেলতে পারে। কিন্তু এই দুটি শক্তি-প্রবাহ (ঈড়া ও পিঙ্গলা) দুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগামের মতো ; এ দুটি (লাগাম) আয়ত্তে রেখে সারথি ওগুলিকে (অশ্ব) নিয়ন্ত্রণ করবে। নীতিপরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হ'লে আমাদের কর্মগুলিকে আমরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। নীতিশিক্ষাগুলি কি ক'রে কর্মে পরিণত করতে পারা যায়, যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য। জগতের বড় বড় আচার্যমাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শক্তিপ্রবাহকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ-দুটিকে যোগীরা মেরুর নিম্নভাগে (মূলাধারে) সংযত ক'রে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই তা জ্ঞানপ্রবাহে পরিণত হয়, এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাধন-প্রণালী—সকলের পক্ষে এক রকম নয়। প্রাণায়াম—একটা ছন্দের তালে তালে নিয়মিত ভাবে করতে হবে এবং তা করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণনা করা, তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মতো হয়ে পড়ে, তাই গণনার নির্ধারিত সংখ্যায় আমরা পবিত্র 'ওঁ'কার মন্ত্র জপ করি।

এই প্রাণায়ামে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ ক'রে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে বাম নাসায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়।

তারপর বাম নাকে তর্জনী রেখে দুটি নাসাই বন্ধ কর, মাথাটিকে বুকের উপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার 'ওঁ' জপ করতে করতে শ্বাস রোধ ক'রে রাখো।

তারপর মাথা ফের সোজা ক'রে দক্ষিণ নাসা থেকে অঙ্গুষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলো।

যখন শ্বাস ফেলা শেষ হ'য়ে যাবে, তখন ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের ক'রে দেবার জন্য তলপেট সঙ্কুচিত করবে। তারপর বাম নাসা বন্ধ ক'রে

চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে দক্ষিণ নাসা দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে।

তারপর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসা বন্ধ ক'রে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস রোধ ক'রে আটবার 'ও' জপ করবে। তারপর আবার মাথা সোজা ক'রে বাম নাসা খুলে দিয়ে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। সেই সময় আগের মতো তলপেট সঙ্কুচিত করা চাই।

যখনই বসবে, এইরকম দুবার করবে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় দুবার ও বাম নাসায় দুবার—মোট চারবার প্রাণায়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা ক'রে নিলে ভাল হয়।

এক সপ্তাহ ধ'রে এইরকম অভ্যাস প্রয়োজন। তারপর ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও; সঙ্গে সঙ্গে জপের (শ্বাস-গ্রহণ, রোধ ও ত্যাগের) সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে, অর্থাৎ যদি ছ-বার প্রাণায়াম কর, তা হ'লে শ্বাস নেবার সময় ছ-বার, নিশ্বাস ফেলবার সময় ছ-বার ও কুম্ভকের সময় বারো বার 'ওঁ' জপ করতে হবে। এই প্রাণায়াম-অভ্যাসের দ্বারা আমরা আরও বেশী পবিত্র, নির্মল ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হবো। বিপথে চালিত হ'য়ো না; কোন শক্তি (সিদ্ধাই) চেও না। প্রেমই একমাত্র শক্তি, যা চিরকাল থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যারা রাজযোগের পথে ভগবানের কাছে আসতে চায়—তাদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত সবল হ'তে হবে। প্রতিটি পা ফেলবে আলোকিত পথে।

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে, 'এই সংসার অতিক্রম ক'রে আমি ভগবানের কাছে পৌছব।' সত্যের সম্মুখীন হ'তে পারে, এমন লোক খুব কম, কিন্তু তবু কোন-কিছু করতে গেলে সত্যের জন্য আমাদের মরতেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয় পাঠ

কুণ্ডলিনী। আত্মাকে জড় ব'লে জানলে চলবে না, তার যথার্থ স্বরূপ জানতে হবে। আমরা আত্মাকে দেহ ব'লে ভাবছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও চিন্তা থেকে পৃথক্ ক'রে ফেলতে হবে; তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমরা অমৃতস্বরূপ। পরিবর্তন মানেই কার্যকারণের দ্বৈতভাব; আর যা কিছু পরিবর্তনশীল, তাই নশ্বর। সুতরাং দেহ বা মন অবিনাশী হ'তে পারে না, কেন না তারা সর্বদা পরিবর্তনশীল। যা অপরিবর্তনীয়, একমাত্র তাই অবিনাশী; কারণ তার উপর ক্রিয়া করতে পারে, এমন আর কিছু নেই।

আমরা তৎ-স্বরূপ হয়ে যাই না, চিরকালই আমরা সেই সত্যস্বরূপ। কিন্তু যে অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, তা সরিয়ে দিতে হবে। দেহ হচ্ছে চিন্তার বাহ্য বস্তুগত রূপ। সূর্য (পিঙ্গলা) চন্দ্রের (ঈড়া) গতি দেহের সর্বাংশে শক্তিসঞ্চার করছে; অবশিষ্ট শক্তি মেরুদণ্ডের (সুষুম্নার) অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে—সাধারণ ভাষায় স্নায়ুকেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। এই গতিগুলি মৃতদেহে দেখা যায় না, কেবল সুস্থ সবল শরীরেই থাকে।

যোগীর এই সুবিধা—তিনি যে শুধু এগুলি অনুভব করেন তা নয়, সত্য সত্যই এগুলি দেখতেও পান। এগুলি প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময়; চক্রগুলিও ঠিক তাই।

কার্য সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন—এই দুই প্রকার। যোগীদের আর এক প্রকার কর্ম আছে, সেটি অতিচেতন; এইটিই হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকালে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস। সহজাত জ্ঞানের ক্রমবিকাশই আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। অতিচেতন অবস্থায় কোন ভুল হয় না; কিন্তু সহজাত জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেও তা নিছক যান্ত্রিক, কারণ এ স্তরে সজ্ঞান ক্রিয়া থাকে না। একে 'প্রেরণা' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যোগীরা বলেন, 'এই শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে আছে', কালে সকলেই এই শক্তির অধিকারী হবে।

চন্দ্র ও সূর্যের (ঈড়া ও পিঙ্গলা) গতিকে একটা নতুন দিকে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য একটা নতুন পথ খুলে

দিতে হবে। যখন এই 'সুষুম্না'-পথ দিয়ে তাদের গতি সহস্রার পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহজ্ঞান একেবারে চলে যাবে।

মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে যে 'মূলাধার-চক্র' আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানটি হচ্ছে প্রজনন-শক্তিবীজের আধার। একটি ত্রিকোণ-মণ্ডলে একটি ছোট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে—যোগীরা এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই নিদ্রিত সর্পই কুণ্ডলিনী, এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে রাজযোগের একটিমাত্র লক্ষ্য।

পাশব কার্য থেকে যে যৌনশক্তি উত্থিত হয়, তাকে ঊর্ধ্বদিকে মানব-শরীরের মহাবিদ্যুদাধার মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে তা 'ওজঃ' বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সকল সৎ চিন্তা, সকল প্রার্থনা ঐ পশুশক্তির কিছুটা ওজঃশক্তিতে পরিণত ক'রে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-লাভে সাহায্য করে। এই 'ওজস্' হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, একমাত্র মনুষ্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। যাঁর ভেতরে সমগ্র পাশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা। তাঁর কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করে।

যোগীরা মনে মনে কল্পনা করেন যে, এই কুণ্ডলিনী সর্প সুষুম্না-পথে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে উপনীত হয়। মনুষ্যশরীরের শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌন-শক্তি যে পর্যন্ত না ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে পর্যন্ত নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে না।

কোন শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না; তবে তাকে শুধু ঈপ্সিত পথে চালিত করা যেতে পারে। অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের অধিকারে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ঐ শক্তিকে পাশব হ'তে না দিয়ে আধ্যাত্মিক ক'রে তুলতে হবে। এইভাবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পবিত্রতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ রাজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অপরিহার্য; বিবাহিত বা অবিবাহিত—উভয়ের পক্ষে একই নিয়ম। দেহের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্তুর যে অপচয় করে, সে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে না।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, সর্বযুগের বড় বড় সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিগণ হয় সাধু-সন্ন্যাসী, না হয় তাঁরা বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেছেন। যাঁদের জীবন পবিত্র, কেবল তাঁরাই ভগবানের দর্শন পান।

প্রাণায়ামের পূর্বে ঐ ত্রিকোণ-মণ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ ক'রে এর ছবি মনে মনে স্পষ্টরূপে কল্পনা করবে। ভাবো, এর চারপাশে আগুনের শিখা, আর তার মাঝখানে কুণ্ডলীকৃত সর্প ঘুমিয়ে রয়েছে। ধ্যানে যখন এই কুণ্ডলিনী শক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন কল্পনায় তাকে মেরুদণ্ডের মূলাধারে স্থাপন কর; কুম্ভক-কালে শ্বাস রুদ্ধ রাখার সময় (সুপ্ত) কুণ্ডলিনীকে জাগাবার জন্য ঐ রুদ্ধ বায়ু সবলে তার মস্তকে নিক্ষেপ করবে। যার কল্পনা-শক্তি যত বেশী, সে তত শীঘ্র ফল পায়, আর তার কুণ্ডলিনীও তত শীঘ্র জাগেন। যতদিন তিনি না জাগেন, ততদিন কল্পনা কর—তিনি জেগেছেন। আর ঈড়া ও পিঙ্গলায় গতি অনুভব করবার চেষ্টা কর, জোর ক'রে তাদের সুষুম্না-পথে চালাতে সচেষ্ট হও। এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে।

চতুর্থ পাঠ

মনকে সংযত করবার পূর্বে মনকে জানতে হবে।

চঞ্চল মনকে সংযত ক'রে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে স্থির ক'রে রাখতে হবে। বারবার এইরকম করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সংযত ক'রে, রুদ্ধ ক'রে ভগবানের মহিমা চিন্তা কর।

মনকে সংযত করবার সব চেয়ে সোজা উপায় চুপ ক'রে বসে কিছুক্ষণের জন্য মনকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে সে ভেসে যেতে চায় যাক—দৃঢ়ভাবে চিন্তা করবে, 'আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী; বসে বসে মনের ভাসাডোবা—ভেসে-যাওয়া দেখছি। মন আমি নয়।' তারপর মনটাকে দেখ। ভাবো, মন থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে চিন্তা কর, জড়বস্তু বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ফেলো না।

কল্পনা কর—মন যেন তোমার সম্মুখে প্রসারিত একটা নিস্তরঙ্গ হ্রদ, এবং যে চিন্তাগুলি মনে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি যেন হ্রদে বুদ্বুদ্ উঠছে আর তার বুকে লয় পাচ্ছে। চিন্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন চেষ্টা ক'রো

না, কল্পনার চক্ষে সেগুলি কেবল সাক্ষীর মতো দেখে যাও—কেমন ক'রে তারা ভেসে চলেছে। একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন তরঙ্গ ওঠে, তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তরঙ্গ তত কমে আসে; তেমনি মনকে ঐভাবে ছেড়ে দিলে তার চিন্তার পরিধি যত বেড়ে যাবে, মনোবৃত্তি তত কমে আসবে। কিন্তু আমরা এই প্রণালী উল্টে দিতে চাই। প্রথমে একটা চিন্তার বড় বৃত্ত থেকে আরম্ভ ক'রে সেটাকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির ক'রে রাখতে হবে। এই ভাবটি ধারণা কর: আমি মন নই; আমি দেখছি—আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। এইরকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে অভিন্নভাব, তা দিন দিন কমে আসবে; শেষ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ক'রে ফেলতে পারবে, এবং ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার থেকে পৃথক্।

এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য। তাকে তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। যোগী হওয়ার প্রথম স্তর—ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করা; আর যখন মনকে জয় করা হয়ে গেছে, তখন সাধক সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে।

যতদূর সম্ভব একলা থাকবে। আসন নাতি-উচ্চ হওয়া উচিত; প্রথমে কুশাসন, তারপর মৃগচর্ম, তারপর রেশম বা পট্টবস্ত্র বিছাবে। হেলান দেবার কিছু না থাকাই ভাল, আর আসন যেন দৃঢ় হয়।

সর্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ ক'রে মনকে খালি ক'রে ফেলো; যখনই কোন চিন্তা মনে উঠবে, তখনই তাকে দূর ক'রে দেবে। এই কাজ সম্পন্ন করতে গেলে জড় বস্তুকে ও আমাদের দেহকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই ঐ অবস্থা আনবার একটি অবিরাম চেষ্টা।

চিন্তাগুলি ছবি, ওগুলি আমরা সৃষ্টি করি না। প্রত্যেক ধ্বনির বা শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে; আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি জড়িত।

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্। তাঁকেই ধ্যান কর। আমরা জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমাদের স্বরূপই যে তিনি। অশুভ দেখি বলেই অনর্থের সৃষ্টি আমরা নিজেরাই করি। আমরা ভিতরে যা, বাইরে তাই দেখি, কেন না জগৎটা আমাদের আয়নার মতো। এই ছোট দেহটা আমাদের

স্থষ্ট একখানি ছোট আয়না, প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বই হচ্ছে আমাদের শরীর। সর্বদা এই চিন্তা করতে হবে, তবেই বুঝতে পারবো—আমরা মরি না বা কাকেও আঘাত করতে পারি না, কারণ যাকে আঘাত ক'রব সেও যে আমিই। আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই; আমাদের কর্তব্য শুধু সকলকে ভালবেসে যাওয়া।

'এই বিশ্বজগৎ আমার শরীর; সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই; কারণ সবই যে বিশ্বের ভেতর।' বলো, 'আমি এই বিশ্বজগৎ'। অবশেষে বুঝতে পারি—যা কিছু কর্মব্যাপার, সবই আমাদের থেকে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

যদিও মনে হচ্ছে, আমরা ছোট তরঙ্গের মতো, আমাদের সকলের পশ্চাতে এক অখণ্ড সমুদ্র, এবং আমরা সকলেই তার সঙ্গে মিলিত। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ একা থাকতে পারে না।

ঠিকভাবে নিয়োজিত হ'লে কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। কল্পনা যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, এবং একমাত্র কল্পনার আলোই আমাদের সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে।

প্রেরণা আমাদের ভেতর থেকে ওঠে, তাই নিজ নিজ উচ্চতর শক্তি দ্বারা আমাদের নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

পঞ্চম পাঠ

প্রত্যাহার ও ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে যে-পথ দিয়েই সন্ধান করুক, সকলেই আমার কাছে পৌঁছবে'—'সকলেই আমার কাছে পৌঁছবে।'[১] প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈপ্সিত বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ—মনকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর নজর রাখা এবং দেখা—মন কি ভাবে। যখনই কোন চিন্তার উপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি সে চিন্তা বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তাগুলিকে জোর ক'রে বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রো না,

---

১ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—গীতা, ৪।১১

কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। মন তো আর আত্মা নয়, মন হচ্ছে জড়ের একটু সূক্ষ্ম অবস্থামাত্র। স্নায়ুশক্তি দিয়ে একে আয়ত্ত ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনকে কাজে লাগানোর উপায় শিখে নিতে পারি।

দেহ হচ্ছে মনের (ব্যক্তিভাবের) বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা আত্মা, দেহ-মনের অতীত; আমরা অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। দেহটা চিন্তারই ঘনীভূত রূপ।

যখন বাম নাসা দিয়ে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন দক্ষিণ নাসা দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নাসা দিয়েই পড়বে তখন ধ্যানের সময়। যখন দেহ-মন শান্ত হয়ে আসবে আর দুই নাসা দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। প্রথমেই জোর ক'রে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ নেই। চিন্তার নিয়ন্ত্রণ আপনিই হবে।

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাস করবার পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঐরকম করা যেতে পারে।

প্রাণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার। যেসব সাধক ইষ্টমন্ত্র পেয়েছে, তারা রেচক ও পূরকের সময় 'ওঁ'কারের পরিবর্তে ইষ্টমন্ত্র এবং কুম্ভকের সময় 'হুঁ' মন্ত্র জপ করবে।

কুম্ভকের সময় যখন 'হুঁ' মন্ত্র জপ করবে, তখন মনে মনে কল্পনা করবে, সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃ পুনঃ কুণ্ডলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তার দ্বারা তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন। শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে কর। ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমরা বুঝতে পারবো যে, চিন্তাগুলি আসছে; কি ক'রে চিন্তাগুলি উঠছে আর আমরা কি-ই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাও বুঝতে পারবো। জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন আমরা তাকিয়ে দেখতে পাই যে, একটা লোক আসছে, এও অনেকটা তেমনি। যখন আমরা মন থেকে আত্মাকে পৃথক্ করতে পারবো, যখন আমরা বুঝতে পারবো যে, আমরা ও আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তখনই আমরা ঐ অবস্থায় পৌঁছেছি। চিন্তাগুলি যেন তোমাকে পেয়ে না বসে; সর্বদা তাদের পাশ কাটাবে, তা হলেই তারা আপনি বিলীন হয়ে যাবে।

সৎ চিন্তাগুলি অনুসরণ কর; তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও। যখন তারা স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্বশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীচরণ দেখতে পাবে। এই হচ্ছে অতিচেতন অবস্থা। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তার অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও।

দ্যুতি হচ্ছে অন্তর্জ্যোতির প্রতীক, যোগী তা দেখতে পান। কখন কখন এমন একখানি মুখ আমরা দেখতে পাই, তা যেন জ্যোতি দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে আমরা চরিত্র পাঠ ক'রে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভাবচক্ষে হয়তো ইষ্টমূর্তি আমাদের সামনে আসতে পারেন, সহজেই তাঁকে প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে আমরা মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করতে পারি।

যদিও আমরা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কল্পনা করতে পারি, তথাপি চোখ দিয়েই বেশীর ভাগ কল্পনা করি। এমন কি, কল্পনা পর্যন্ত অর্ধেক জড়। আর এক ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, মানসিক চিত্র ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। পশুরা চিন্তা করে ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তাদের যখন ভাষা নেই, তখন মনে হয়—ভাব ও প্রতীকের মধ্যে কোন বিশেষ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই।

যোগের সময় কল্পনাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, তা যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট্য আছে; তোমার পক্ষে যে পথ খুব স্বাভাবিক, তাই অনুসরণ কর; সেটাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে সোজা হবে।

পূর্ব পূর্ব সব জন্মের কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন। বৌদ্ধেরা বলেন, 'এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ জ্বলে ওঠে।' প্রদীপ আলাদা, কিন্তু আলো সেই একই।

সর্বদা প্রফুল্ল ও সাহসী থাকবে, রোজ স্নান করবে; ধৈর্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়—এই সব থাকলে তবে ঠিক ঠিক যোগী হ'তে পারবে। কখনও তাড়াতাড়ি ক'রো না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে ওগুলি বিপথ; তারা যেন তোমায় লুব্ধ ক'রে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য—ভগবান্, তাঁকেই ধ'রে থাকবে। কেবল সেই চিরন্তনকে খোঁজ, যাঁর সন্ধান পেলে আমাদের

চিরবিশ্রাম লাভ হয়। পূর্ণত্ব লাভ করবার পর আর কিছুই কাম্য থাকে না, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে; তখন আমরা চিরমুক্ত—সত্তাস্বরূপ।

সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

ষষ্ঠ পাঠ

সবিকল্প ও সুষুম্না। সুষুম্নার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন। ভাব-চক্ষে কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পারো, এইটিই সব চেয়ে ভাল উপায়। ঐভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তার ধ্যান করবে। সুষুম্না একটি অতি সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ময়, সূত্রাকার, প্রাণময় পথ—মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, মুক্তির এই পথ দিয়েই কুণ্ডলিনীকে ওপরে তুলতে হবে।

যোগীর ভাষায় সুষুম্নার দুটি প্রান্ত দুটি পদ্মে; নীচের পদ্মটি কুণ্ডলিনীর ত্রিকোণকে ঘিরে আছে, আর উপরের পদ্মটি—ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার ঘিরে আছে। এ-দুটির মাঝখানে আরও পাঁচটি[১] পদ্ম আছে।

উপরের দিক থেকে নিম্নের স্তর বা অবস্থাগুলি, চক্র বা পদ্মের নাম:

সপ্তম—সহস্রার—মস্তকে

ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে।

পঞ্চম—বিশুদ্ধ—কণ্ঠে।

চতুর্থ—অনাহত—বক্ষে বা হৃদয়ে।

তৃতীয়—মণিপুর—নাভিদেশে।

দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান—উদর-নিম্নে।[২]

প্রথম—মূলাধার—মেরুদণ্ডের নিম্নে।

প্রথমে কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হবে, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ ক'রে ওপরে তুলতে হবে, যে-পর্যন্ত না মস্তিষ্কে পৌঁছানো যায়। প্রত্যেক অবস্থা বা ভূমি হচ্ছে মনের নতুন নতুন স্তর।

১ ইংরেজীতে আছে: 'four other lotuses'

২ ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্র ধরা হইয়াছে।

রাজযোগ

(অথবা অন্তঃপ্রকৃতি-জয়)

আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

ओं तत् सत्

ভূমিকা

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে মনুষ্যসমাজে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান কালেও যে-সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী মানুষের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাগুলি অনুকরণমাত্র। কিন্তু ঐগুলি কিসের অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নয়। যাহারা ভাসাভাসা বৈজ্ঞানিক, তাহারা মনোরাজ্যের নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে-সকল ব্যক্তির বিশ্বাস—মেঘলোকের ঊর্ধ্বে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাগণ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী। কারণ শেষোক্তেরা বরং অজ্ঞতা বা বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিতে পারে, এই শিক্ষা তাহাদিগকে এইরূপ দেবতাদের উপর নির্ভর করিতে শিখাইয়াছে, এই নির্ভরতা এখন তাহাদের অবনত স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াছে এবং পরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি মানুষের ধর্ম-প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগরূপ বিজ্ঞান। যে-সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা দুরূহ, কতকগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অমার্জনীয় ধারা অবলম্বন করিয়া রাজযোগ সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, বরং ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা,

প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি—এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এ-সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়—এইরূপ কুসংস্কার-পূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহা আরও শিক্ষা দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, তেমনি মানুষের ভিতরেই ঐ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে; যখন যেখানে কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতেই এই সব প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়। অপ্রাকৃত পুরুষের ধারণা মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে জাগ্রত করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে। ইহার ফলে স্বাধীনতা চলিয়া যায়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, ঐভাব শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যে,—মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল। যোগী বলেন, অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্মকে সেরূপ করা যায় না। রাজযোগ অভ্যাস করিলে সূক্ষ্মতর অনুভূতি অর্জিত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে যত বেদানুগ দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহাদের সকলেরই এক লক্ষ্য—পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার উপায় যোগ। 'যোগ' শব্দ বহুব্যাপক। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন-না-কোন আকারে যোগের সমর্থন করে।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় 'রাজযোগ' নামে পরিচিত যোগ। রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ 'পাতঞ্জলসূত্র'। কোন কোন দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ সকলেই কার্যক্ষেত্রে একবাক্যে তাঁহার সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউ ইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যে-সকল বক্তৃতা দেন, সেইগুলি গ্রথিত হইল। দ্বিতীয়াংশে পতঞ্জলির সূত্রগুলির ভাবানুবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যতদূর সাধ্য, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিবার ও

কথোপকথনের সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমাংশে সাধনার্থিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষা করিতে হইলে গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকা আবশ্যক। যদি কথাবার্তার ছলে প্রদত্ত এই-সকল উপদেশ লোকের মনে এই-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব হইবে না।)

পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই দুই মতে প্রভেদ অতি সামান্য। দুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এই: প্রথমতঃ পতঞ্জলি আদিগুরুস্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যেরা কেবল প্রায়-পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি—যাঁহার উপর সাময়িকভাবে কোন কল্পে জগতের শাসনভার প্রদত্ত হয়, এইরূপ অর্থাৎ জন্য-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যোগীরা মনকে আত্মা বা 'পুরুষে'র ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সাংখ্যেরা তাহা করেন না।

গ্রন্থকার

অবতরণিকা

আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আনুমানিক জ্ঞান, যেখানে সামান্য (general) হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ (particular) জ্ঞানে উপনীত হই, তাহারও ভিত্তি—অভিজ্ঞতা। যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান[1] বলে, সেগুলির সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে, কারণ ঐগুলি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা স্পর্শ করে। বৈজ্ঞানিক তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না, তিনি নিজে কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; যখন তিনি আমাদিগকে তাঁহার সেই সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি কোন এক সর্বজনীন অনুভূতির নিকটই আবেদন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক নিশ্চিত-বিজ্ঞানেরই (exact science) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহা হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ ঠিক না ভুল, তাহা আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই—ধর্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কি না? ইহার উত্তরে আমাকে 'হাঁ' এবং 'না'—দুই-ই বলিতে হইবে।

পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়—ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; একজন বলিলেন, মেঘের উপরে এক মহান্ পুরুষ বসিয়া আছেন, তিনিই সমগ্র জগৎ শাসন করিতেছেন; বক্তা আমাকে তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই উহা বিশ্বাস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে, আমি অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাঁহারা কোন যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ

---

১ Exact Science—নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে-সব বিজ্ঞানের তত্ত্ব এতদূর সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়। যথা—গণিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি।

যুক্তি দেখাইতে পারি না। এইজন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, 'এই সব ধর্ম তো দেখছি কতকগুলো মত মাত্র, এগুলোর সত্যাসত্য বিচারের কোন মানদণ্ড নেই, যার যা খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত।' এ-সব সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে—উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণাসমূহের নিয়ামক। ঐগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলির শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে, কতকগুলির তাহা নাই। যেগুলি শাস্ত্রের উপর স্থাপিত, সেগুলি সুদৃঢ়; উহাদের অনুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্মসকল প্রায়ই লুপ্ত, কতকগুলি নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু খুব কম লোকই ঐগুলির অনুগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই মতের এই ঐক্য দেখা যায় যে, উহাদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। খ্রীষ্টান তাঁহার ধর্মে, যীশুখ্রীষ্টে ও তাঁহার অবতারত্বে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে এবং আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলিবেন—'ইহা আমার বিশ্বাস।' কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্ট-ধর্মের মূল উৎসে গমন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর স্থাপিত। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।' তাঁহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন, 'আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।' এইরূপ আরও অনেকের কথা শুনা যায়।

বৌদ্ধধর্মেও এইরূপ; বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষানুভূতির উপর এই ধর্ম স্থাপিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, সেই-সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋষি-নামধেয় গ্রন্থকর্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি।' তাঁহারা সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল

যে, জগতে সকল ধর্মই জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি—প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন; সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন—অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধর্মেই—বিশেষতঃ ইদানীং—একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা এই: বর্তমানে এই-সকল অনুভূতি অসম্ভব। যাঁহারা ধর্মের প্রথম স্থাপয়িতা, পরে যাঁহাদের নামে সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, শুধু এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব ছিল। আজকাল আর এরূপ অনুভূতি কাহারও হয় না, অতএব ধর্ম এখন বিশ্বাস করিয়াই লইতে হইবে—এ-কথা আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেহ কখন একটি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেও কোটি কোটি বার ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, পরেও অনন্তকাল ধরিয়া বার বার ঐরূপ সম্ভাবনা থাকিবে। একরূপতাই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম; একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে।

যোগ-বিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, 'ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই-সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এই-সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'যোগ'।' ধর্ম যতদিন না অনুভূত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথা বলাই বৃথা। ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদানুবাদ কেন? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মের মূল উৎসে যায় নাই। সকলেই পূর্বপুরুষগণের কতকগুলি আচার অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা চাহিত, অপরেও তাই করুক। আত্মা অনুভূতি না করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর দর্শন না করিয়া 'ঈশ্বর আছেন' বলিবার কি অধিকার মানুষের আছে? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আজকালকার 'বিদ্বান্' বলিয়া পরিচিত

ব্যক্তিদের মনোভাব এই যে, ধর্ম, দর্শন ও পরমপুরুষের অনুসন্ধান—সবই নিষ্ফল। অপর দিকে যাঁহারা অর্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই, তবে ঐগুলির এই মাত্র উপযোগিতা যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-সাধনের বলিষ্ঠ প্রেরণাশক্তি—যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না; কারণ তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা পায়, তাহা অসংলগ্ন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ-বাক্যের মতো অনন্ত শব্দসমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বলা হয়। তাহারা কি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে মানব-প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত্য অনুভব করিতে চায়; সত্যকে ধারণা করিতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিতে, অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে চায়। 'কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলিয়া যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সকল বক্রতা সরল হইয়া যায়'।[১] বেদ এইরূপ ঘোষণা করেন—

'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, শ্রবণ কর—আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমসার পারে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সেখানে যাওয়া যায়—মুক্তির আর কোন উপায় নাই।'[২]

রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ-প্রণালী আছে। তুমি যদি জ্যোতির্বিদ্ হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল 'জ্যোতিষ জ্যোতিষ' বলিয়া চীৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইবে না। রসায়ন-

---

১ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডক উপ. ২।২।৮

২ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ শ্বেঃ উঃ, ২।৫
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেঃ উঃ, ৩।৮

শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (laboratory) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, ঐগুলি মিশাইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে ঐগুলি লইয়া পরীক্ষা করিলে তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্বিৎ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়া দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে তুমি জ্যোতির্বিৎ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাকা উচিত। আমি তোমাদিগকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্মিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধ-স্বভাব জ্ঞানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের হিতসাধন ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কামনা ছিল না। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে যে সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি।' তাঁহারা সকলকে সেই সত্য পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহারা আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া আন্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাবে সাধনা করিয়া যদি আমরা এই উচ্চতর সত্য লাভ না করি, তখন আমরা বলিতে পারি, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ নয়। কিন্তু তাহার পূর্বে এই-সকল উক্তির সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া নিষ্ঠাপূর্বক সাধন করিতে হইবে, আলোক নিশ্চয়ই আসিবে।

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্যীকরণের সাহায্য লইয়া থাকি; সামান্যীকরণ আবার পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে আমরা ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করি, শেষে তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মূলনীতি উদ্ভাবন করি। যতক্ষণ না মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততক্ষণ আমরা মন সম্বন্ধে, মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্য জগতের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ঐ উদ্দেশ্যে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিতে সাহায্য করে, এমন কোন যন্ত্র

আমাদের নাই। তথাপি আমরা নিশ্চয় জানি যে, কোন বিদ্যাকে প্রকৃত বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া ভিত্তিহীন অনুমানমাত্রে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনোবিৎ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছেন মাত্র।

রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই ঐ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করিয়া অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলেই উহা মনকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে, এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব, আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, মনের শক্তিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিসদৃশ। উহারা কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলোকিত করে, ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জগতে সকলেই এই শক্তি ব্যবহার করিতেছে; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিৎকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাস প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে আমরা কেবল বাহিরের বস্তুতেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, অন্তর্জগতের বস্তুতে নয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্তর্যন্ত্রের পর্যবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। মনকে অন্তর্মুখ করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা—যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য। কিন্তু এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায়।

এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার। দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাও আছে; ইহা সমস্ত দুঃখ দূর করিবে। যখন মানুষ নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, যাহার কোন কালে নাশ নাই—যাহা স্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ, তখন আর তাহার দুঃখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে

না। ভয় ও অপূর্ণ বাসনাই সকল দুঃখের কারণ। পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ করিলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে অসার বাসনা আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণদ্বয়ের অভাব হইলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না—পরিবর্তে এই দেহেই পরমানন্দ লব্ধ হইবে।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়নবিৎ নিজের পরীক্ষাগারে মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া—যে-সকল বস্তু তিনি বিশ্লেষণ করিতেছেন, সেগুলির উপর প্রয়োগ করেন, এইরূপে ঐসকলের রহস্য অবগত হন। জ্যোতির্বিৎ নিজের মনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাহা আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র—সকলেই নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে-বিষয়ে এখন তোমাদের নিকট বলিতেছি, সে-বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারিব। তোমরা আমার কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ-বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে।

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই-সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে—কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ইহাই রহস্য।

মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহির্মুখ; ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনবিষয়ে মন স্থির করা সহজ নয়, কারণ এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে জ্ঞানের বিষয় একটি আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে জ্ঞানের বিষয়। মনকে পর্যবেক্ষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। আমরা জানি, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বারা উহা নিজের ভিতরটি দেখিতে পারে—উহাকে অন্তঃপর্যবেক্ষণশক্তি বলা হয়। আমি তোমাদের সহিত কথা কহিতেছি; আবার ঐ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক—

বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি, তাহা জানিতেছি ও শুনিতেছি। একই সময়ে তুমি কাজ করিতেছ ও চিন্তা করিতেছ, আবার তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—তুমি কি চিন্তা করিতেছ। মনের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব, ইহাই প্রকৃত ধর্ম। তখনই আমরা অনুভব করিব—আত্মা আছে কি না, জীবন ক্ষণস্থায়ী না অনন্তকালব্যাপী, বুঝিব—জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না। সবই আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবে। রাজযোগ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজযোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য—কি ভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কি ভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কার করা যায়, শেষে মনের ভিতরের ভাবগুলি হইতে কিভাবে একটা সাধারণ ভাবে আসা যায় এবং তাহা হইতে নিজের একটা সিদ্ধান্ত করা যায়। এইজন্যই রাজযোগ জিজ্ঞাসা করে না, 'তোমার ধর্ম কি?'—তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা মানুষ—ইহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তরও পাইতে পারে। তবে এজন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

তাহা হইলে এ-পর্যন্ত দেখিলাম, এই রাজযোগের আলোচনায় কোন প্রকার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছ, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না—রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। তোমরা কি বলিতে চাও যে, জাগ্রত অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার সাহায্য আবশ্যক? কখনই নয়। এই রাজযোগ-সাধনে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন। এই অভ্যাসের কিছু অংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। ক্রমশঃ আমরা বুঝিতে

পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি, মন শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ, আর মন শরীরের উপর কার্য করে, তাহা হইলে ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ এবং সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মন উত্তেজিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের মন অতি অল্প-বিকশিত। তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তবে বলি—অধিকাংশ মানুষ পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। শুধু তাই নয়, অনেক স্থলে ইতর প্রাণী অপেক্ষা তাহাদের সংযম-শক্তি বড় বেশী নয়। মনের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই নাই। মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জন্য, শরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের—দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপে মনকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে পারিব, ইচ্ছামত উহাকে দিয়া কাজ করাইতে পারিব, এবং মনের শক্তিগুলি একাগ্র করিতে পারিব।

রাজযোগীদের মতে বহির্জগৎ অন্তর্জগতের বা সূক্ষ্মজগতের স্থূল রূপ মাত্র। সর্বত্রই সূক্ষ্ম কারণ ও স্থূল কার্য। অতএব এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। অনুরূপভাবে বহির্জগতের শক্তিগুলি আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূলভাগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি আবিষ্কার করিয়া ইচ্ছামত উহাদিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করার—প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে 'প্রকৃতির নিয়মাবলী' বলি, সেগুলি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি ঐ-সব অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি আন্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিবেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ—শুধু এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন একই সমাজের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্যপ্রকৃতি, আবার কেহ অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চায়; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্যপ্রকৃতি, কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সব বশীভূত করা হয়; কাহারও মতে বাহ্যপ্রকৃতি বশীভূত করিলে সবই বশীভূত করা হয়। এই দুইটি চিন্তাধারার শেষ পর্যন্ত যাইলে বুঝা যায়, উভয়ের সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ প্রকৃতিতে বাহ্য বা আন্তর বলিয়া কোন ভেদ নাই, ইহা কাল্পনিক বিভাগ মাত্র; এইরূপ বিভাগের অস্তিত্ব কখনও ছিল না। বহির্বাদী বা অন্তর্বাদী যখন নিজ নিজ জ্ঞানের চরম সীমায় পৌছিবেন, তখন উভয়ে একই স্থানে উপনীত হইবেন। ঠিক যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া গেলে দেখিতে পান—বিজ্ঞান দর্শনে মিশিয়া যাইতেছে, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, যেগুলিকে তিনি মন ও জড় বলিতেছেন, সেগুলি আপাতপ্রতীয়মান ভেদমাত্র—প্রকৃতপক্ষে সত্তা একই।

যাহা হইতে এই 'বহু' উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রাজযোগীরা বলেন, 'আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রকৃতিকেই বশীভূত করিব।' প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয়ে কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা ভাবিত, যাহারা ইহা অভ্যাস করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ডাইনী, যাদুকর ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথবা অন্যরূপে মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া বাকী অংশটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জানেন না।

এই-সব যোগ-প্রণালীতে গুহ্য ও অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, তাহা বর্জন করিতে হইবে। যাহা কিছু বলপ্রদ, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন ধর্মেও তেমনি—যাহা কিছু তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাগ কর। রহস্যস্পৃহাই মানব-মস্তিষ্ক দুর্বল করিয়া ফেলে। ইহারই জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান যোগশাস্ত্র প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চার হাজার বছরেরও আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। আশ্চর্য এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও সেই পরিমাণে তত অধিক। লেখক যত প্রাচীন, তাঁহার লেখা ততই অধিক যুক্তিসঙ্গত। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নানাপ্রকার রহস্যের কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপে যোগ অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়া পড়িল, তাহারা ইহাকে গোপনীয় বিদ্যা করিয়া তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রকাশ্য দিবালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল না।

প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহার ভিতর গোপনীয় কিছুই নাই। সামান্য যাহা কিছু আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। যুক্তি দ্বারা ইহা যতদূর বুঝানো যায়, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষভাবে জানি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলে, শুধু তাহাই বলিব। অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি খাটাইতে হইবে; সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কি-না। অন্যান্য বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন রহস্য কিছু নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই; ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, সেটুকু সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা উচিত। এ-সকল সাধনা রহস্যাবৃত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলে অনেক বিপদ হইতে পারে।

আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব; এই সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর রাজযোগ-বিদ্যা স্থাপিত। সাংখ্যদর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞান এইভাবে হয়: প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট উহা প্রেরণ করে; বাহিরের শব্দ-রূপ প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাব বহিরিন্দ্রিয়ের যন্ত্রসাহায্যে নিজ নিজ মস্তিষ্ককেন্দ্রে বা প্রকৃত

ইন্দ্রিয়ে নীত হয়, ইন্দ্রিয়গণ মনের নিকট ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন এবং বিষয়ের অনুভূতি হয়। অতঃপর ঐগুলি যে-পথে আসিয়াছিল, পুরুষ সেই পথেই ঐগুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়, তবে চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা মন সূক্ষ্মতর। মন যে উপাদানে নির্মিত, তাহা সূক্ষ্ম তন্মাত্রাও উৎপন্ন করে। ঐগুলি স্থূল হইলে জড়বস্তুর উৎপত্তি হয়। ইহাই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান। সুতরাং বুদ্ধি ও স্থূলভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্তনশীল, সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, সিদ্ধ অবস্থায় মন কখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিতে লগ্ন, কখন বা একটিতে, আবার কখন বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মন যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, তখন দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। কিন্তু সিদ্ধপুরুষের মন একই সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ দেখিতে পারে। এই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদয় শক্তিকে একাগ্র করিয়া, ভিতরের দিকে ফিরাইয়া ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি জানিতে চান। ইহাতে নিছক বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রকৃত দর্শনের ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, উহা মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদয় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্মিত এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত। সাংখ্যেরাও এই কথাই বলিয়া থাকেন; তবে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া, আর বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা হইলেও উভয়ের কথা এক। আমাদের গবেষণার রাজ্য ইহাকে অতিক্রম করিয়া।

যোগী এমন সূক্ষ্মানুভূতির অবস্থা লাভ করিতে চান, যাহাতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঐগুলির মানস অনুভূতি

অবশ্যই সম্ভব। বিষয়সমূহ কর্তৃক বহিরিন্দ্রিয়ে উৎপন্ন বেদনা কিরূপে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়—এই সমুদয় ব্যাপারগুলি অনুভব করা যায়। সকল বিদ্যা শিক্ষারই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিছু প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, উহার নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, তবে উক্ত বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবে; রাজযোগ সম্বন্ধেও সেইরূপ।

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক। যাহাতে মন খুব পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। কোন পশুশালার ভিতরে গিয়া দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারা যায়, আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ। হস্তী অতি বৃহদাকার জন্তু, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর সিংহ বা বাঘের খাঁচার দিকে গিয়া দেখিবে—তাহারা অস্থির, চঞ্চল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সবগুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, প্রথমতঃ তোমার শরীর দুর্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলি হ্রাস পাইবে, কয়েকদিন পরে মানসিক শক্তিগুলিও হ্রাস পাইতে থাকিবে। তারপর স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না, যুক্তিবিচার করা তো দূরের কথা। সেইজন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে যখন আমাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যখন আমরা সাধনায় বেশ অগ্রসর হইয়াছি, তখন ঐ বিষয়ে আর তত সাবধানতার প্রয়োজন নাই। চারা গাছ যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, পাছে কেহ উহার ক্ষতি করে; গাছ বড় হইয়া গেলে বেড়া সরাইয়া লইতে হয়, তখন সমুদয় আক্রমণ অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি উহার হইয়াছে।

যোগী অধিক বিলাস ও কঠোরতা—দুই-ই পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অত্যধিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি নিজেকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন

না। অতিভোজনকারী, একান্ত উপবাসী, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্মপরায়ণ, অথবা একেবারে নিষ্কর্মা—ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।[১]

১ নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।—গীতা, ৬।১৬-১৭

সাধনার প্রথম সোপান

রাজযোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত। ১ম—যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। ২য়—নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। ৩য়—আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী। ৪র্থ—প্রাণায়াম। ৫ম—প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়া উহাকে অন্তর্মুখী করা। ৬ষ্ঠ—ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। ৭ম—ধ্যান। ৮ম—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন; ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাঁহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এগুলির অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে কাহারও প্রতি কখনও অনিষ্টভাব পোষণ করিবেন না। করুণার ভাব কেবল মনুষ্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়া সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে।

পরবর্তী সোপান 'আসন'। যতদিন না কিছুটা উচ্চ অবস্থা লাভ হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া পর পর অভ্যাস করিতে হয়। অতএব দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, এমন একটি আসন অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহার যে আসনে বসিলে সুবিধা হয়, তিনি সেই আসন বাছিয়া লইবেন। একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে হয়তো সেভাবে বসা কঠিন বোধ হইবে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকার কার্য চলিতে থাকিবে। স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলির গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে নূতন প্রকারের স্পন্দন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে; সমগ্র শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; সুতরাং আসন সম্বন্ধে

এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্যক—ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে, আর বক্ষ গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে—দেহের সমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির উপর পড়ে। বক্ষদেশ কুঞ্চিত থাকিলে কোনরূপ উচ্চতর চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাহা সহজেই দেখিতে পাইবে।

রাজযোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত কিছুটা মিলে। হঠযোগ কেবল স্থূলদেহ লইয়াই ব্যস্ত, ইহার উদ্দেশ্য কেবল স্থূলদেহকে সবল করা। হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি অতি কঠিন। উহা একদিনে শিক্ষা করা যায় না। আর উহা দ্বারা শেষ পর্যন্ত বেশী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। এই-সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই ডেলসার্ট ও অন্যান্য ব্যায়ামাচার্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি দ্বারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে স্থির রাখা যায়। এগুলিরও উদ্দেশ্য—দৈহিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক নয়। শরীরে এমন কোন পেশী নাই, যাহা মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না; হৃদ্‌যন্ত্র তাঁহার আদেশে রুদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে, শরীরের প্রত্যেক অংশই ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।

মানুষকে দীর্ঘজীবী করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যই মুখ্য ভাব, ইহাই হঠযোগীদের একমাত্র লক্ষ্য। 'আমার যেন পীড়া না হয়'—ইহাই হঠযোগীর দৃঢ়সঙ্কল্প; তাঁহার পীড়া হয়ও না; তিনি দীর্ঘজীবী হন; শতবর্ষ জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে কিছুই নয়। দেড়শত বৎসর বয়সেও তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ থাকেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় না; কিন্তু এই পর্যন্তই। বটবৃক্ষও কখন কখন পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা বটবৃক্ষই থাকিয়া যায়, তার বেশী কিছু নয়। দীর্ঘজীবী মানুষ একটি সুস্থকায় প্রাণী, এইমাত্র।

হঠযোগীদের দুই-একটি সাধারণ উপদেশ খুব উপকারী। শিরঃপীড়া হইলে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া শীতল জল পান করিবে, তাহা হইলে সারা দিনই তোমার মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার ও শীতল থাকিবে, তোমার কখনই সর্দি লাগিবে না। নাসিকা দিয়া জল পান করা কিছু কঠিন নয়, অতি সহজ। নাসিকা জলের ভিতর ডুবাইয়া নাসা দিয়া জল টানিতে থাকো, গলার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জল আপনা-আপনি ভিতরে যাইবে।

আসন সিদ্ধ হইলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। রাজযোগের অন্তর্গত নয় বলিয়া অনেকে ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমি মনে করি, ইহা উল্লেখ করা উচিত। আমি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ-বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব[১]—'প্রাণায়াম দ্বারা যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করিবার শক্তি আসে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া বাম নাসা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারি বার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ী-শুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণায়ামে অধিকার হইবে।'[১]

অভ্যাস একান্তই আবশ্যক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার কথা শুনিতে পারো, কিন্তু অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে পারিবে না। সবই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষানুভূতি না হইলে এ-সকল তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেক বিঘ্ন আছে। প্রথম বিঘ্ন ব্যাধিগ্রস্ত দেহ—শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্যই শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। কিরূপ পানাহার করি, কাজকর্ম করি, এ-সকল বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। শরীর সবল রাখিবার জন্য সর্বদা মনের শক্তি প্রয়োগ কর—'কৃশ্চান সায়েন্স' (Christian

১ প্রাণায়াম-ক্ষপিত-মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তব্যম্। ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণ-নাসিকাপুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েৎ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎসৃজ্যৈবং দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেৎ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যস্যতঃ সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে পূর্বরাত্রেঽর্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্বিশুদ্ধির্ভবতি।—শাঙ্করভাষ্য, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২।৮

Science)[1] মতাবলম্বীরা সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া থাকে। ব্যস্, শরীরের জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র—ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য হইত, তবে তো আমরা পশুতুল্য হইতাম। পশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না।

দ্বিতীয় বিঘ্ন—সন্দেহ। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, সে-সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; এই কারণে যোগশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও মাঝে মাঝে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই সাধনবিষয়ে উৎসাহ বর্ধিত হয়। যোগশাস্ত্রের অনেক টীকাকার বলিয়াছেন, 'যোগ-শাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি একটি অতি সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাতেই সমগ্র যোগশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হইবে।' উদাহরণস্বরূপ কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়তো তাহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ-সকল ব্যাপার অতি অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। উদাহরণস্বরূপ যদি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম কর, তবে অল্প দিনের মধ্যেই দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে; তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই-সকল সিদ্ধির স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, এগুলি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের সহায়-মাত্র। আমাদিগকে

---

১ Christian Science—এই সম্প্রদায় মিসেস এডি (Mrs. Eddy) নামক এক আমেরিকান মহিলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার মতে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহা কেবল আমাদের মনের ভ্রমমাত্র। বিশ্বাস করিতে হইবে—আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইব। ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই যে, এই মতাবলম্বীরা বলেন, 'আমরা খ্রীষ্টের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি। খ্রীষ্ট যে-সকল অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে সমর্থ এবং সর্বপ্রকার দোষশূন্য জীবনযাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য।'

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তি। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা ছোট কোন আদর্শ আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রকৃতির ক্রীতদাস হইব না। শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে; আর ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে—শরীর আমার, আমি শরীরের নই।

এক দেবতা ও অসুর আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া এক জ্ঞানীর (ব্রহ্মার)[১] নিকট গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, তোমরাই সেই পুরুষ।' তাহারা ভাবিল, তবে দেহই 'আত্মা'। তখন তাহারা উভয়েই 'আমাদের যাহা পাইবার, তাহা পাইয়াছি' মনে করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'যাহা শিক্ষা করিবার তাহা সবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এখন চল, পান ভোজন করি ও আনন্দে মত্ত হই—আমরাই সেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই।' অসুরের স্বভাব অজ্ঞানমেঘে আবৃত ছিল, সুতরাং সে আর এ-বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। নিজেকে আত্মা বা ঈশ্বর ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইল; 'আত্মা' বলিতে সে দেহই বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, 'আমি' অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখো, সুন্দর বসনভূষণে সাজাও, সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ কর। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাঁহার প্রতীতি হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ এরূপ নয়, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, আপনার শিক্ষার তাৎপর্য কি এই যে, শরীরই আত্মা?—কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? দেখিতেছি, শরীরমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আত্মা তো মরিতে পারে না।' আচার্য বলিলেন, 'তুমি নিজে ইহার অর্থ উপলব্ধি কর; তুমিই সেই আত্মা।'

---

১ ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ—ছান্দোগ্য উপ., (৮।৭।১৫) দ্রষ্টব্য।

তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন?' গুরু বলিলেন, 'স্বয়ং ইহার অর্থ নির্ণয় কর, তুমিই সেই।' সেই দেবতা ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তবে মনই 'আত্মা' হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার কখন বা অসদ্‌বৃত্তি উঠিতেছে; মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমার তো মনে হয় না—মনই আত্মা; আপনি কি ইহাই উপদেশ দিয়াছেন?' গুরু বলিলেন, 'না, তুমিই তাহা। তুমি নিজে উহা খুঁজিয়া বাহির কর।' দেবতা ফিরিয়া গেলেন; অবশেষে তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইল: 'আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা; আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না; আমি অনাদি, অনন্ত, অচল, অস্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষ। আত্মা শরীর বা মন নয়; আত্মা এ সকলেরই অতীত।' এইরূপে সেই দেবতার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু অসুর-বেচারার সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল।

এই জগতে অনেক অসুরপ্রকৃতির লোক আছে; কিন্তু দেবতা যে একেবারেই নাই, তাহাও নয়। যদি কেহ বলে, 'এস, তোমাদিগকে এমন এক বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয়সুখ অনন্তগুণে বর্ধিত হইবে,' তাহা হইলে অগণিত লোক তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ বলেন, 'এস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয় শিখাইব,' তবে তাঁহার শ্রোতাই জুটিবে না। উচ্চ তত্ত্ব শুধু ধারণা করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; সত্যলাভ করিবার জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা তো আরও বিরল। কিন্তু সংসারে আবার এমন কিছু লোক আছেন, যাঁহারা জানেন, শরীর হাজার বৎসর বাঁচাইয়া রাখা গেলেও চরমে সেই একই গতি। যে-সকল শক্তিতে দেহ বিধৃত রহিয়াছে,

সেগুলি অপসৃত হইলে দেহ থাকিবে না। এক মুহূর্তের জন্তও শরীরের পরিবর্তন নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। 'শরীর' আর কি? উহা কতকগুলি পরিবর্তনের পরম্পরা মাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। 'যেমন তোমার সম্মুখে নদীর জলরাশি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিন্তু দেখিতে ঠিক পূর্বের মতোই। এই শরীরও সেইরূপ।' তথাপি শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক, কারণ শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শরীরই আমাদের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমন কি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই। দেবতাদিগকেও আবার নামিয়া আসিতে হয় এবং মানবদেহের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ-বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসলমানদিগের মতে—দেবদূত ও অন্যান্য সব কিছু সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তারপর দেবদূতদের ডাকিয়া মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; ইব্লিশ ব্যতীত সকলেই প্রণাম করিয়াছিলেন, এই জন্য ঈশ্বর ইব্লিশকে অভিশাপ দিলেন; সে 'শয়তানে' পরিণত হইল। এই রূপকের আবরণে একটি মহৎ সত্য লুকাইয়া আছে, জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। পশ্বাদি নিম্নতর সৃষ্টি তমঃপ্রধান। পশুরা কোন উচ্চতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। দেবতারাও মনুষ্যজন্ম না লইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। এইরূপে মনুষ্যসমাজেও আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নয়, আবার একেবারে নিঃস্ব হইলেও উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই স্তরেই বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাক। আমাদিগকে এবার 'প্রাণায়াম' বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দেখা যাক, মনের শক্তিগুলি একাগ্র করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? শ্বাসপ্রশ্বাস যেন এই দেহ-যন্ত্রের গতি-নিয়ামক মূল-চক্র (fly-wheel)। একটি বড় এঞ্জিনে দেখিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি

ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে সেই এঞ্জিনের অতি সূক্ষ্মতম যন্ত্রগুলি পর্যন্ত গতিশীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সেই গতি-নিয়ামক মূল-চক্র, উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন প্রকার শক্তি আবশ্যক, তাহা যোগাইতেছে এবং ঐ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে।

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে সে রাজার অপ্রিয় পাত্র হওয়ায় রাজা তাঁহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের চূড়ায় একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল; মন্ত্রীও সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রতা ভার্যা ছিলেন, রজনীযোগে তিনি সেই দুর্গের সমীপে আসিয়া দুর্গশীর্ষস্থিত পতিকে বলিলেন, 'আমি কি উপায়ে আপনার সাহায্য করিতে পারি, বলিয়া দিন।' মন্ত্রী বলিলেন, 'আগামী কাল রাত্রে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, এক বাণ্ডিল সুতা, খানিকটা সূক্ষ্ম রেশমের সুতা, একটা গুবরে পোকা ও খানিকটা মধু আনিও।' তাঁহার সহধর্মিণী পতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক তিনি পতির আজ্ঞানুসারে প্রার্থিত দ্রব্যগুলি আনিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে রেশমের সূত্রটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহার শুঁড়ে একবিন্দু মধু মাখাইয়া, মাথাটি উপরের দিকে রাখিয়া উহাকে দুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় নির্দেশ পালন করিলেন। তখন সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর আঘ্রাণ পাইয়া মধু-লাভের আশায় সে ধীরে ধীরে দুর্গের শীর্ষদেশে উপনীত হইল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন, সেই সঙ্গে রেশমের সুতাটিও ধরিলেন, তারপর তাঁহার স্ত্রীকে রেশম-সূত্রের অপর প্রান্তে শক্ত সুতাটি জুড়িয়া দিতে বলিলেন। পরে শক্ত সুতা হস্তগত হইলে ঐ উপায়ে তিনি দড়ি ও অবশেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন। বাকী কাজ সহজ। ঐ রজ্জুর সাহায্যে মন্ত্রী দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যেন রেশম-সূত্রের মতো। উহাকে ধারণ বা সংযম করিতে পারিলেই স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ-রূপ (nervous currents) শক্ত সুতা, তারপর মনোবৃত্তিরূপ শক্ত দড়ি, পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পারা যায়। প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

আমরা নিজেদের শরীর-সম্বন্ধে কিছুই জানি না; কিছু জানিতে পারিও না। আমাদের সাধ্য এই পর্যন্ত যে, মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে, আমরা দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত প্রাণী লইয়া তাহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ নিজ শরীরের কোন সংস্রব নাই। আমরা নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। জানি না কেন? ইহার কারণ আমাদের মন এত সূক্ষ্ম নয় যে, আমাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে সব গতি রহিয়াছে, সেগুলি আমরা ধরিতে পারি। মন যখন আরও সূক্ষ্ম হইয়া যেন দেহের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখনই আমরা ঐ গতিগুলি জানিতে পারি। এইরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমগ্র শরীরযন্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহা প্রাণ; শ্বাস-প্রশ্বাসই ঐ প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব; জানিতে পারিব যে, স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলি কিভাবে শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আর যখনই আমরা ঐগুলি মনে মনে অনুভব করিতে পারিব, তখনই ঐগুলি এবং সেই সঙ্গে শরীরযন্ত্র আমাদের আয়ত্তে আসিতে থাকিবে। মনও এই-সকল স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, শেষ পর্যন্ত শরীর ও মন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে; উভয়েই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া যায়। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করিতে হইবে। সুতরাং শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ সর্বদা চলিতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং আমাদিগকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থাৎ 'প্রাণায়াম' বা প্রাণের সংযম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এই 'প্রাণায়াম' একটি দীর্ঘ বিষয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনার প্রয়োজন। আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচনা করিব।

আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যে-সকল ক্রিয়া করা হয়, সেগুলির হেতু কি, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় দেহের মধ্যে কি কি শক্তির প্রবাহ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ এ-সব আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু

ইহাতে নিরন্তর অভ্যাসের সাধন আবশ্যক। সাধন দ্বারাই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আমি এ-বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, এগুলি তোমাদের দ্বারা গৃহীত হইবে না, যতদিন না নিজেরা প্রত্যক্ষ করিবে। যে মুহূর্তে সারা দেহে এই-সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর অভ্যাস আবশ্যক। প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার অভ্যাস করিবে; আর ঐ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ন। যখন রজনীর অবসান হইয়া দিবার প্রকাশ হয়, এবং দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রত্যূষ ও গোধূলি, এই দুইটি প্রকৃতির শান্ত মুহূর্ত। এই দুই সময়ে শরীরও স্বভাবতঃ শান্ত হইতে চায়। এই দুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকটা সহায়তা করিবে, সুতরাং এই দুই সময়েই সাধন করা উচিত। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আলস্য দূর করিয়া দিবে। স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার করিবে না, ভারতবর্ষে বালকদের এইরূপ শিক্ষাই দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহাদের যতক্ষণ না স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ বালক ক্ষুধার্ত হয় না।

তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, সাধনের জন্য তাহারা একটি স্বতন্ত্র ঘর রাখিতে পারো তো ভাল হয়। এই ঘর শয়নের জন্য ব্যবহার করিও না, ইহা পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিও না। এ ঘরে সর্বদা পুষ্প রাখিবে; যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। সুন্দর চিত্রও রাখিতে পারো। প্রাতে ও সায়াহ্নে সেখানে ধূপ-ধুনা প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ বা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। ইহাই ছিল মন্দির

গির্জা প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তা সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে।

যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহারা যেখানে ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। সর্বপ্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দাও। মনে মনে বলো, 'জগতে সকলেই সুখী হউক; সকলেই শান্তি লাভ করুক; সকলেই আনন্দ লাভ করুক।'[1] এইরূপে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে পবিত্র চিন্তা প্রবাহিত কর। যতই এইরূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভাল বোধ করিবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপরে সুস্থ থাকুক, এই ভাবনাই স্বাস্থ্য-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউক—এইরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায়। তারপর যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন—অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নয়, জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা করিবেন। ইহা ব্যতীত আর সব প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তারপর ভাবিতে হইবে—আমার দেহ দৃঢ়, সবল ও সুস্থ। এই দেহই আমার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, শ্রেষ্ঠ সহায়। চিন্তা করিবে—ইহা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। চিন্তা কর, এই শরীরের সাহায্যে এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। দুর্বল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। শরীরকে বলো—তুমি বলিষ্ঠ। মনকে বলো—তুমি শক্তিধর; এবং নিজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরসা রাখো।

১ তুলনীয়: 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ ...সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।'

প্রাণ

অনেকে মনে করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ব্যাপার, বাস্তবিক তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি অল্পই। প্রকৃত প্রাণায়াম-সাধন করিতে হইলে অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সেগুলির একটি। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমগ্র জগৎ দুইটি উপাদানে নির্মিত। তাহাদের মধ্যে একটির নাম আকাশ। এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত সত্তা। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে-কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য, পৃথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীর শরীর—পশুশরীর, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যে-সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল বস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে-কোন বস্তু আছে, সে সকলই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন আকার ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে। আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থ—সব কিছুই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এইপ্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী উপাদান, প্রাণও সেইরূপ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী প্রকাশিকা শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সবই আকাশে পরিণত হয়, জগতের সব শক্তিই আবার প্রাণে লয় পায়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সব শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়ু-শক্তিপ্রবাহরূপে

(nerve-current), চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সব কিছুই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাদের সমষ্টিকেই 'প্রাণ' বলে। যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?[১] এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের গতি রুদ্ধ ছিল, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, ঐ শক্তিগুলি কল্পান্তে শান্ত ভাব ধারণ করে—অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর আঘাত করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে বিবিধ রূপ বিকশিত হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই প্রাণও নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা এবং উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের নিকট অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং উহাকে জয় করিতেও সক্ষম হইলেন, তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য-নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য পর্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ শক্তিলাভ করা প্রাণায়াম-সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; মৃতব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সব শক্তিই ক্রীতদাসের মতো তাঁহার আদেশ পালন করে। অজ্ঞ-লোকেরা যোগীর এই-সকল কার্যকলাপ দেখিয়া বলে, এগুলি অলৌকিক। হিন্দুদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যে-কোন তত্ত্ব আলোচনা করুক

---

১ নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্—ইত্যাদি।
তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতম্—ইত্যাদি। —ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম মণ্ডল.

না কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি রাখিয়া দেয় পরে মীমাংসার জন্য। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 'এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সবকিছু জানা যায়?'[১] এইরূপে আমাদের সব শাস্ত্র, সব দর্শন—যে-বস্তুকে জানিলে সবকিছু জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কেহ জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চায়, তাহা হইলে তো অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে এক এক কণা বালুকাকে পর্যন্ত পৃথক্ ভাবে জানিতে হইবে। তথাপি সে সবকিছু জানিতে পারে না। তবে কিভাবে জ্ঞানলাভ সম্ভব? এক একটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া মানুষের সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ ভাব রহিয়াছে। উহাকে ধরিতে পারিলেই সবকিছু আয়ত্ত করা যায়। এইভাবেই বেদে সমগ্র জগৎকে এক পূর্ণ সত্তায় পর্যবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'সৎ'-স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমগ্র জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। এইভাবেই সমুদয় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সাধারণ শক্তিতে পর্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতে যত কিছু মানসিক বা দৈহিক শক্তি আছে, সবকিছুকেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সবই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির মূল।

কিভাবে এই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধকই—যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই সাধন আরম্ভ করিবে, তাঁহার খুব নিকটে যাহা কিছু আছে, সবই জয় করিতে শিক্ষা করা উচিত। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত, আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রিয়া করিতেছে, তাহার যে অংশ এই শরীর ও মন চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষা

১ 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?'—মুণ্ডক উপ., ১।৩

সন্নিহিত। যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ জয় করিতে পারিলে আমরা সমগ্র প্রাণসমুদ্র জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ-বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ হন। আমরা প্রত্যেক দেশেই এরূপ কিছু কিছু সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দেশেই (আমেরিকায়) আমরা মনঃ-শক্তি দ্বারা আরোগ্যকারী (mind-healer), বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্যকারী (faith-healer), প্রেত-তত্ত্ববিৎ (spiritualist), ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্টিস্ট (Christian scientists), সম্মোহন-বিদ্যাবিৎ (hypnotists) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, এগুলির মূলে রহিয়াছে প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ—তাহারা এ-কথা জানুক বা নাই জানুক। তাহাদের সব মতের মূলে একই জিনিস রহিয়াছে। তাহারা সকলে একই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, তবে অজ্ঞাতসারে—এইমাত্র। তাহারা হঠাৎ যেন একটি শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞাতসারেই উহা ব্যবহার করিতেছে। যোগী ঐ শক্তিরই পরিচালনা করেন। উহা প্রাণেরই শক্তি।

এই প্রাণই সকল প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে রহিয়াছে। চিন্তাই প্রাণের সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া; চিন্তার যতটুকু আমরা দেখিয়া থাকি, সেইটুকু উহার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-শূন্য চিন্তাও আছে, তাহা আমাদের নিম্নতম কার্যক্ষেত্র। একটি মশক দংশন করিলে আমার হাত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহাকে আঘাত করিবে। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমার বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ইহা চিন্তারই এক প্রকার অভিব্যক্তি। শরীরের জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়া-মাত্রেই (Reflex action[১]) চিন্তার এই স্তরের অন্তর্গত। চিন্তার আর একটি

১ বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনি কার্য করে, সেই কার্যকে reflex-action বলে।

স্তর আছে, উহাকে সজ্ঞান (Conscious) বলা যাইতে পারে। আমি যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, কতকগুলি বিষয়ের দুইদিক আলোচনা করি, কিন্তু ইহাই শেষ নয়; আমরা জানি, যুক্তিবিচার সীমাবদ্ধ। যুক্তি আমাদিগকে কিছুদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তারপর আর পারে না। যে স্থানটুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই, নানাবিধ বিষয় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতুর মতো কতকগুলি বিষয় কখন কখন ভিতরে আসিয়া পড়ে। ইহাও নিশ্চিত যে, অনেক তত্ত্ব ঐ সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ঐ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, সেগুলির কারণ অবশ্যই ঐ সীমার বাহিরে অবস্থিত; আমাদের বিচার-যুক্তি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু যোগীরা বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা, তাহা কখনই হইতে পারে না। মন আরও উচ্চতর ভূমিতে—জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। যখন মন সমাধি-নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন উহা যুক্তির সীমার বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তিগুলি প্রাণেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি; ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ঐগুলি মনকে প্রেরণা দেয় এবং উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত ভূমিতে লইয়া যায়, এবং মন সেখান হইতে কার্য করিতে থাকে।

বিশ্বে অস্তিত্বের প্রত্যেক স্তরেই এক অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে। প্রাকৃতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই বিশ্বজগৎ এক ও অখণ্ড। তোমার সহিত সূর্যের কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ একটি কল্পনা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে যথার্থ কোন ভেদ নাই। টেবিলটি অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দু, আর আমি উহার অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের এক একটি আবর্ত। আবর্তগুলি আবার একটিও স্থির থাকে না। কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতিটি আবর্তে প্রতি মুহূর্তেই নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং



চিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভার পর স্বামীজী, ১৮৯৩

নূতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎও এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাশি-মাত্র, যাবতীয় বস্তু উহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তস্বরূপ। কিছু জড়রাশি একটি আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল—ধর মানবদেহে—কিছুদিন ঐ আবর্তে ঘুরিয়া, পরিবর্তিত হইয়া, বাহির হইয়া আর একটি আবর্তে প্রবেশ করিল—এবার হয়তো কোন জন্তুর দেহে, কয়েক বৎসর পরে খনিজপদার্থ-নামে আর এক প্রকার আবর্তে প্রবেশ করিল। ক্রমাগত পরিবর্তন! কোন কিছুই স্থির নয়। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক বিরাট জড়-রাশির একটি বিন্দুর নাম চন্দ্র, আর একটি বিন্দুকে বলা হয় সূর্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ্‌, অপর কোন বিন্দু হয়তো একটি খনিজ পদার্থ। ইহাদের একটিও সর্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্লেষণ, আবার বিশ্লেষণ, চলিতেছে। মন বা অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তুই 'ইথার' হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তুর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ইথার-কেই মনেরও প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। তথাপি ইথার এক অখণ্ড জড়বস্তুরূপেই থাকিবে। যদি সেই সূক্ষ্ম স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পারো, তবে অনুভব করিবে—সমগ্র জগৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দনে সংগঠিত। কখন কখন কোন ঔষধের শক্তিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে থাকিয়াও ঐরূপ অবস্থায় নীত হই। তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যার হাম্ফি ডেভির (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাষ্প (Laughing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের জন্য স্থূলকম্পনগুলি (gross vibration) যেন থামিয়া গিয়াছিল, কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনগুলি—যেগুলিকে তিনি ভাবরাশি বলিয়া অভিহিত করেন, শুধু সেইগুলিই তাঁহার অনুভূতিতে বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল সূক্ষ্ম কম্পনগুলি দেখিতে পাইতেন। সব কিছু চিন্তারূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট সব যেন এক মহা ভাবসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহা-সমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত।

এইরূপে আমরা চিন্তাজগতেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম, অবশেষে যখন আমরা সেই আত্মাকে লাভ করি, তখন অনুভব করি—সেই আত্মাই এই অখণ্ড 'এক'। সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ের স্পন্দনের অতীত—গতির উর্ধ্বে সেই এক অখণ্ড সত্তা বিরাজ করিতেছেন। এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান গতি-সমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান। এ-সকল তথ্য এখন আর অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, এই বিশ্বে শক্তিসমষ্টি সর্বত্র সমান। আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি দুই ভাবে অবস্থান করে—কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত, পরে ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই-সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে, আবার শান্ত অব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, আবার ব্যক্ত হয়। এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখন বিকশিত, কখন বা সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই শক্তিরূপী প্রাণের নিয়ন্ত্রণের নামই প্রাণায়াম।

ফুস্‌ফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বোঝা যায়। ফুস্‌ফুসের গতি বন্ধ হইলে দেহের সকল ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেন যে, তাঁহাদের ফুস্‌ফুসের গতি রুদ্ধ হইয়া গেলেও শরীর জীবিত থাকে। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়া কয়েক মাস মাটির নীচে নিজেকে চাপা দিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থূলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম শক্তি লাভ করিতে করিতে শেষে আমরা চরম লক্ষ্যে উপনীত হই। যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াই অতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। উহা যেন যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্ররূপে অপর শক্তিগুলি চালাইতেছে। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ—ফুস্‌ফুসের এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা; এই গতির সহিত শ্বাসযন্ত্রও জড়িত। শ্বাস-প্রশ্বাস যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই গতিই শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে। এই বেগই পাম্পের মতো বায়ুকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই ফুস্‌ফুস্‌কে চালিত করিতেছে। এই ফুস্‌ফুসের গতি বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রাণায়াম্ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুস্‌ফুস্‌কে সঞ্চালন

করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি স্নায়ু-মণ্ডলীর ভিতর দিয়া মাংসপেশীতে যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুস্‌ফুস্‌কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়াম-সাধনে এই প্রাণকেই বশে আনিতে হইবে। যখনই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব—শরীরের মধ্যে প্রাণের অন্যান্য সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তে আসিয়াছে। আমি নিজেই এমন সব লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাদের শরীরের পেশীগুলি বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ ইচ্ছামত সেগুলি চালনা করিতে পারেন। কেনই বা না পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমার ইচ্ছা অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে প্রত্যেকটি পেশী ও স্নায়ু আমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব না কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর ঐ পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি যে, পশুরা ঐ-রূপ করিতে পারে। এই শক্তি চালনা করি না বলিয়াই আমাদের এ শক্তি নাই। ইহাকেই পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব (atavism) বলা হয়।

আর ইহাও আমরা জানি, যে শক্তি এখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনা যায়। খুব দৃঢ় পরিশ্রম ও অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেক সুপ্ত শক্তিকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী করা যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, বরং খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহা করিয়া থাকেন। তোমরা হয়তো যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমগ্র শরীর 'প্রাণে'র দ্বারা পূর্ণ কর। ইংরেজী অনুবাদে প্রাণ-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শ্বাস। ইহাতে তোমরা সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারো, 'শ্বাসের দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে?' ইহা অনুবাদকেরই দোষ। শরীরের প্রত্যেকটি অংশই প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনীশক্তি দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে; আর যখনই তুমি এরূপ করিতে পারিবে, তখনই সমগ্র শরীর তোমার বশে আসিবে। দেহে অনুভূত সকল ব্যাধি, সকল দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আসিবে। শুধু তাই নয়, তুমি অপরের শরীরও নিয়ন্ত্রিত করিতে

পারিবে। পৃথিবীতে ভাল মন্দ সবই সংক্রামক। তোমার শরীরে যদি কোন এক বিশেষ ভাবের উত্তেজনা থাকে, অপরের ভিতরও সেই ভাবের প্রবণতা দেখা দিবে। যদি তুমি সবল ও সুস্থ হও, তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও সুস্থ ও সবল ভাব আসিবে। তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, তবে দেখিবে তোমার নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ যেন একটু রুগ্ন ও দুর্বল হইতেছে। তোমার সুস্থ শরীরের স্পন্দন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। যখন একজন অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন প্রথমে তাহার ভাবটি এইরূপ হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিব। ইহা একপ্রকার আদিম চিকিৎসা-প্রণালী। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একজন আর একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্ ব্যক্তি যদি কোন দুর্বল লোকের সঙ্গে সর্বদা বাস করে, তাহা হইলে সেই দুর্বল ব্যক্তি জানুক বা না জানুক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। যখন এই প্রক্রিয়া জ্ঞাতসারে করা হয়, তখন ইহার ফল অপেক্ষাকৃত ত্বরান্বিত ও ভাল হইয়া থাকে। আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে স্বয়ং খুব সুস্থকায় না হইলেও একজন অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ আরোগ্যকারীর প্রাণের উপর প্রভুত্ব কিছুটা বেশী। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রাণ উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট অবস্থায় উন্নীত করিয়া অপরের শরীরে ঐ স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারেন।

অনেকস্থলে প্রক্রিয়াটি দূর হইতেও সংসাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ (break) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই। এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ—কিছুমাত্র যোগ নাই? সূর্য ও তোমার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে—তুমি তাহার এক অংশ, সূর্য তাহার আর এক অংশ। নদীর এক অংশ ও অপর অংশের মধ্যে কি ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তাহা হইলে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে তো কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। দূর হইতে রোগ আরোগ্য করার ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। এই প্রাণকে বহুদূরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ-বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি। লোকে

এই আরোগ্য-প্রণালীকে যত সহজ ভাবে—তত সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার সুযোগ লইতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া সব লোকই মারা পড়ে। এমন কি, বিসূচিকা-মহামারীতেও যদি কিছুদিন শতকরা ৬০ জন মরে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার কমিয়া শতকরা ৩০ হয়, পরে ২০তে দাঁড়ায়, অবশিষ্ট সকলে রোগমুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিলেন, তাঁহার ঔষধ দিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার ঔষধ দিলেন, হয়তো এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিলেন, কারণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর শরীরে কোন গোলযোগ না বাধাইয়া প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কাজ করিতে দেন। বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও রোগী আরোগ্য করিবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্বাসবলে রোগীর সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া দেন।

কিন্তু বিশ্বাসবলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি ভুল হইয়া থাকে—তাঁহারা মনে করেন, সাক্ষাৎভাবে বিশ্বাসই মানুষকে রোগমুক্ত করে। বাস্তবিকপক্ষে কেবল বিশ্বাসই যে একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না। এমন সব রোগ আছে, যেগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ লক্ষণ এই—রোগী নিজে আদৌ মনে করে না যে, তাহার সেই রোগ হইয়াছে। রোগীর নিজের রোগহীনতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, সচরাচর ইহা আশু মৃত্যুরই সূচনা করে। এ-সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয়—এ তত্ত্ব খাটে না। যদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত, তাহা হইলে এই-সকল রোগীও আরোগ্যলাভ করিত; প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। যে পবিত্রাত্মা পুরুষ নিজ প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়া গিয়া অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে পারেন। প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পারো। আমি বক্তৃতা দিতেছি, বক্তৃতা দিবার সময় কি করিতেছি? আমি আমার মনকে একপ্রকার কম্পনের অবস্থায় আনিতেছি; এবং এই-বিষয়ে আমি

যতই কৃতকার্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্য দ্বারা প্রভাবিত হইবে। তোমরা সকলেই জানো, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাতিয়া উঠি, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের বেশী ভাল লাগে, আর আমার উৎসাহ অল্প হইলে আমার বক্তৃতা শুনিতে তোমাদেরও তত ভাল লাগে না।

জগৎ-আলোড়নকারী তীব্র-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রাণ এক অতি উচ্চ কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারেন; প্রাণ এত অধিক শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহা অন্যকে মুহূর্তমধ্যে স্পর্শ করে, সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের অর্ধেক লোক তাঁহাদের ভাবানুসারে ভাবিত হইয়া থাকে। জগতের মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাণ জয় করিয়াছিলেন। এই প্রাণসংযমের বলে তাঁহারা প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণকে উচ্চতম কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিয়াই তাঁহারা জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি লাভ করেন। জগতে যতপ্রকার শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই প্রাণের সংযম হইতে উৎপন্ন। মানুষ ইহার গোপন তথ্য না জানিতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তোমার শরীরে এই প্রাণশক্তির সরবরাহ কখন এক দিকে বেশী, অন্য দিকে কম পড়িয়া যায়—সাম্য নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণের অসামঞ্জস্যেই রোগের উৎপত্তি। অতিরিক্ত প্রাণটুকু সরাইয়া যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে, সেখানকার অভাব পূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, কোথায় বা অল্প প্রাণশক্তি আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ। অনুভব-শক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে—পায়ের আঙুলে বা হাতের আঙুলে যতটুকু প্রাণ আবশ্যক তাহা নাই এবং ঐ প্রাণের অভাব পূরণ করিবার শক্তিও মনের থাকিবে। প্রাণায়ামের এইরূপ নানা অঙ্গ আছে। ঐগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণকে সংযত করা এবং চালনা করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য। যখন কেহ নিজের সব শক্তিকে সংহত করিয়াছে, তখন সে নিজ দেহস্থ প্রাণকেই আয়ত্ত করিয়াছে। যখন কেহ ধ্যান করে, সে প্রাণকেই সংযত করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

মহাসমুদ্রে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ, আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গসমূহ, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদও রহিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের পশ্চাতে

এক অনন্ত মহাসমুদ্র। ঐ ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদটি একদিকে অনন্ত সমুদ্রের সহিত, আবার অন্যদিকে সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এইরূপে সংসারে কেহ বা মহাপুরুষ, কেহ বা ক্ষুদ্র জল-বুদ্‌বুদতুল্য সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাশক্তি-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এই মহাশক্তিতে জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। যেখানেই জীবনীশক্তির প্রকাশ, সেইখানেই পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক (fungus)—হয়তো এত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা উহা দেখিতে হয়—তাহা হইতে আরম্ভ কর, দেখিবে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ শক্তি সংগ্রহ করিয়া সেটি আর এক আকার ধারণ করিতেছে। কালে উহা উদ্ভিদ্‌রূপে পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধারণ করিল, পরে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরে পরিণত হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু এই সময়ই বা কি? সাধনার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়া দিলে সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে। যোগীরা বলেন, যে কার্য করিতে সাধারণভাবে অধিক সময় লাগে, কার্যের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে। মানুষ এই বিশ্বের অনন্ত শক্তিরাশি হইতে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে। এভাবে চলিলে একজনের দেবত্ব লাভ করিতে হয়তো লক্ষ বৎসর লাগিবে। আরও উচ্চাবস্থা লাভ করিতে হয়তো পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিবে। আবার পূর্ণ বা সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিবে। উন্নতির বেগ বাড়াইলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে। যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাসে অথবা ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? যুক্তি দ্বারা ইহা বুঝা যায়। কোন বাষ্পীয়-যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা দিলে প্রতি ঘণ্টায় দুই মাইল করিয়া যাইতে পারে। আরও অধিক কয়লা দিলে আরও শীঘ্র যাইবে। এইরূপে তীব্রসংবেগসম্পন্ন[১] হইলে জীবাত্মা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে কেন? সকলেই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই ক্ষণেই, এই শরীরেই—এই মনুষ্যদেহেই মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ

---

১ যোগসূত্র, ১।২১

হইবে? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনই লাভ করিব না কেন?

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল মানুষ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, একটু একটু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়, যোগীরা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। জগতের সকল মহাপুরুষ—সাধু ও সিদ্ধপুরুষ কি করিয়াছেন? এক জীবনেই তাঁহারা মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করেন, সাধারণ মানুষের পূর্ণত্ব লাভ করিতে যে দীর্ঘকাল লাগে, সেই কাল তাহারা এই জীবনেই অতিক্রম করেন। এক জন্মেই তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আর কিছুই চিন্তা করেন না, অন্য কোন ভাবের জন্য একমুহূর্ত সময় কাটান না। এইরূপেই তাঁহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। একাগ্রতা বলিতে বুঝায়—শক্তি-সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি; এইভাবেই সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়। রাজযোগ-বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করা যায়।

প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্ত্বের সম্বন্ধ কি? প্রেততত্ত্ব প্রাণায়ামেরই এক প্রকার শক্তি-বিকাশ। যদি ইহা সত্য হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব আছে, আমরা শুধু উহাদিগকে দেখিতে পাই না, তাহা হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে, এখানেই হয়তো শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না। আমরা হয়তো সর্বদাই তাহাদের শরীরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছি। আর ইহাও খুবই সম্ভব যে, তাহারাও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। ইহা—একটি বৃত্তের ভিতর আর আর একটি বৃত্ত, একটি জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। যাহারা এক ভূমিতে (Plane) থাকে, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পায়। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণী, আমাদের প্রাণের স্পন্দন এক বিশেষ স্তরের। যাহাদের প্রাণের স্পন্দন একই প্রকারের, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি এমন কোন প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্পন্দনশীল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব না। আলোকের তীব্রতা অতিশয় বর্ধিত হইলে আমরা

উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষু এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, তাহারা ঐরূপ আলোকও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের স্পন্দন অতি মৃদু হয়, তখনও উহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু পেচক বিড়ালাদি জন্তুগণ উহা দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টির সীমা এই প্রাণস্পন্দনের একটি স্তরেই অবস্থিত। অথবা বায়ুরাশির কথা ধর; বায়ু স্তরে স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর, তাহা উপরের স্তর অপেক্ষা অধিক ঘন; আরও ঊর্ধ্বদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বায়ু ক্রমশঃ পাতলা হইতেছে। অথবা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লও; সমুদ্রের যতই গভীর হইতে গভীরতর স্তরে যাইবে, জলের চাপ ততই বাড়িতে থাকিবে। যে-সকল জন্তু সমুদ্রতলে বাস করে, তাহারা কখনই উপরে আসিতে পারে না, কারণ আসিলেই খণ্ডখণ্ড-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

সমগ্র জগৎকে 'ইথারে'র একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। প্রাণের শক্তিতে যেন উহা স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন গ্রামে স্পন্দিত হইয়া উহা যেন স্তরে স্তরে অবস্থিত। যে কেন্দ্র হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই সেই স্পন্দন মৃদুভাবে অনুভূত হয়। কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। এক এক প্রকারের স্পন্দনে এক একটি স্তর। তারপর মনে কর, এই-সকল স্পন্দনের স্তর বিভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত হইল—লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি স্তর, আবার লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত আর একটি উচ্চতর স্পন্দনের স্তর এইরূপ চলিতে থাকিবে। এইভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি যেমন আমরা অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির সীমা বাড়াইতে পারি, সেইরূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনবিশিষ্ট করিয়া অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ সেখানে কি হইতেছে, জানিতে পারি। মনে কর, এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহাদের আমরা দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দনের ও আমরা আর এক প্রকার স্পন্দনের ফলস্বরূপ। মনে কর, তাহারা অধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট ও আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনশীল। তাহারা প্রাণ-রূপ মূলবস্তু হইতে গঠিত,

আমরাও তাই। সকলেই এক প্রাণ-সমুদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, তবে বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের বেগে। যদি মনকে দ্রুত স্পন্দনবিশিষ্ট করিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তর পরিবর্তিত হইবে, আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না, তোমরা আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে ও অপরে আবির্ভূত হইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানো যে, এই ব্যাপার সত্য। মনকে উচ্চতর স্পন্দনের স্তরে উন্নীত করাকেই যোগশাস্ত্রে এক কথায় 'সমাধি' বলা হয়। এ-সকল উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থাকে মনের অতিচেতন স্পন্দনকে 'সমাধি' নামক একটি শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; সমাধির নিম্নতর অবস্থাতেই ঐ-সব প্রেতাত্মা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমরা সত্যস্বরূপকে দর্শন করি, তখন আমরা দেখিতে পাই, কি উপাদানে এই সব নানা স্তরের জীব গঠিত। 'একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে জগতের সকল মৃত্তিকাই জানা হইয়া যায়'।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ত্ববিদ্যায় যেটুকু সত্য আছে, তাহাও এই প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ যখনই দেখিবে, কোন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যবিদ্যা বা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে—তাহারা প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাণে এই রাজযোগই সাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই কোনরূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই দেখিবে—এই প্রাণের অভিব্যক্তি। জড়বিজ্ঞানগুলিও প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বাষ্পীয়-যন্ত্রকে কে চালিত করে? প্রাণই বাষ্পের মধ্য দিয়া উহাকে চালাইয়া থাকে। তড়িৎ প্রভৃতির যে অত্যদ্ভুত ক্রিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণশক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পদার্থ-বিজ্ঞানই বা কি? উহা বাহ্য উপায়ে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম-বিজ্ঞান। প্রাণ যখন মনঃশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মানসিক উপায়েই উহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। প্রাণায়াম-বিজ্ঞানের যে অংশে প্রাণের স্থূল প্রকাশগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর প্রাণায়ামের যে অংশে মনঃশক্তিরূপ প্রাণের বিকাশগুলিকে মানসিক উপায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহাকেই 'রাজযোগ' বলে।

প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ

যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও 'সুষুম্না' নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নিম্নপ্রান্তে 'কুণ্ডলিনী পদ্ম' অবস্থিত, যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগীদের রূপক ভাষায় ঐ স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা। যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, এবং যতই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের যেন স্তরের পর স্তর খুলিয়া যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক্ হইয়া যান এবং তাঁহার আত্মা স্বীয় মুক্তভাব উপলব্ধি করে।

আমরা জানি, সুষুম্না কাণ্ড এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, 8—এই অক্ষরটিকে যদি লম্বালম্বি ভাবে (∞) লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার দুটি অংশ রহিয়াছে এবং ঐ দুইটি মধ্যদেশে সংযুক্ত। এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাজাইলে যেরূপ দেখায়, সুষুম্না কতকটা সেইরূপ। উহার বামভাগ 'ইড়া', দক্ষিণ ভাগ 'পিঙ্গলা', এবং যে শূন্য নালী সুষুম্নার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে, তাহাই 'সুষুম্না'। কটিদেশের নিকট মেরুদণ্ডের কতকগুলি অস্থির পরেই সুষুম্না শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও একটি অতিসূক্ষ্ম তন্তু বরাবর নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সুষুম্না নালী ঐ তন্তুর মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে ঐ নালীর মুখ বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacral plexus) অবস্থিত। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) মতে—উহা ত্রিকোণাকৃতি। বিভিন্ন স্নায়ুজালের কেন্দ্র সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত; ঐগুলিকেই যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যোগী কল্পনা করেন, সর্বনিম্নে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা ঐ

পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত স্নায়ুজাল (Plexus) বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে। আমরা জানি, আমাদের স্নায়ুমধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে; তাহাদের একটিকে অন্তর্মুখ ও অপরটিকে বহির্মুখ, একটিকে সংবেদাত্মক (sensory) ও অপরটিকে চেষ্টাত্মক (motor), একটিকে কেন্দ্রাভিগ ও অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কের অভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া যায়। ঐ স্পন্দন-প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। পরবর্তী ব্যাখ্যা সুগম ও স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের অন্যান্য কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ক-মজ্জায় একটি কন্দে (bulb) শেষ হইয়াছে; কিন্তু উহা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত নয়, মস্তিষ্কের অন্তর্গত তরল পদার্থে ভাসমান। মাথায় যদি কোন আঘাত লাগে, তবে ঐ আঘাতের শক্তি ঐ তরল পদার্থেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আরও জানিতে হইবে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্বনিম্নস্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহস্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র এই তিনটীর কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমরা সকলেই তড়িৎ ও তৎসম্পর্কে অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথা শুনিয়াছি। তড়িৎ কি, তাহা কেহই জানে না, তবে আমরা এই পর্যন্ত জানি যে, তড়িৎ একপ্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্যান্য নানাবিধ গতি আছে, তড়িতের সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল নড়িতেছে—যে পরমাণুগুলি দ্বারা উহা গঠিত, সেগুলি বিভিন্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে। যদি উহাদিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা তড়িৎশক্তির দ্বারাই সম্ভব হইবে। তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থের পরমাণুগুলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, তাহার সব পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে ঘরটি এক বিরাট বিদ্যুদাধার-যন্ত্রে (Battery) পরিণত হইবে।

শারীরবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। তত্ত্বটি এই: যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রগুলি নিয়মিত করে, স্নায়ুপ্রবাহগুলির

উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে ; ঐ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত, উহা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করে এবং অন্যান্য যে-সকল স্নায়ুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার আমরা প্রাণায়াম-ক্রিয়া-সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা শরীরের সমুদয় পরমাণুই একদিকে গতি-সম্পন্ন হইবার প্রবণতা লাভ করিবে। যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় স্নায়ুপ্রবাহও এক প্রকার তড়িৎ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয় ; কারণ, দেখা গিয়াছে, স্নায়ুগুলির উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে স্নায়ুর উভয় প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছা-শক্তি স্নায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন উহা তড়িতের মতো কোন শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। যখন শরীরের সমুদয় গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত হয়, তখন শরীর যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিদ্যুদাধার-স্বরূপ হইয়া পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম-ক্রিয়াটি এইরূপে শারীরবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে ছন্দের মতো একপ্রকার গতি উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসকেন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য—মূলাধারে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করা।

আমরা যাহা কিছু দেখি বা কল্পনা করি অথবা যখন স্বপ্ন দেখি, সবই আকাশে অনুভব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন বা অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ অনুভব করেন, তখন তিনি ঐগুলি আর এক-প্রকার আকাশে—চিত্তাকাশে বা মানস আকাশে দেখিতে পান। আর যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শূন্য হয়, যখন আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন, তখন উহার নাম 'চিদাকাশ' বা জ্ঞানের আকাশ। যখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া সুষুম্না-নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে-সকল বিষয় অনুভূত হয়, সেগুলি চিত্তাকাশেই হইয়া থাকে। ঐ নাড়ীর শেষ সীমা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে চিদাকাশে এক বিষয়শূন্য জ্ঞান অনুভূত হইয়া থাকে।

এইবার তড়িৎ-শক্তির উপমা আবার লওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাই

যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তড়িৎপ্রবাহ একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করিতে পারে।[১] কিন্তু প্রকৃতি তাহার নিজের প্রচণ্ড শক্তিপ্রবাহ প্রেরণ করিতে কোন তারের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রবাহ চালাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবশ্যকতা নাই, তবে আমরা উহা ছাড়া কাজ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের তার প্রয়োজন।

তড়িৎপ্রবাহ যেমন তারের সাহায্যে প্রেরিত হয়, ঠিক তেমনি স্নায়ুতন্তুরূপ তারের—সাহায্যে শরীরের সর্ববিধ সংবেদন মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে ও মস্তিষ্ক হইতে কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিন্দ্রিয়ে প্রেরিত হইতেছে। সুষুম্না-মধ্যস্থিত জ্ঞানাত্মক ও কর্মাত্মক স্নায়ুতন্তুগুলিই যোগিগণের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। প্রধানতঃ ঐ দুইটি নাড়ীর ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ শক্তি-প্রবাহদ্বয় চলাচল করিতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে, কোন তারের সাহায্য ব্যতীত মন কেন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে না অথবা প্রতিক্রিয়া করিবে না? প্রকৃতিতে তো এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইতেছে। যোগীরা বলেন, এরূপ করিতে পারিলেই জড়ের বন্ধন অতিক্রম করা যাইতে পারে। ইহা করিবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুষুম্নার ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালাইতে পারো, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। মনই এই স্নায়ুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই ঐ জাল ছিন্ন করিতে হইবে। কোনরূপ তারের সাহায্য ছাড়াই কাজ করিতে হইবে। তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্যই সুষুম্না নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন। যদি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া নাড়ীজালের সাহায্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পারি, যোগীরা বলেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। যোগীরা আরও বলেন, ইহা করিতে পারা যায়।

সাধারণ লোকের শরীরে সুষুম্না নিম্নদিকে বদ্ধ; উহার দ্বারা কোন ক্রিয়াই হয় না। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্নাদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উহার মধ্য দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য

১ পাঠক স্মরণ রাখিবেন, বেতার আবিষ্কারের পূর্বে ইহা লিখিত।

হইলে স্নায়ুপ্রবাহ উহার মধ্য দিয়া চালাইতে পারা যায়। বাহ্য বিষয়স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন কেন্দ্রে উপনীত হয়, তখন ঐ কেন্দ্র হইতে এক প্রতিক্রিয়া (reaction) উপস্থিত হয়। স্বয়ংক্রিয়কেন্দ্রগুলিতে ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলে গতি উৎপন্ন হয়; চৈতন্যময় কেন্দ্রগুলিতে (conscious centres) কিন্তু প্রথমে অনুভব, পরে গতি উৎপন্ন হয়। সমুদয় অনুভূতিই বাহির হইতে আগত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে স্বপ্নে অনুভূতি হয় কিরূপে? তখন তো বাহিরের কোন ক্রিয়া নাই, তবে তো বিষয়াভিঘাত-জনিত স্নায়বীয় গতিগুলি শরীরের কোথাও কুণ্ডলীকৃতভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি নগর দেখিলাম; সেই নগরের বহির্বস্তুরাজির আঘাতের প্রতিঘাতেই আমার সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহির্বস্তুনিচয় দ্বারা আমার অন্তর্বাহী স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা মস্তিষ্কমধ্যস্থ পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন—অনেক দিন পরেও ঐ নগরটি মনে করিতে পারি। স্মৃতিতেও ঠিক ঐ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে, তবে মৃদুতরভাবে। কিন্তু যে ক্রিয়া মস্তিষ্কের ভিতর অনুরূপ মৃদুতর স্পন্দন তোলে, তাহাই বা কোথা হইতে আসে? উহা সেই প্রথম সংবেদন-জনিত, তাহা কথনই বলা যায় না। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ঐ সংবেদন-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরে কোথাও কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং উহাদের অভিঘাতের ফলে স্বপ্নকালীন অনুভূতিরূপ মৃদু প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়।

যে কেন্দ্রে সংবেদনগুলির অবশিষ্টাংশ বা সংস্কারসমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, তাহাকে 'মূলাধার' বলে, আর ঐ কুণ্ডলীকৃত ক্রিয়াশক্তিকে 'কুণ্ডলিনী' বলে। সম্ভবতঃ চেষ্টাশক্তির অবশিষ্টাংশও এই স্থানেই কুণ্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে; কারণ, বাহ্যবস্তুর দীর্ঘকাল চিন্তা ও গভীর অধ্যয়নের পর শরীরের যে স্থানে ঐ মূলাধার চক্র (সম্ভবতঃ ত্রিকাস্থি-স্নায়ুজাল=Sacral Plexus) অবস্থিত, তাহা উষ্ণ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া ক্রিয়াশীল করা যায়, তারপর জ্ঞাতসারে সুষুম্না-নালীর ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া যায়, তবে উহা যেমন যেমন এক কেন্দ্রের পর আর এক কেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইবে। যখন কুণ্ডলিনী-শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া

বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু যখন ঐ দীর্ঘকাল-সঞ্চিত বিপুল শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘ-কালব্যাপী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে সুষুম্নামার্গ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন- বা কল্পনা-কালীন প্রতিক্রিয়া হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, জাগ্রৎকালীন বিষয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হইতেও অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর এই অবস্থায় মন জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে বলা যায়। আবার যখন উহা সমুদয় জ্ঞানের—সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদয় মস্তিষ্ক ও উহার অনুভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে; ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা আত্মানুভূতি। কুণ্ডলিনী-শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যায়, অমনি যেন মনের এক একটি স্তর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং তখন যোগী এই জগতের সূক্ষ্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকেন। তখনই সংবেদন ও উহার প্রতিক্রিয়ারূপে জগতের কারণসমূহের যথার্থ জ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের সর্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হইবে। কারণটি জানিতে পারিলেই কার্যের জ্ঞান নিশ্চয়ই আসিবে।

এইরূপে দেখা গেল যে, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করাই দিব্যজ্ঞান—জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভের একমাত্র উপায়। কুণ্ডলিনী জাগরণের অনেক উপায় আছে: কাহারও ভগবৎপ্রেমবলে, কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষ-গণের কৃপায়, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞানবিচার দ্বারা। লোকে যাহাকে অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথাও তাহার কিছু প্রকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুণ্ডলিনী শক্তি কোন মতে সুষুম্নার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়া হঠাৎ এমন কোন সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে কুণ্ডলিনী শক্তির কিয়ৎপরিমাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিয়াছে। সর্বপ্রকার উপাসনাই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই একই লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দেয়। যিনি মনে করেন, প্রার্থনার উত্তর পাইতেছি, তিনি জানেন না যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃত্তি দ্বারা তিনি তাঁহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে

সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং মানুষ না জানিয়া যাঁহাকে নানা নামে, ভয়ে, ও দুঃখের ভিতর দিয়া উপাসনা করে, তাঁহার নিকট কি ভাবে অগ্রসর হইতে হয় জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত শক্তিরূপে কুণ্ডলাকারে বিরাজমান এবং তিনি সকল সুখের জননী—যোগিগণ জগতের সমক্ষে ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। উহাই সকল উপাসনা, সকল প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও অলৌকিক ঘটনা সমূহের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম

এখন আমাদের প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অঙ্গই ফুস্‌ফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের উদ্দেশ্য—শরীরের মধ্যে যে-সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতি আছে, সেগুলি অনুভব করা। আমাদের মন বহির্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, উহা ভিতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতিগুলিকে মোটেই ধরিতে পারে না। অনুভব করিতে পারিলেই আমরা সেগুলি জয় করিতে পারিব। এই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে; প্রতি পেশীতে উহারা প্রাণ ও জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু আমরা সেই প্রবাহগুলি অনুভব করিতে পারি না। যোগীরা বলেন, চেষ্টা করিলে আমরা ঐগুলি অনুভব করিতে শিখিতে পারি। কিভাবে? প্রথমে ফুস্‌ফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমরা সূক্ষ্মতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব।

(এখন প্রাণায়ামের সাধন ও ক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা যাক। সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে, শরীরকে ঠিক সোজাভাবে রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকাণ্ডটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত তথাপি মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নয়। বক্র হইয়া বসিলে সুষুম্নাপথ বাধাপ্রাপ্ত হয় অতএব দেখিতে হইবে, উহা যেন স্বচ্ছন্দভাবে থাকে। বক্র হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হয়। শরীরের তিনটি ভাগ—বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সর্বদা এক রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে। তারপর স্নায়ুগুলি বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রের কার্য নিয়মিত করে, অপরাপর স্নায়ুগুলির উপরও তাহার কতকটা প্রভাব আছে। এই জন্যই শ্বাসপ্রশ্বাস তালে তালে (rhythmical) হওয়া আবশ্যক। আমরা সচরাচর যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা শ্বাসপ্রশ্বাস নামের যোগ্যই হইতে পারে না, উহা এত অনিয়মিত। আবার স্ত্রীপুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে।

প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়া এই : নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর ও নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে দেহযন্ত্রটির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর এই শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় 'ওঙ্কার' অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল হয়। (প্রাণায়ামের সময় এক, দুই, তিন, চার এই ক্রমে সংখ্যা গণনা না করিয়া ভারতে আমরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ (বীজমন্ত্র) ব্যবহার করিয়া থাকি। এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় 'ওঁ' অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে; এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ছন্দের তালে তালে চালিত হইতেছে।) তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নয়। একবার এই বিশ্রামের অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত স্নায়ুগুলি পর্যন্ত জুড়াইয়া যাইবে, আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রাম লাভ কর নাই।

এই সাধনে প্রথম ফল দেখা যায়—মুখভাবের পরিবর্তনে, মুখের শুষ্কতা বা কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলি অন্তর্হিত হইবে। (মনের শান্তি মুখে ফুটিয়া বাহির হইবে। তারপর গলার স্বর অতি সুন্দর হইবে।) আমি এমন যোগী একজনও দেখি নাই, যাঁহার গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস সাধনার পরই এই-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। (এই প্রথম পূর্বোক্ত প্রকারের প্রাণায়াম কিছুদিন অভ্যাস করিয়া উচ্চতর প্রাণায়ামের আর একটি সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। উহা এই—ইড়া অর্থাৎ বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে ফুসফুস্ বায়ুতে পূর্ণ কর। ঐ সঙ্গে স্নায়ুপ্রবাহের উপর মনঃসংযম কর; ভাবো, তুমি যেন স্নায়ুপ্রবাহকে মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে প্রেরণ করিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তির আধারভূত মূলাধারস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ; তারপর ঐ স্নায়ু-প্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তারপর কল্পনা কর যে, সেই স্নায়ুপ্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক বা পিঙ্গলার দ্বারা উপরে টানিয়া লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে বাহিরে নিক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাস করা তোমার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হইবে। সহজ উপায়—প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ

কর। তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাসা বন্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি বায়ুপ্রবাহটিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছ ও সুষুম্নার মূলদেশে আঘাত করিতেছ, তারপর অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। তারপর বাম নাসা তর্জনী দ্বারা বন্ধ রাখিয়াই, দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ কর ও পুনরায় পূর্বের মতো উভয় নাসারন্ধ্রই বন্ধ কর।) হিন্দুদিগের মতো প্রাণায়াম অভ্যাস করা এদেশের (আমেরিকার) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই ইহা অভ্যাস করে, তাহাদের ফুসফুস ইহাতে অভ্যস্ত। এখানে চারি সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভাল হয়। চারি সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, ষোল সেকেণ্ড বন্ধ কর, পরে আট সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাতেই একটি প্রাণায়াম হইবে। ঐ সময়ে মূলাধারস্থ ত্রিকোণাকার পদ্মটি চিন্তা করিতে করিতে ঐ কেন্দ্রে মন স্থির করিবে। এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক সুবিধা হইবে।)

পরবর্তী (তৃতীয়) প্রাণায়াম এই :(ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, পরে সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিয়া বাহিরেই কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখো; সংখ্যা—পূর্ব প্রাণায়ামের মতো। পূর্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়াম পূর্বাপেক্ষা সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নয়। উহা প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারো। ক্রমশঃ দেখিবে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা চার হইতে ছয় বৃদ্ধি করিতে পারো। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে।)

নাড়ীশুদ্ধির জন্য বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়া-দুইটি কঠিন নয়, এবং উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। প্রথম ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শান্তভাব আসিবে। উহার

সহিত 'ওঙ্কার' যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি কোন কার্যে নিযুক্ত আছ, তখনও তুমি উহা অভ্যাস করিতে পারিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয়তো খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইবেন। যাঁহারা দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ হইবে, গলার স্বর মধুর হইবে। কিন্তু যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইবে; তাঁহাদের নিকট সমগ্র প্রকৃতিই আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তখন আর গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করিতে হইবে না, মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের কাজ করিবে। আমি পূর্বেই মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি শক্তি-প্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যস্থ সুষুম্নার কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে। তবে যোগীরা বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে সুষুম্না বদ্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের কার্য শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন করা।

কেবল যোগীরই এই সুষুম্না উন্মুক্ত থাকে। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া গিয়া তাহার মধ্য দিয়া স্নায়ুশক্তিপ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমরা বুদ্ধিরও অতীত দেশে চলিয়া যাই, যেখানে তর্ক পৌঁছিতে পারে না। এই সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্বে যে-সকল শক্তিবহনকেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে সেগুলি সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাষায় সেগুলিকেই পদ্ম বলে। সর্বনিম্নে সুষুম্নার নিম্নভাগে অবস্থিত পদ্মটির নাম (১ম) মূলাধার; তার ঊর্ধ্বে (২য়) স্বাধিষ্ঠান, (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা, সর্বশেষে (৭ম) মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম।

ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা আবশ্যক—সর্বনিম্নে মূলাধার ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রে অবস্থিত সহস্রার। সর্বনিম্ন চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মস্তিষ্কস্থ সর্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে মহত্তম শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। যাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান্ ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্ হয়। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাহা নয়, তবু তাহার কথায় লোকে মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি।

সকল মানুষের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহা আমাদের সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পেশীর শক্তিগুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে। যোগীরা বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সংযত হইলে সহজেই ওজোরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। যোগীরা সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাতুতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এইজন্যই সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিত্র হইলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই জন্যই বিবাহত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হইয়াছে। কায়মনো-

বাক্যে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা নিতান্ত কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত রাজযোগ-সাধন বড় বিপৎসঙ্কুল; উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, সে কিরূপে যোগী হইবার আশা করিতে পারে?

প্রত্যাহার ও ধারণা

সাধনার পরবর্তী সোপানকে বলা হয় 'প্রত্যাহার'। এই প্রত্যাহার কি? তোমরা জানো কিরূপে বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের বাহিরের যন্ত্রগুলি, তারপর ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি—ইহারা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শরীরের উপর কার্য করিতেছে, তারপর আছে মন। যখন এইগুলি একত্র হইয়া কোন বহির্বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত রাখা অতি কঠিন; কারণ মন (বিষয়ের) ক্রীতদাস।

আমরা জগতে সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, 'সৎ হও, ভাল হও'। বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যাহাকে বলা হয় নাই, 'মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না' ইত্যাদি, কিন্তু কেহ তাহাকে এই-সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় হয় না। কেন সে চোর হইবে না? আমরা তো তাহাকে চৌর্যকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, 'চুরি করিও না'। মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়। যখন মন ইন্দ্রিয়-নামক বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, মানুষের মন ঐ কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন হইতে বাধ্য হয়। এই জন্যই মানুষ নানাপ্রকার দুষ্কর্ম করে এবং দুঃখ পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই ঐরূপ কর্ম করিত না। মন সংযত করিলে কি ফল হইত? তাহা হইলে মন আর তখন নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না, ফলে অনুভব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আসিবে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল। ইহা কার্যে পরিণত করা কি সম্ভব?—সর্বতোভাবে সম্ভব। তোমরা বর্তমানকালেও দেখিতে পাইতেছ—বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারীরা রোগীকে দুঃখ, কষ্ট, অশুভ প্রভৃতি অস্বীকার করিতে শিক্ষা দেয়। অবশ্য ইহাদের যুক্তিতে সে ব্যাপারটি কতকটা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপে তাহারা উহা

আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে তাহারা দুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য হয়, বুঝিতে হইবে, সে-সকল ক্ষেত্রে তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কিছুটা শিক্ষা দিয়াছে, কারণ তাহারা সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়া দেয়, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়গুলিকে উপেক্ষা করে। সম্মোহন-বিদ্যাবিদ্‌গণও (hypnotists) প্রায় পূর্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ইঙ্গিত-বলে (suggestion) সাময়িকভাবে রোগীর ভিতরে একপ্রকার অস্বাভাবিক প্রত্যাহারের ভাব আনয়ন করে। তথাকথিত বশীকরণ-ইঙ্গিত শুধু দুর্বল মনেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণকারী যতক্ষণ না স্থিরদৃষ্টি অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার বশ্যব্যক্তির মন নিষ্ক্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিত বা আদেশে কোন কাজ হয় না।

বশীকরণকারীরা বা বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্যব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলি বশীভূত করিয়া থাকে, তাহা অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম, কারণ উহা ঐ বশ্যব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। ইহা তো স্বীয় ইচ্ছাশক্তিবলে মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ নয়, অপরের ইচ্ছাশক্তির সহসাপ্রদত্ত আঘাতে বশ্যবক্তির মনকে কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করিয়া রাখা। উহা লাগাম ও পেশী-শক্তির সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত করা নয়, বরং উহা অপরকে সেই অশ্বগণের উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়া শান্ত করিয়া রাখা। এই-সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটিতে বশ্যব্যক্তি তাহার মনের শক্তি কিছু কিছু করিয়া হারাইতে থাকে, পরিশেষে মন নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা দূরে থাক, ক্রমশঃ একপ্রকার শক্তিহীন কিম্ভূতকিমাকার জড়ে পরিণত হয়, এবং বাতুলালয়ই তাহার একমাত্র গন্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার পরিবর্তে মনকে অন্য উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টাদ্বারা কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহা নয়, উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা প্রভুত্ব—জড়বস্তু ও চিন্তার দাসত্ব হইতে মুক্তি, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব। কিন্তু সেই লক্ষ্যে না পৌঁছাইয়া, অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ, উহা যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক না কেন—সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া বা অস্বাভাবিক

ভাবে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াই হউক—পূর্ব হইতে বিদ্যমান চিন্তা ও কুসংস্কারগুলির গুরুভার শৃঙ্খলের উপর উহা আর একটি শিকলি আটকাইয়া দেয়। অতএব সাবধান, যখন অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও। সাবধান, যখন অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ কর। সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের কল্যাণসাধনে কৃতকার্য হন, কিন্তু আবার চারিদিকে অজ্ঞাতসারে এই ইঙ্গিত (suggestion)-শক্তি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে একরূপ বিকৃত, নিষ্ক্রিয় ও মোহের ভাব জাগাইয়া তুলেন, পরিণামে তাহারা আত্মার অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিস্মৃত হইয়া যায়, অতএব যে-কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, অথবা নিজের উচ্চতর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ-শক্তিদ্বারা বহু লোককে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বাধ্য করে, সে ইচ্ছা না করিলেও মনুষ্যজাতির অনিষ্ট করিয়া থাকে।

অতএব নিজের শরীর ও মন সংযত করিতে সর্বদাই নিজ মনের সহায়তা লইবে, এবং সর্বদা স্মরণ রাখিবে, যে পর্যন্ত না রোগগ্রস্ত হও, ততক্ষণ বাহিরের কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর কার্য করিতে পারিবে না; আর যে কেহ তোমায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, সে যতই মহৎ ও ভাল হউক না কেন, তাহার সঙ্গ পরিহার করিবে। জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রদায় আছে—যাহাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ—নৃত্য, লম্ফ-ঝম্প ও চীৎকার। তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগের মতো লোকের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। তাহারাও একপ্রকার সম্মোহনকারী। তাহারা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর সাময়িকভাবে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু হায়! পরিণামে সমগ্র জাতিকে একেবারে অধঃপতিত করিয়া দেয়। হাঁ, এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং মন্দ থাকাও অধিকতর সুস্থতার লক্ষণ। এই-সকল দায়িত্বহীন অথচ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিগণ মানুষের যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে যেন হৃদয় দমিয়া যায়। তাহারা জানে না যে, যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গীত-স্তবাদির সহায়তায় নিজেদের শক্তিপ্রভাবে এইরূপ সহসা ভগবদ্ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহারা কেবল নিজ-

দিগকে নিষ্ক্রিয়, বিকৃত ও শক্তিশূন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ যে-কোন ভাবের, এমন কি অসৎ ভাবেরও অধীন হইয়া পড়িবে। এই জন্য, আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও ভাবে না যে, মনুষ্যহৃদয় পরিবর্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া তাহারা যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তখন তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ততা ও মৃত্যুর বীজ বপন করিতেছে। তাহারা মনে করে ঐ ক্ষমতা মেঘের ওপার হইতে কোন দিব্যপুরুষ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন। অতএব যাহা কিছু তোমার স্বাধীনতা নষ্ট করে, এমন সব-কিছু হইতে সাবধানে থাকিবে—জানিবে উহা বিপজ্জনক, প্রাণপণ চেষ্টায় সর্বতোভাবে উহা পরিহার করিবে।

যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে অথবা সেগুলি হইতে সরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ 'একদিকে আহরণ'—মনের বহির্মুখী শক্তি রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হইতে উহা মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে কৃতকার্য হইলে তবেই আমরা ঠিক ঠিক চরিত্রবান্ হইব; তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব; ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যন্ত্রের মতোই জড় পদার্থ।

মনকে সংযত করা কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল—যেমন সব বানর হইয়া থাকে। যেন ঐ স্বাভাবিক অস্থিরতা যথেষ্ট ছিল না, তাই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা মদ খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমরা অবশ্যই জানো, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ঐ বানর-বেচারার দুরবস্থার চূড়ান্ত হইল। পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই এক ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে দুর্দমনীয় চঞ্চলতা দেখা দিল, তাহা কোন ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মনুষ্য-মন ঐ বানরের তুল্য, স্বভাবতই অবিরত ক্রিয়াশীল, আবার বাসনারূপ মদিরাপানে মত্ত হইলে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। যখন বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন অপরের সফলতা-দর্শনে ঈর্ষারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে।

শেষে আবার যখন অহংকাররূপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!

অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোপান—কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেওয়া। মন সদা চঞ্চল। উহা সেই বানরের মতো সর্বদা লাফাইতেছে। মন-বানর যত ইচ্ছা লম্ফ-ঝম্প করুক ক্ষতি নাই; ধীরভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও। লোকে বলে, জ্ঞানই শক্তি—ইহা অতি সত্য কথা। যতক্ষণ না জানিতে পারিবে—মন কি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে সংযত করিতে পারিবে না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। অনেক বীভৎস চিন্তা হয়তো মনে উঠিবে; তোমার মনে এত অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ভাবিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই-সকল খেয়াল প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, তোমার মনে অসংখ্য চিন্তা আসিতেছে, ক্রমশঃ দেখিবে চিন্তা কিছুটা কমিয়াছে, আরও কয়েক মাস পরে আরও কমিয়া গিয়াছে, অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইবে; কিন্তু প্রতিদিনই আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ উহা চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় অনুভব করিতেই হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনের মতো যন্ত্রমাত্র নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইতে হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযত করা এবং উহাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে না দেওয়াই 'প্রত্যাহার'। ইহা অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা খুব কঠিন কাজ, একদিনে হইবার নয়, ধৈর্যের সহিত ক্রমাগত বহু বর্ষ অভ্যাস করিলে কৃতকার্য হওয়া যায়।

কিছুকাল 'প্রত্যাহার' সাধন করিবার পর পরবর্তী সাধন অর্থাৎ 'ধারণা' অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখাই 'ধারণা'। মনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখার অর্থ কি? ইহার অর্থ—মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন একটি বিশেষ অংশ অনুভব করিতে বাধ্য করা; উদাহরণস্বরূপ শরীরের অন্যান্য অবয়ব অনুভব না করিয়া কেবল হাতটি অনুভব করিবার

চেষ্টা কর। যখন চিত্ত অর্থাৎ মন কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ—সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে 'ধারণা' বলে। এই 'ধারণা' নানাবিধ। এই ধারণা-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়ের মধ্যে এক বিন্দুর উপর মনকে 'ধারণা' করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব সহজ উপায় হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহা যেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়! সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তকে সহস্রদল কমল অথবা পূর্বোক্ত সুষুম্নার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতির্ময়রূপে চিন্তা করিবে।

যোগী প্রতিনিয়তই সাধনা অভ্যাস করিবেন। তাঁহাকে নিঃসঙ্গভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে; নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। তাঁহার বেশী কথা বলা উচিত নয়, কারণ বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়। বেশী কাজ করাও ভাল নয়, কারণ বেশী কাজ করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করা যায় না। যিনি এই-সকল নিয়ম পালন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। যোগের এমনই শক্তি যে, অতি অল্পমাত্র সাধন করিলেও মহৎ ফল লাভ করা যায়। ইহাতে কাহারও অনিষ্ট হইবে না, বরং সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে স্থিরতা আসিবে এবং সকল বিষয় আরও স্পষ্টভাবে দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। মেজাজ আরও ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভাল হইবে। যোগ-অভ্যাসকালে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতা সেই প্রথম চিহ্নগুলির অন্যতম। স্বরও সুন্দর মধুর হইবে, স্বরের দোষ বা বৈকল্য চলিয়া যাইবে; প্রথমে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, ইহা তাহাদের অন্যতম। যাঁহারা কঠোর সাধনা করেন, তাঁহাদের আরও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন দূর হইতে যেন ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ শুনা যাইবে—যেন অনেকগুলি ঘণ্টা দূরে বাজিতেছে, এবং সেই-সকল শব্দ একত্র মিলিয়া কর্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ আসিতেছে। কখন কখন নানা বস্তু দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে, ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বড় হইতেছে। যখন এই-সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন জানিও তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ।

যাঁহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং দৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে যত্ন লওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহারা

অন্যান্য দৈনিক কাজের সঙ্গে অল্পস্বল্প অভ্যাস করিতে চায়, তাহাদের বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা ইচ্ছামত খাইতে পারে।

যাঁহারা কঠোর সাধন করিয়া শীঘ্র উন্নতি করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। কয়েক মাস দুধ ও শস্যজাতীয় আহারই তাঁহাদের সাধন-জীবনের সহায়ক হইবে। দেহযন্ত্র উত্তরোত্তর যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই প্রথম প্রথম দেখা যাইবে যে, অতি সামান্য অনিয়মে শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। যতদিন পর্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহারের সামান্য ন্যূনাধিক্য সমগ্র শরীরযন্ত্র বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে, মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর ইচ্ছামত খাইতে পারা যায়।

যখন কেহ মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করে, তখন একটি সামান্য পিন পড়িলে বোধ হইবে যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বজ্র চলিয়া গেল। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি যত সূক্ষ্ম হয়, অনুভূতিও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে। এই-সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যাহারা অধ্যবসায়সহকারে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকার্য হইবে। সর্বপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে কি ফল? উহা কেবল সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে। সূক্ষ্মস্তরের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। কথায় কি তাহা হইবে? অতএব সর্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর। যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি সুন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে,—আকাশে যখন স্বাতীনক্ষত্র উঠিতেছে, তখন যদি বৃষ্টি হয় এবং ঐ বৃষ্টিজলের এক বিন্দু যদি কোন শুক্তির উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহা একটি মুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগুলি ইহা অবগত আছে; সুতরাং ঐ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে তাহারা জলের উপর আসিয়া ঐ সময়কার একবিন্দু মহামূল্য বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর পড়ে, অমনি ঐ জলকণা নিজের ভিতরে লইয়া শুক্তি মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়; সেখানে সহিষ্ণুতাসহকারে

বৃষ্টিবিন্দুকে মুক্তায় পরিণত করিবার সাধনায় মগ্ন হয়। আমাদেরও ঐরূপ করিতে হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে বহির্জগতের প্রভাব ও সর্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকাশ করিবার জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। শুধু নূতনত্বের জন্য একটি ভাব গ্রহণ করিয়া আর একটি নূতন ভাব পাইলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া—এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের শক্তি বৃথা ক্ষয় হইয়া যাইবে। সাধনকালে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই সাধনা কর; উহার শেষ পর্যন্ত দেখ, উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাব লইয়া পাগল হইয়া যাইতে পারেন, তিনিই সত্যের আলো দেখিতে পান। যাহারা এখানে একটু, ওখানে একটু আস্বাদ করিয়া বেড়ায়, তাহারা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্নায়ু একটু উত্তেজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। তাহারা চিরকাল প্রকৃতির দাস হইয়া থাকিবে, কখনই ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যাঁহারা যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় একটু একটু করিয়া আস্বাদ করার ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। একটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদা উহাই চিন্তা করিতে থাকো। ঐ ভাব অনুযায়ী জীবন যাপন কর। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এই ভাবে পূর্ণ হইয়া যাক। অন্য সমুদয় চিন্তা দূরে থাকুক। ইহাই সিদ্ধিলাভের উপায়; এই উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে। বাদ বাকী সকলে তো শুধু কথা কওয়ার যন্ত্রমাত্র। যদি আমরা নিজেরা সত্যই কৃতার্থ হইতে চাই ও অপরের জীবন ধন্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রথম সোপান—মনকে কোনমতে বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাহাদের সঙ্গে কথা বলিলে মনের চঞ্চলতা আসে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা না করা। তোমরা সকলেই জানো যে, কতকগুলি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি ও খাদ্য তোমাদের নিকট বিরক্তিকর। ঐগুলি এড়াইয়া চলিবে। যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে।

খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর। মর বা বাঁচ—কিছুই গ্রাহ্য করিও না। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি খুব নির্ভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা অল্পস্বল্প সাধনা করে, সব বিষয়েরই একটু আধটু চাখে, তাহারা কোনই উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফল হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাদের মন কোন একটি বিষয়ে কখনও স্থির হয় না, যাহারা কেবল একটু আমোদের জন্য কোন কিছু চায়, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন চিত্তবিনোদনেরই উপাদান। ইহারা সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহারা ধর্মকথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ এ তো বেশ! তারপর বাড়ি গিয়া সব ভুলিয়া যায়। সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

ধ্যান ও সমাধি

এতক্ষণ আমরা রাজযোগের সূক্ষ্ম সাধনগুলি ব্যতীত বিভিন্ন সোপান-সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ সাধনগুলির উদ্দেশ্য—একাগ্রতা-সাধন। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করাই রাজযোগের লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজাতির যত কিছু জ্ঞান, সেগুলি সবই সচেতন অহংবুদ্ধির। এই টেবিল ও তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার চেতনা হইতে আমি জানি, টেবিলটি এখানে রহিয়াছে এবং তুমিও এখানে আছ। আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, আমার সত্তার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে পারি না। শরীরের ভিতর বিভিন্ন যন্ত্র, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান নাই।

যখন আহার করি, তখন তাহা জ্ঞানপূর্বক করি; কিন্তু যখন উহা পরিপাক করি, তখন অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি। খাদ্য যখন রক্তে পরিণত হয়, তখনও অজ্ঞাতসারেই ঐ ক্রিয়া হইয়া থাকে। আবার যখন ঐ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ শক্ত-সবল হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলি আমা-দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। এই শরীরের মধ্যে তো আর বিশটি লোক নাই যে, তাহারা ঐ কাজগুলি করিতেছে। কিন্তু কি করিয়া জানিতে পারি যে, আমিই ঐগুলি করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ-বিষয়ে তো জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, আহার ও পরিপাক করা আমার কাজ; খাদ্য হইতে শক্ত-সবল শরীর গঠন করার কাজ আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে—ইহা হইতে পারে না; কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে-সকল কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, ঐগুলির প্রায় সবই সাধন-বলে আমাদের চেতনভূমিতে আনা যাইতে পারে। আপাততঃ মনে হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, উহা নিজের গতিতে চলিতেছে। কিন্তু অভ্যাস-বলে এই হৃদ্‌যন্ত্রকেও এরূপ বশে আনা যাইতে পারে যে, আমাদের ইচ্ছা অনুসারে উহা শীঘ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরের প্রায় প্রত্যেক অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে

পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যায় যে, এখন যে-সকল ক্রিয়া অবচেতনভাবে হইতেছে, সেগুলিও আমরাই করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্য-মন দুই স্তরে কাজ করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে সজ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে, এখানে সকল কাজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, আর একটি ভূমির নাম নির্জ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি) বলা যাইতে পারে, এখানকার কাজের সহিত 'আমি'-বোধ থাকে না।

আমাদের মানস কার্যকলাপের যে অংশে 'অহং'ভাব থাকে না, তাহা অজ্ঞানভূমির ক্রিয়া, আর যে অংশে অহং-ভাব থাকে, তাহা জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া। নিম্নজাতীয় জীবজন্তুতে এই অজ্ঞানভূমির কার্যগুলিকে সহজাতবৃত্তি (instinct) বলে। উচ্চতর জীবে ও উচ্চতম জীব মনুষ্যে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াই প্রবল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে মন কার্য করিতে পারে। মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞানভূমিতে কৃত কার্য যেমন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে ঘটে, ঠিক সেইরূপ আর একপ্রকার কাজ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হইয়া থাকে। উহাতেও কোনরূপ অহং-ভাব থাকে না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে। যখন মন এই স্তরের উর্ধ্বে বা নিম্নে থাকে, তখন আমি-রূপ কোন বোধ থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন মন এই অহংবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন তাহাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলে। সমাধি-অবস্থায় মানুষ সজ্ঞানভূমির নিম্নস্তরে চলিয়া যায় নাই, অবনত হইয়া যায় নাই—ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? এই দুই অবস্থার কাজই অহংভাবশূন্য। ইহার উত্তর এই—ফল দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে, কে সজ্ঞানভূমির নিম্নে আর কেই বা উর্ধ্বে। যখন কেহ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন সজ্ঞান-ভূমির নিম্নে অবচেতন ভূমিতে চলিয়া যায়। তখনও তাহার শরীরের সমুদয় ক্রিয়া চলিতে থাকে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস লয়, এমন কি নিদ্রার মধ্যে শরীর-সঞ্চালনও করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার এই-সকল কার্যে অহংভাবের কোন সংস্রব থাকে না, তখন তাহার চেতনা থাকে না; নিদ্রা হইতে যখন উত্থিত হয়, তখন সে যে-মানুষ ছিল, সেই মানুষই থাকিয়া যায়। নিদ্রা যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই

থাকে; উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়—মূর্খও যদি সমাধিস্থ হয়—সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।

এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আসিল; আর এক অবস্থা হইতে মানুষ জ্ঞানী হইয়া ফিরিল—এক সাধু-মহাপুরুষে পরিণত হইল, তাহার স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার জীবনও রূপান্তরিত হইয়া গেল, সে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল। এই তো দুই অবস্থার বিভিন্ন ফল। ফল যখন ভিন্ন, তখন কারণও অবশ্যই ভিন্ন হইবে। সমাধি-অবস্থায় লব্ধ এই জ্ঞানালোক যেহেতু নির্জ্ঞান-অবস্থার অনুভূতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, বা জ্ঞানভূমিতে যুক্তি-বিচারলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, তখন উহা অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আসিতেছে। সেইজন্যই সমাধি 'জ্ঞানাতীত অবস্থা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই সমাধিতত্ত্ব। এই সমাধির কার্যকারিতা কি? এখানেই ইহার কার্যকারিতা। আমরা জ্ঞাতসারে যে-সকল কর্ম করিয়া থাকি, যাহাকে বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্র বলা যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই মানুষের বিচারবুদ্ধি নড়া-চড়া করিতে বাধ্য, তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। উহার বাহিরে যাইবার সামান্য চেষ্টাও অসম্ভব। অথচ মানুষ যাহা অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহা ঐ যুক্তিবিচারের বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি-না, ঈশ্বর আছেন কি-না, এই জগতের নিয়ন্তা পরমচৈতন্যস্বরূপ কেহ আছেন কি-না—এ-সকল প্রশ্ন যুক্তির এলাকার বাহিরে। যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলে: আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি 'হাঁ' বা 'না' কিছুই জানি না। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর না পাইলে মানবজীবন উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে। আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সর্ববিধ মনোভাব, মনুষ্য-স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও ভাল, সে-সবই যুক্তিরাজ্যের বাহির হইতে যে উত্তর আসে, তাহা দ্বারা গঠিত হয়। অতএব এই-সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। জীবন যদি শুধু একটি নাটিকা হয়, বিশ্বজগৎ

যদি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক মিলনমাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের উপকার কেন করিব? দয়া, ন্যায়পরতা অথবা সহানুভূতির প্রয়োজন কি? তবে তো সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লও—এই নীতিই এ পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট হইত। যদি আশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রাতার গলা না কাটিয়া তাহাকে ভালবাসিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত কোন সত্তা না থাকে, যদি মুক্তি বলিয়া কিছু না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর প্রাণহীন নিয়মই সব হইয়া পড়ে, তবে তো যাহাতে ইহলোকে সুখী হইতে পারি, শুধু তাহারই চেষ্টা করিব। আজকাল দেখা যায় অনেকে বলে, তাহাদের নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility)। এই নীতির ভিত্তি কি? সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা—কেন এরূপ করিব? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব না কেন? হিতবাদিগণ (Utilitarians) এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি আমার সুখের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহার তৃপ্তিসাধন করিলাম, উহা আমার স্বভাব, উহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। আমার এইসব বাসনা আছে, আমি এগুলি পূর্ণ করিব, তোমার আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে? নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সর্বোপরি নিঃস্বার্থতা—মনুষ্যজীবনের এই-সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি কোথা হইতে আসিল?

সমুদয় নীতি-শাস্ত্র. মানুষের সকল কাজকর্ম ও চিন্তা এই নিঃস্বার্থতারূপ একটি মাত্র ভাবের উপর নির্ভর করে, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, নিঃস্বার্থতা এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। কেন আমরা স্বার্থশূন্য হইব? নিঃস্বার্থ হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? শক্তি ও প্রেরণাই বা কোথায়? তুমি নিজেকে যুক্তিবাদী—হিতবাদী বলিয়া থাকো; কিন্তু তুমি যদি হিতসাধন করিবার যুক্তি দেখাইতে না পারো, তাহা হইলে আমি তোমাকে অযৌক্তিক বলিব। আমি কেন স্বার্থপর হইব না, তাহার যুক্তি দেখাও। অবশ্য কবিত্ব হিসাবে নিঃস্বার্থতা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তো যুক্তি নয়। আমাকে যুক্তি দেখাও; কেন আমি নিঃস্বার্থ হইব, কেন আমি সৎ হইব? অমুক এই কথা বলে,

এরূপ কথার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার উপযোগিতা কোথায়? 'হিত' বলিতে যদি 'অধিকতম সুখ' বুঝায়, তবে স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে হিত। ইহার কি উত্তর? হিতবাদিগণ ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহার উত্তর—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অনন্ত সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু, অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র শিকলি। যাঁহারা নিঃস্বার্থতা প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? আমরা জানি, ইহা সহজাত বৃত্তি নয়। সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন পশুগণ ইহা জানে না, বিচার বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়া যায় না, যুক্তিদ্বারা এই-সকল তত্ত্বের কিছুমাত্র জানা যায় না। তবে ঐ-সকল তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল?

ইতিহাস-পাঠে দেখিতে পাই, জগতের মহান্ ধর্মাচার্যগণ সকলেই একটি তথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, জগতের বাহির হইতে তাঁহারা এই সত্য লাভ করিয়াছেন, তবে তাঁহারা অনেকেই জানেন না, এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইয়াছেন। কেহ হয়তো বলিলেন, এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকারে আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'ওহে মানব, শোন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর'। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন, স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্বলাভের কথা বলিলেও ইহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা উহা লাভ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে যোগশাস্ত্র কি বলে? যোগশাস্ত্র বলে, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা যে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ-কথা ঠিক। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান আসিয়াছে।

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা আছে, যাহা যুক্তি-বিচারের ঊর্ধ্বে—জ্ঞানাতীত অবস্থা। এই উচ্চাবস্থায় পৌঁছিলে মানব তর্কের অতীত এই জ্ঞান লাভ করে—বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করে। যুক্তি-বিচারের অতীত অবস্থা লাভ করা,

সাধারণ মানবীয় স্বভাব অতিক্রম করা—কখন কখন মানুষের জীবনে অতর্কিতে সম্ভব হইতে পারে, সে ব্যক্তি এ ঘটনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে ; সে যেন হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ করে ; ঐরূপে হঠাৎ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলাভ হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, ঐ জ্ঞান বাহির হইতে আসিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই দিব্যপ্রেরণা—পারমার্থিক জ্ঞান বিভিন্ন দেশে একই প্রকারের হইতে পারে ; কোন দেশে মনে হইবে দেবদূত হইতে আসিয়াছে, কোন দেশে দেববিশেষ হইতে, আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ মন নিজ স্বভাব অনুযায়ী নিজের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যিনি উহা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে ঐ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইহারা সকলেই ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন।

যোগীরা বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোর বিপদের আশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝেন নাই, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত সাধারণতঃ কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া যায়। তাঁহারা অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন।

* * *

যাহা হউক, আমরা অনেক মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, সমাধিলাভের পথে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-কোন ভাবেই হউক, ঐ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। যখনই কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবোচ্ছ্বাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছুটা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহাতে দেখা দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষার মহত্ত্ব যারা যেমন জগতের উপকার হইয়াছে, ঐ কুসংস্কারাদির দ্বারা তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে।

অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনুষ্যজীবনে কিছু সামঞ্জস্য ও যুক্তি দেখিতে হইলে আমাদিগকে সাধারণ যুক্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিকভাবে ধীরে ধীরে নিয়মিত সাধনাদ্বারা করিতে হইবে এবং সমুদয় কুসংস্কার বিসর্জন দিতে হইবে। অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, সমাধিতত্ত্ব-শিক্ষার সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যুক্তির উপরই আমাদের ভিত্তিস্থাপন করিতে হইবে, যুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া যায় ততদূর যাইতে হইবে; যুক্তি যখন আর চলিবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট' অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ এই তিন অবস্থা—সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা অথবা নির্জ্ঞান, সজ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—একই মনের অবস্থাবিশেষ। একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্তু মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত অবস্থায় পরিণত হয়; সুতরাং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী নয়। প্রকৃত প্রেরণা যুক্তিবিরোধী নয়—বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন করে। ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, 'আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'—সেইরূপ প্রেরণাও যুক্তিকে পরিপূর্ণ করে, যুক্তির সহিত উহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্যই যোগের বিভিন্ন সোপানগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু এটি বুঝা বিশেষ আবশ্যক যে, এই অতীন্দ্রিয় প্রেরণালাভের শক্তি প্রাচীন মহাপুরুষগণের ন্যায় প্রত্যেক মানুষের স্বভাবেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণ পৃথক্—অতুলনীয় কিছু ছিলেন না, তাঁহারা তোমার আমার মতোই মানুষ ছিলেন। তাঁহারা উচ্চাঙ্গের যোগী ছিলেন এবং এই জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। চেষ্টা করিলে তুমি-আমিও উহা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা কোন বিশেষ-প্রকারের অদ্ভুত লোক ছিলেন না। একজন ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন—এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব তাহা নয়, সকলকেই কালে এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে, এবং ইহাই ধর্ম।

অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। আমরা সারা জীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজেরা প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্র বুঝিতে পারিব না। কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া আমার দেশ দেখিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই। শুধু পুস্তকের উপর নির্ভরতা মানুষের মনকে অবনতির দিকেই লইয়া যায়। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা ঐ শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ—এরূপ বলা অপেক্ষা ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা আর কি হইতে পারে? মানুষ ভগবান্‌কে অনন্ত বলে, আবার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের গণ্ডিতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায়!—কি তাহার স্পর্ধা! কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থে যাহা আছে, তাহা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া, 'একখানি গ্রন্থের মধ্যে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ' ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অবশ্য এই নিধনের ও হত্যার যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জগৎ এখনও ধর্মগ্রন্থে অন্ধবিশ্বাস দ্বারা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে তোমাদিগকে রাজযোগ-বিষয়ে যে-সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার বিভিন্ন সোপান দিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যাহার ও ধারণার পর, এখন ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব। দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাখিতে পারিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ঐ দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ করিবে। এই অবস্থার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় যে, সাধক অনুভবের বহির্ভাগ বর্জন করিয়া শুধু উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ অর্থের ধ্যানই করেন, তখন সেই অবস্থার নাম 'সমাধি'। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটিকে একত্র 'সংযম' বলে; অর্থাৎ প্রথমতঃ যদি কেহ কোন বস্তুর উপর মন একাগ্র করিতে পারে, পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ একাগ্রতার ভাব রক্ষা করিতে পারে, অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা, যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে ঐ বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, যদি শুধু তাহারই উপর মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সবকিছুই এইরূপ মনের বশীভূত হইয়া যায়।

এই ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা। যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ যথার্থ সুখ সম্ভব নয়, কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষিরূপে সব কিছু পর্যালোচনা করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটই জগৎ যথার্থ সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। যাঁহার বাসনা নাই, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিপ্ত করেন না, তাঁহার নিকট প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্তন সুন্দর ও মহান্ ভাবের এক অফুরন্ত চিত্রপট!

ধ্যানে এই তত্ত্বগুলি বুঝিতে হইবে। মনে কর, একটি শব্দ শুনিলাম। প্রথমে বাহিরে একটি কম্পন উঠিল, তারপর স্নায়বীয় গতি উহাকে মনের কাছে লইয়া গেল, পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উদিত হইল; এই বাহ্যবস্তুটিই ইথারে কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কারণ। যোগশাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় ঐগুলিকে ইথারের কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ঐগুলির প্রভেদ অতি অস্পষ্ট। বাস্তবিক আমরা এখন ঐ তিনটির কোনটিকেই অনুভব করিতে পারি না, উহাদের সম্মিলিত ফল অনুভব করি এবং সেটিকেই বাহ্যবস্তু বলি। প্রত্যেক অনুভবক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে; উহাদিগকে পৃথক্ করিতে না পারার কোন কারণ নাই।

প্রাথমিক প্রস্তুতি দ্বারা যখন মন দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সূক্ষ্মতর অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য। প্রথমতঃ স্থূল বস্তু লইয়া ধ্যান করিতে হইবে। পরে ক্রমশঃ ধ্যান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, শেষে বিষয়শূন্য ধ্যানে পরিণত হইবে। মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি, পরে স্নায়ুমধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। মন যখন বেদনা বা অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় সূক্ষ্ম-জড় পদার্থ, সমুদয় সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা হইবে। মন যখন আভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে,

তখন নিজের ও অপরের মানসিক তরঙ্গগুলি জড়-শক্তিরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই মন ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। যখন মন মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে পৃথক্‌ভাবে অনুভব করিবে, তখন যোগী সব কিছুর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন; কারণ অনুভবযোগ্য প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি চিন্তা এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিবে। যোগীর তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ হয়; যদি তিনি এই-সকল শক্তির কোন একটি দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়। কিন্তু যদি এই-সকল অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুদ্রে বৃত্তি-তরঙ্গ সম্পূর্ণ নিরোধ-করা-রূপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও শরীরের নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে। তখন যোগী তাঁহার শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন—তিনি জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও সর্বব্যাপী।

এই সমাধিতে প্রত্যেক মানুষের, এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর অধিকার আছে। নিম্নতম জীবজন্তু হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন সময়ে এই অবস্থা লাভ করিবে; যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই তাহার প্রকৃত ধর্ম আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা শুধু ঐ অবস্থার দিকে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি। যাহাদের কোন ধর্ম নাই, তাহাদের সহিত আমাদের এখন কোন প্রভেদ নাই, কারণ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদেরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপনীত করা ব্যতীত এই একাগ্রতা-সাধনের কি প্রয়োজন? এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেকটি সাধন-সোপান যুক্তিপূর্বক বিচার করা হইয়াছে, যথাযথভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক সাধন করা হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে। তখন সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে, সকল যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইবে, কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে।

সংক্ষেপে রাজযোগ

কূর্মপুরাণ[১] হইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়া রাজযোগের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যোগাগ্নি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে; তখন চিত্তশুদ্ধি হয়, সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানও আবার যোগীকে সাহায্য করে। যাঁহার মধ্যে যোগ ও জ্ঞান সমন্বিত, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। যাঁহারা প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদাসর্বদা 'মহাযোগ' অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। যোগ দুই প্রকার—একটিকে বলে অভাব, অন্যটি মহাযোগ। যখন নিজেকে শূন্য ও সর্বপ্রকার গুণবিরহিতরূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 'অভাবযোগ' বলে। যে যোগে আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা হয়, তাহাকে 'মহাযোগ' বলে। যোগী প্রত্যেকটি দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন। আমরা অন্যান্য যে-সব যোগের কথা শাস্ত্রে পাঠ করি বা শুনিতে পাই, সে-সব যোগ এই মহাযোগের সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। এই মহাযোগে যোগী নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অনুভব করেন। ইহাই সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

রাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। উহাদের মধ্যে যম বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। এই যম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করাকে 'অহিংসা' বলে। অহিংসা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব হইতে মানুষ যে সুখ লাভ করে, তদপেক্ষা উচ্চতর সুখ আর নাই। সত্য দ্বারাই আমরা কর্মের ফল লাভ করি, সত্যের ভিতর দিয়াই সবকিছু পাওয়া যায়। সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ কথনকেই 'সত্য' বলে। চৌর্য বা বলপূর্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করার

---

১ কূর্মপুরাণ, উপবিভাগ, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাম 'অস্তেয়'। কায়মনোবাক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা করার নামই 'ব্রহ্মচর্য'। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে 'অপরিগ্রহ' বলে। অপরিগ্রহ-সাধনের উদ্দেশ্য এই—কাহারও নিকট কিছু লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়; গ্রহীতা হীন হইয়া যান, নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলেন, এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়েন।

তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই কয়েকটিকে 'নিয়ম' বলে। নিয়ম-শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত-পালন। উপবাস বা অন্য উপায়ে দেহ-সংযমকে 'শারীরিক তপস্যা' বলে।

বেদপাঠ অথবা অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ, যাহাদ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয়, তাহাকে 'স্বাধ্যায়' বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক জপ সর্বনিম্নে এবং মানস জপ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে জপ এত উচ্চস্বরে করা হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে 'বাচিক' বলে। যে জপে কেবল ওষ্ঠে স্পন্দনমাত্র হয়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না, তাহাকে 'উপাংশু' বলে। যে মন্ত্রজপে কোন শব্দ শোনা যায় না, জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাহাকে 'মানস জপ' বলে। উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে 'বাহ্য শৌচ' বলে; যথা স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মানুশীলন দ্বারা মনের শুদ্ধিকে 'আভ্যন্তর শৌচ' বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর—উভয় শুদ্ধিই আবশ্যক। কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়া বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল না। যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না।

ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ ভক্তির নাম 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। তারপর 'আসন'। আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর প্রাণায়াম। 'প্রাণ' শব্দের অর্থ—নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, এবং 'আয়াম' শব্দের অর্থ—উহার

সংযম বা নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম তিন প্রকার—অধম, মধ্যম ও উত্তম। প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করা যায়, তাহাকে 'অধম প্রাণায়াম' বলে। ২৪ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে 'মধ্যম প্রাণায়াম' ও ৩৬ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে তাহাকে 'উত্তম প্রাণায়াম' বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম ও মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন হয়; উত্তম প্রাণায়ামে শরীর লঘু হইয়া আসন হইতে উত্থিত হয় এবং ভিতরে পরম আনন্দ অনুভূত হয়।

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে, উহা বেদের অতি পবিত্র মন্ত্র। উহার অর্থ: 'আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়া দিন।' এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়ামের সময় মনে মনে তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথা—রেচক (বাহিরে শ্বাসত্যাগ), পূরক (শ্বাসগ্রহণ) ও কুম্ভক (ভিতরে ধারণ করা, সুস্থির রাখা)। অনুভূতির যন্ত্র ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ হইয়া কার্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসিতেছে ঐগুলিকে ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনাকে 'প্রত্যাহার' বলে, অথবা নিজেরদিকে সংগ্রহ বা আহরণ করাই প্রত্যাহার-শব্দের অর্থ।

হৃদ্-পদ্মে, মস্তকের কেন্দ্রে বা দেহের অন্য স্থানে মনকে স্থির করার নাম 'ধারণা'। মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া, সেই স্থানটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এক বিশেষ প্রকার বৃত্তিতরঙ্গ উত্থিত করা যাইতে পারে। অন্য প্রকার তরঙ্গ এগুলিকে গ্রাস করিতে পারে না, পরন্তু ধীরে ধীরে এগুলিই প্রবল হয়। অন্যগুলি দূরে সরিয়া যায়—শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। অবশেষে এই বহু-বৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে; ইহাকে 'ধ্যান' বলে। যখন কোন অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, মনের সেই একরূপতার নাম 'সমাধি'। তখন কোন বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত হয় না, কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন কেন্দ্রে ১২ সেকেণ্ড স্থির করা যায়, তাহাতে একটি 'ধারণা' হইবে; এইরূপ ১২টি ধারণা হইলে একটি 'ধ্যান' এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে একটি 'সমাধি' হইবে।

যেখানে অগ্নি আছে, জলে, শুষ্কপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বল্মীকপূর্ণ স্থানে, বন্যজন্তুসমাকুল বনে, যেখানে বিপদাশঙ্কা আছে এমন স্থানে, চতুষ্পথে, অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অথবা যেখানে বহু দুর্জনের বাস, সে-স্থানে যোগ সাধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য। যখন শরীর অতিশয় ক্লান্ত বা অসুস্থ বোধ হয়, অথবা মন যখন অতিশয় দুঃখপূর্ণ ও বিষণ্ণ থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি সুগুপ্ত ও নির্জন স্থানে, যেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না এমন স্থানে গিয়া সাধন কর। অশুচি স্থান নির্বাচন করিও না, বরং সুন্দর দৃশ্যযুক্ত স্থানে অথবা তোমার নিজগৃহে একটি সুন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। প্রথমেই প্রাচীন যোগিগণকে তোমার নিজ গুরু ও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখো। ক্রমশঃ আমরা জানিব, কিভাবে ইহাদ্বারা মন একাগ্র হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা আয়ত্তে আনা যায়, এইভাবে উহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তিও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এইবার কয়েক প্রকার ধ্যানের কথা বলা যাইতেছে। কল্পনা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার কেন্দ্র, জ্ঞান উহার মৃণাল, যোগীর অষ্টসিদ্ধি ঐ পদ্মের অষ্টদল, আর বৈরাগ্য উহার অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকা। যদি যোগী বাহিরের শক্তি (অষ্টসিদ্ধি) পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বাহিরের অষ্টদলরূপে এবং অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের অভ্যন্তরে—হিরণ্ময়, সর্বশক্তিমান্, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে। চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর ঐ আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; ঐ শিখাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তা কর, আবার ঐ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আলোকের চিন্তা কর; উহা তোমার আত্মার আত্মা—পরমাত্মা, ঈশ্বর। হৃদয়ে এই

ভাবটি ধ্যান কর। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা অর্থাৎ সকলকে—এমন কি মহাশত্রুকেও ক্ষমা করা, সত্য, আস্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্রতস্বরূপ। ইহাদের সবগুলিতেই যদি তুমি সিদ্ধ হইতে না পারো, তাহা হইলে দুঃখিত বা ভীত হইও না। চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই আসিবে। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভগবানে তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহারই শরণাগত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহা কিছু চান, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, ভক্তি অথবা বৈরাগ্যযোগে উপাসনা কর।

'যিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যাঁহার নিজস্ব বলিতে কিছু নাই, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ধৈর্যশীল, যিনি অহঙ্কারমুক্ত হইয়াছেন, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগ-যুক্ত হইয়া কর্ম করেন, যতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয়, যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, ক্রোধ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না, যিনি শুচি, দক্ষ, সুখদুঃখে উদাসীন, যাঁহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিজের জন্য, সকল কর্মচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহশূন্য—যাঁহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই যাঁহার গৃহ, যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই আমার ভক্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী হইতে পারেন।'[১]

* * *

নারদ নামে এক মহান্ দেবর্ষি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে ঋষি অর্থাৎ বড় বড় যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সেখানে দেখিলেন একজন লোক ধ্যান করিতেছে; সে এত গভীরভাবে

১ গীতা, ১২।১৩-১৯

ধ্যান করিতেছে, এত দীর্ঘকাল একাসনে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বল্মীক-স্তূপ নির্মিত হইয়া গিয়াছে। সে নারদকে বলিল, 'প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন?' নারদ উত্তর করিলেন, 'বৈকুণ্ঠে যাইতেছি।' তখন সে বলিল, 'ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি কবে আমায় কৃপা করিবেন, কবে আমি মুক্তিলাভ করিব।' আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। সে ব্যক্তি লম্ফ-ঝম্প নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল, সেও বলিল, 'ও নারদ, কোথায় চলেছ?' তার কণ্ঠস্বর ও ভাব-ভঙ্গি পাগলের মতো। নারদ তাহাকেও বলিলেন, 'স্বর্গে যাইতেছি।' সে বলিল, 'তা-হ'লে ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কবে মুক্ত হবো।' নারদ চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নারদ আবার সেই পথে যাইবার সময় বল্মীক-স্তূপ-মধ্যে ধ্যানস্থ সেই যোগীকে দেখিতে পাইলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবর্ষে, আপনি কি আমার কথা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?' 'হাঁ, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।' 'তিনি কি বলিলেন?' নারদ উত্তর দিলেন, 'ভগবান্ বলিলেন—মুক্তি পাইতে তোমার আরও চার জন্ম লাগিবে।' তখন সেই ব্যক্তি বিলাপ ও আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে বল্মীক-স্তূপ হইয়া গিয়াছে, এখনও আমার চার জন্ম অবশিষ্ট!' নারদ তখন অপর ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?' নারদ বলিলেন, 'হাঁ, এই তোমার সম্মুখে তেঁতুল গাছ দেখিতেছ? এই গাছে যত পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তবে তুমি মুক্তিলাভ করিবে।' এই কথা শুনিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, 'এত অল্প সময়ে মুক্তিলাভ ক'রব!' তখন এক দৈববাণী হইল, 'বৎস, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাভ করিবে।' সে ব্যক্তি এইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার ঐ পুরস্কারলাভ হইল। সে ব্যক্তি বহু জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুই তাহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ প্রথম ব্যক্তি চার জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। যে ব্যক্তি মুক্তির জন্য শত শত যুগ অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার ন্যায় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

উপক্রমণিকা

যোগসূত্র-ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোগীদের সমগ্র ধর্মমত যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, আমি সেই বিরাট প্রশ্নটির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ সকলেই এ-বিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, আর জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক নির্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বরূপ; আবার সেই নির্বিশেষভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই—উক্ত নির্বিশেষ অবস্থা উচ্চতর, না বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যিনি মনে করেন এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা। অনেক শক্তিমান্ মনীষীর মত, আমরা এক নির্বিশেষ সত্তার ব্যক্তভাব, এবং নির্বিশেষ অবস্থা অপেক্ষা এই সবিশেষ অবস্থা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা মনে করেন, নির্বিশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে পারে না, সুতরাং উহা নিশ্চয়ই অচৈতন্য, জড় ও প্রাণশূন্য। তাঁহারা আরও মনে করেন, এই জীবনেই কেবল সুখভোগ সম্ভব, সুতরাং ইহাতেই আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত। প্রথমেই আমরা অনুসন্ধান করিতে চাই, জীবন-সমস্যার আর কি কি সমাধান আছে? এ সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ পূর্বের মতোই থাকে, তবে তাহার অশুভগুলি থাকে না, কেবল যেগুলি ভাল, সেগুলি সবই চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। যুক্তি বা ন্যায়ের ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, মানুষের লক্ষ্য এই জগৎ। এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা এবং ইহার মন্দ অংশ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে। এই মতটি যে অসম্ভব ও বালজনোচিত তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়; কারণ এরূপ হইতে পারে না। ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, বা মন্দ নাই অথচ ভাল আছে—এরূপ হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল—এরূপ জগতে বাস করার কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ 'আকাশ-কুসুম' বলিয়া বর্ণনা করেন। আধুনিককালে আর একটি মত অনেক সম্প্রদায় কর্তৃক

উপস্থাপিত হয়, তাহা এই—মানুষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনও সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে না, ইহাই মানুষের নিয়তি। এই মতও আপাততঃ অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইলেও অসম্ভব, কারণ সরল রেখায় কোন গতি হইতে পারে না। সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ কর, তারপর যদি তুমি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকো ও প্রস্তরটি কোন বাধা না পায়, তবে উহা ঠিক তোমার হাতে ফিরিয়া আসিবে। একটি সরল রেখাকে অসীমভাবে বর্ধিত করা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত হইয়া শেষ হইবে। অতএব মানুষ ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, কখনও থামে না—এইরূপ মত অসম্ভব। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি মন্তব্য করিতে পারি, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, সকলকে ভালবাসিও'—নীতিশাস্ত্রের এই মতবাদটি পূর্বোক্ত মতদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। যেমন তড়িৎ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, ঐ শক্তি বিদ্যুদাধার-যন্ত্র (dynamo) হইতে বহির্গত হইয়া আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ঘৃণা ও ভালবাসা ঠিক সেইরূপ। সমুদয় শক্তিই আবার উৎসমুখে ফিরিয়া আসিবে। অতএব কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কারণ যে ঘৃণা তোমা হইতে বহির্গত হয়, তাহা কালে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। যদি তুমি ভালোবাসো, তবে সেই ভালবাসাও তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। ইহা অতি নিশ্চিত যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে ঘৃণা বহির্গত হয়, তাহার অণুপরমাণু ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে। কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। একইভাবে ভালবাসার প্রতিটি স্পন্দনও ফিরিয়া আসিবে।

'অনন্ত উন্নতি'-সম্বন্ধীয় মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, তাহা আরও অন্যান্য প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে—বিনাশই পার্থিব সকল বস্তুর চরম গতি, অতএব অনন্ত উন্নতির মতটি কোনমতেই টিকিতে পারে না। আমাদের নানাপ্রকার চেষ্টা, আমাদের এই সব আশা, এত ভয়, এত সুখ—এ-সবের পরিণাম কি? মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম পরিণাম। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর কিছুই নাই। তবে এই সরল রেখায় গতির কি হইল? অনন্ত উন্নতির

কি হইল ?—কিছুদূর যাওয়া, আবার যেখান হইতে গতি আরম্ভ হইয়াছিল সেই স্থানে ফিরিয়া আসা। দেখ—নীহারিকা (nebulæ) হইতে সূর্য, চন্দ্র, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পরে নীহারিকাতেই ফিরিয়া আসিতেছে। সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, আবার যখন সংগঠন ভাঙিয়া যায়, তখন মাটিতেই সব ফিরাইয়া দিতেছে। যাহা কিছু আকার পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার সেই পরমাণুতেই ফিরিয়া যাইতেছে।

একই নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে কার্য করিবে, তাহা হইতে পারে না। নিয়ম সর্বত্রই একরূপ। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই নাই। ইহা যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতেও এ নিয়ম খাটিবে। চিন্তা ইহার উৎপত্তি-স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে—পরমসত্তা ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাঁহাকে যে নামেই ডাকো না কেন—তাঁহাকে 'গড' বা ঈশ্বর বলো, নির্বিশেষ বা পরম সত্তা বলো, আর প্রকৃতিই বলো, উহা সেই একই বস্তু। 'যাঁহা হইতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমুদয় প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও যাঁহাতে আবার সব কিছু ফিরিয়া যাইবে।'[১] ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে কার্য করিয়া থাকে। এক স্তরে যে কার্য হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ স্তরেও তাহাই পুনরাবর্তিত হয়। গ্রহসমূহে যাহা দেখিতে পাও, এই পৃথিবীতে—সকল মনুষ্যে ও সর্বত্র সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। বৃহৎ তরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু তরঙ্গের এক মহাসমষ্টি মাত্র। জগতের জীবন বলিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবনের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। আর জগতের মৃত্যু বলিতে এই-সকল লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবের মৃত্যুই বুঝায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কি না ? যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, 'হাঁ, উহা

---

১ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—তৈত্তি. উপ., ৩।১

উচ্চাবস্থা।' তাঁহারা বলেন, 'মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত অবস্থা।' জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা বলে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহার নীচে সে আর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকে, বৃত্ত-গতি সম্পূর্ণ করিয়া সে পূর্ব স্থানে উপনীত হয়। বৃত্তাকারে গতি পূর্ণ করিতেই হইবে। মানুষ যত নীচেই নামিয়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে উর্ধ্বগতি লাভ করিয়া আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মানুষ প্রথমে ভগবান্ হইতে আসে, মধ্যে সে মনুষ্যরূপ লাভ করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বৈতবাদের ভাষায় তত্ত্বটি এইভাবেই বলা হয়। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়ঃ মানুষই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মভাবে ফিরিয়া যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপারসকল রহিয়াছে কেন? আর ইহার অন্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার শেষ হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেটি কখনও সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে পারে না। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন—এত অতৃপ্তিকর কেন? এই-বিষয়ে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটি উচ্চতর পথে উঠিতেছি। নবজীবন লাভ করিবার জন্যই এই অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া দাও, উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া কিছুকাল পরে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট অবস্থা হইতে এক মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ঐ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই 'মানব'-সংজ্ঞক অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। তবে কি আত্মহত্যা করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করিব? কখনই নয়। উহাতে বরং আরও অনিষ্ট হইবে। শরীরকে অনর্থক পীড়া দেওয়া, অথবা জগৎকে গালাগালি দেওয়া ইহার বাহিরে যাওয়ার উপায় নয়। আমাদিগকে নৈরাশ্যের পঙ্কিল হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; আর যত শীঘ্র ইহা

অতিক্রম করিতে পারি—ততই মঙ্গল। কিন্তু এটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই মনুষ্য-অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নয়।

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্তবিক কঠিন যে, যে নির্বিশেষ অবস্থাকে সর্বোচ্চ অবস্থা বলা হয়, তাহা অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করেন—প্রস্তর বা স্পঞ্জ প্রভৃতির অবস্থার মতো নয়। তাঁহাদের মতে জগতে মাত্র দুই প্রকার অস্তিত্ব আছে—এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট। অস্তিত্বকে এই দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিবার কি অধিকার তাঁহাদের আছে? চিন্তা হইতে অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি মৃদু হইলে আমরা দেখিতে পাই না, যখন ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় —তখনই আমাদের চক্ষে উহা আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। যখন আরও তীব্র হয়, তখনও আমরা উহা দেখিতে পাই না, উহা আমাদের চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকার কি ঐ প্রথমোক্ত অন্ধকারেরই মতো? নিশ্চয়ই নয়। উহারা দুই মেরুপ্রান্তের ন্যায় ভিন্ন। প্রস্তরের চিন্তাশূন্যতা ও ভগবানের চিন্তাশূন্যতা কি একই প্রকারের? কখনই নয়। ভগবান্ চিন্তা করেন না; বিচার করেন না। কেন করিবেন? তাঁহার নিকট কি কিছু অজ্ঞাত আছে যে তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে পারে না, আর ঈশ্বর বিচার করেন না—এই পার্থক্য। পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা মনে করেন যে, চিন্তার বাহিরে যাওয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার, তাঁহারা চিন্তার অতীত কিছু খুঁজিয়া পান না।

যুক্তি-বিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি—সমুদয় অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, তখনই তুমি ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের প্রকৃত আরম্ভ। যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলা হয়, তাহা প্রকৃত জীবনের ভ্রূণাবস্থা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ— যাহারা কেবল বাক্য-ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তিগণ —নিজ শক্তিবলে যাঁহারা সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, যাঁহাদের

চিন্তায় স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না, তাঁহারা সকলেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, এই জীবন সেই অনন্তস্বরূপে পৌঁছিবার পথে একটি ছোট সোপান মাত্র। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা কেবল এইরূপ বলেন, তাহা নয়, পরন্তু তাঁহারা সকলকেই সেই পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের সাধন-প্রণালী বুঝাইয়া দেন, যাহাতে সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ আর কোন পথ নাই। জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? কোন্ যুক্তি দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা হইয়া থাকিবে। ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাঁহাকেই যথার্থ অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে শূন্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা কোথাও দাঁড়াইতে পারি না। কেবল অর্থ, যশ, নামের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অপর সব বিষয়ে যদি কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট (Kant) নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথা: আমরা যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি। যোগীরা অতি সাহসের সহিত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং এমন এক বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহা যুক্তির উর্ধ্বে, সেখানেই আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যাহা আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া যায়, এমন বিষয় শিক্ষা করিবার ইহাই ফল। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে।'[১] ইহাই ধর্ম-বিজ্ঞান, অন্য কিছু নয়।

---

১ 'ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি'—প্রশ্নোপনিষদ্, ৬।৮

সমাধি-পাদ

অথ যোগানুশাসনম্॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—এখন যোগ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ।

ব্যাখ্যা—এখানে অনেক কথা বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, চিত্ত কি ও বৃত্তিগুলিই বা কি। আমার এই চক্ষু আছে। চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রটি—দর্শনেন্দ্রিয়—অপসৃত কর, তখন তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের অক্ষিজাল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে-ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাও পড়িতে পারে, তথাপি চক্ষু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্রমাত্র। উহা প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নয়। দর্শনেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অন্তর্গত একটি স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। কেবল চক্ষু-দুইটিই যথেষ্ট নয়। কখন কখন লোকে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা যায়। আলো (এবং দর্শনেন্দ্রিয়) রহিয়াছে, বাহিরে চিত্র রহিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই। সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ বহির্যন্ত্র, মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র ও মন—এই তিনটি জিনিসের আবশ্যক। রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অনুভবক্রিয়ার জন্য চাই—প্রথমতঃ বাহিরের যন্ত্র, তারপর ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ উভয়েতে মনের যোগ। বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে মন আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষের (বা প্রকৃত আত্মার) নিকট অর্পিত হয়। তিনি তখন এই মিশ্রণটিকে একটি বস্তুরূপে উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন,

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়া যাহা হয়, তাহাকে 'অন্তঃকরণ' বলে। উহারা মনের উপাদান—চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াস্বরূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই-সকল চিন্তাতরঙ্গকে বৃত্তি (আক্ষরিকভাবে আবর্ত বা ঘূর্ণি) বলে। এখন জিজ্ঞাস্য—চিন্তা কি? মাধ্যাকর্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির ন্যায় চিন্তাও একপ্রকার শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে চিত্ত-নামক যন্ত্রটি কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া অঙ্গীভূত করে এবং চিন্তারূপে প্রেরণ করে। খাদ্য হইতে আমাদের এই শক্তি সংগৃহীত হয়। ঐ খাদ্য হইতেই শরীর গতি-শক্তি প্রভৃতি লাভ করে। অন্যান্য সূক্ষ্মতর শক্তিও খাদ্য হইতেই চিন্তারূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন চৈতন্যময় নয় অথচ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ—মন কেবল একটি যন্ত্র, ইহা দ্বারা তুমি বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকখানির কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহা আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। উহা মনে আঘাত করে, মনও পুস্তকরূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্গাকারে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে প্রতিঘাত করে; সুতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। পুস্তকাকার, গজাকার বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের ইঙ্গিত বা উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিত্য সম্ভাব্যতার নাম জড়পদার্থ।'[১] বাহিরে ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি শুক্তি লওয়া যাক। তোমরা জানো, মুক্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়। এক বিন্দু বালুকণা, কাটাণু বা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে; তখন সেই শুক্তি ঐ বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে; তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। অনুভূতির এই জগৎ যেন আমাদের নিজেদের এনামেল-স্বরূপ; বাস্তব

১ 'Matter is the permanent possibility of sensation.'—J. S. Mill

জগৎ ঐ বালুকণা বা অন্তকিছু। সাধারণ লোকে কখন ইহা বুঝিতে পারিবে না, কারণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ মনেরও অতীত। মন তাঁহার হস্তে একটি যন্ত্রতুল্য। তাঁহারই চৈতন্ত মনের ভিতর দিয়া আসিতেছে। তুমি যখন মনের পশ্চাতে দ্রষ্টারূপে থাকো, তখনই উহা চৈতন্তময় হইয়া উঠে। যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, তখন উহা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়, উহার অস্তিত্বই থাকে না। ইহা হইতে বুঝা গেল—চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। উহা মনের উপাদানস্বরূপ—বৃত্তিগুলি উহার তরঙ্গস্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য করে, তখনই উহা ঐ তরঙ্গরূপ ধারণ করে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদের জগৎ।

আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন তরঙ্গগুলি শান্ত হয়, জল স্থির হইয়া যায়, তখনই কেবল উহার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোলা থাকে বা উহা ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই দেখা যাইবে না। যদি উহা নির্মল থাকে এবং উহাতে একটিও তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। হ্রদের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—হ্রদটি চিত্ত এবং উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তিস্বরূপ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্রিবিধ ভাবে অবস্থান করে; প্রথমটি অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও মূর্খদিগের মন; উহার কার্য কেবল অপরের অনিষ্ট করা; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদিত হয় না। দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা রজঃ—এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছা থাকে; আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্রভুত্ব করিব, তখন এই ভাব থাকে। তারপর যে অবস্থায় তাহাকে বলা হয় 'সত্ত্ব,' ইহা শান্ত; এ অবস্থায় সকল তরঙ্গ থামিয়া যায়, মন-রূপ হ্রদের জল নির্মল হইয়া যায়—ইহা নিষ্ক্রিয় নয়, বরং অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা। শান্ত ভাব শক্তির উচ্চতম বিকাশ; ক্রিয়াশীল হওয়া তো সহজ। লাগাম ছাড়িয়া দিলে অশ্বেরা তোমাকে শুদ্ধ লইয়া ছুটিতে থাকিবে।

যে-কেহ এরূপ করিতে পারে; কিন্তু যিনি এইরূপ লম্ফমান অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর পুরুষ। ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ সংযত করা—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তি অলস ব্যক্তির মতো নয়। সত্ত্বভাবকে জড়তা বা অলসতা মনে করিও না। যিনি মনের এই তরঙ্গগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলতা নিম্নতর শক্তির ও শান্তভাব উচ্চতর শক্তির প্রকাশ।

এই চিত্ত সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। চিত্তকে দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরানো—ইহাই যোগের প্রথম সোপান; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে যাইতে পারে।

যদিও উচ্চতম হইতে নিম্নতম সকল প্রাণীর মধ্যেই এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মনুষ্যদেহেই উহাকে আমরা বুদ্ধিরূপে বিকশিত দেখিতে পাই। চিত্ত যতদিন না বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে এই-সকল বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। গোরু বা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ যদিও উহাদের মন (চিত্ত) আছে, উহা এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

এই চিত্ত অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র।[১] মন এই চারি অবস্থায় চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। প্রথম 'ক্ষিপ্ত'—যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, যে অবস্থায় কর্ম-বাসনা প্রবল থাকে। এইরূপ মনের চেষ্টা—কেবলই সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হওয়া। তারপর 'মূঢ়' অবস্থা—উহা তমোগুণাত্মক; উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট করা। 'বিক্ষিপ্ত' অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকেই যাইবার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের

১ এখানে নিরুদ্ধ অবস্থার কথা বলা হয় নাই, কারণ ঐ অবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বলা যাইতে পারে না।

ও মূঢ়াবস্থা অসুরদিগের স্বাভাবিক। 'একাগ্র' অবস্থায় চিত্তই কেন্দ্রীভূত হইতে চেষ্টা করে, এই অবস্থাই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া যায়।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

—তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) নিজের (অপরিবর্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত।

যখনই তরঙ্গগুলি শান্ত হইয়া যায় ও হ্রদ শান্তভাব ধারণ করে, তখনই আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই। মন সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে; যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি; তখন আমরা ঐ তরঙ্গগুলির সহিত নিজেদিগকে মিশাইয়া ফেলি না, কিন্তু নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

—অন্যান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে) দ্রষ্টা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন।

(যেমন কেহ আমার নিন্দা করিল, ইহা একপ্রকার পরিণাম—একপ্রকার বৃত্তি—আমি উহার সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতেছি; উহার ফল দুঃখ।)

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

—বৃত্তি পাঁচপ্রকার—(কয়েকটি) ক্লেশ-যুক্ত ও (অপরগুলি) ক্লেশ-শূন্য।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম-জ্ঞান শব্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি—বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ আপ্ত বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য—এইগুলিই প্রমাণ।

যখন আমাদের দুইটি অনুভূতি পরস্পরের বিরোধী না হয়, তখন তাহাকেই 'প্রমাণ' বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাম ; যদি উহা পূর্বানুভূত কোন বিষয়ের বিরোধী হয়, তবে আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, কখনই উহা বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ অনুভব বা 'প্রত্যক্ষ'—ইহা একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমরা কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয় 'অনুমান'—তুমি কোন চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখিলে, তাহা হইতে উহা যে-বিষয়ের সূচনা করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে। তৃতীয়তঃ 'আগম' বা আপ্তবাক্য—যাঁহারা প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূতি। আমরা সকলেই জ্ঞানলাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তোমাকে আমাকে উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচাররূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিরক্তিকর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সকলের পারে গিয়াছেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সব এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সবই যেন একখানি পাঠ্যপুস্তক। আমাদের মতো জ্ঞানলাভের কষ্টকর প্রণালীর ভিতর দিয়া তাঁহাকে যাইতে হয় না। তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই জ্ঞানস্বরূপকে উপলব্ধি করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, আর এই জন্যই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। যদি বর্তমান সময়ে এরূপ কেহ জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার কথা অবশ্যই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে, অন্যান্য দার্শনিকেরা এই আপ্তবাক্য-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আপ্তবাক্য সত্য কেন? আপ্তবাক্যের প্রমাণ—উহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যেমন পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হইলে তুমি যাহা দেখ বা আমি যাহা দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্যও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ; যখন ঐ জ্ঞান যুক্তি ও মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায়। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পারে, 'আমি চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি'—উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে না। প্রথমতঃ উহা সত্যজ্ঞান

হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ উহা যেন আমাদের পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়; তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহা নির্ভর করে। অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ দেখিবার আবশ্যক নাই, সে কি বলে, সেইটি জানাই বিশেষ আবশ্যক—সে কি বলে, তাহা আগে শুনিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ে এ-কথা সত্য হইতে পারে; কোন লোক দুষ্টপ্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা; কারণ কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত সত্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি নিজেকে 'আপ্ত' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কি না। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত সে ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা মনুষ্যজাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী কি না। কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে উহা পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়া যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহা দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে দেখিতে পারে, উহা সত্য কি না। যিনি নিজের অর্জিত জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপ্ত নন। এই-সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে হইবে সেই ব্যক্তি পবিত্র, এবং তাঁহার কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নাই, তাঁহার লাভ অথবা যশের আকাঙ্ক্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার আমাদিগকে এমন কিছু দেওয়া আবশ্যক, যাহা আমরা ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পারি না ও যাহা জগতের কল্যাণকর। তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, উহা অন্যান্য সত্যের বিরোধী না হয়; অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ সেই ব্যক্তিই যে কেবল ঐ বিষয়ের অধিকারী, আর কেহ নয়, তাহা হইবে না। অপরের পক্ষেও যাহা লাভ করা সম্ভব, তিনি নিজের জীবনে তাহা কেবল কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকার: প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অনুমান ও

আপ্তবাক্য। এই 'আপ্ত' কথাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারিতেছি না। ইহাকে 'inspired' (অনুপ্রাণিত) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ এই অনুপ্রেরণা বাহির হইতে আসে বলিয়া মনে হয়, আর ঐ জ্ঞান ভিতর হইতে আসে। 'আপ্ত'-শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি পাইয়াছেন।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

—বিপর্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়।

আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রান্তি। ইহাকে 'বিপর্যয়' বলে; যথা শুক্তিতে রজত-ভ্রম।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

—কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্রম বলে।

বিকল্প-নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। ইহা চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন। সংযম-বিষয়ক মতবাদটি এখন বেশ বুঝা যাইবে। মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার সংযমের ক্ষমতা ততই কম। সর্বদা এই সংযমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিবে। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথবা দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখ যে, কোন একটি সংবাদ তোমার নিকট আসিবামাত্র কেমন করিয়া তোমার মন একটি বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

—যে বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা।

আর এক প্রকার বৃত্তির নাম 'নিদ্রা'—স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আমরা যখন জাগিয়া উঠি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম। অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্মৃতি হইতে পারে। যাহা আমরা অনুভব করি না,

আমাদের সেই বিষয়ের কোন স্মৃতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই চিত্তহ্রদের একটি তরঙ্গ। নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন অনুভূতিই থাকিত না, সুতরাং আমরা উহা স্মরণও করিতে পারিতাম না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে পারি, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার তরঙ্গ ছিল। 'স্মৃতি' আর এক প্রকারের বৃত্তি।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

—অনুভূত বিষয়সকল যখন আমাদের মন হইতে চলিয়া না যায় (যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়), তাহাকে স্মৃতি বলে।

পূর্বে যে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেই স্মৃতি আসিতে পারে। মনে কর, তুমি একটি শব্দ শুনিলে। ঐ শব্দটি যেন চিত্তহ্রদে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করে। ইহাই স্মৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যখন নিদ্রা-নামক তরঙ্গবিশেষ চিত্তের ভিতর স্মৃতিরূপ তরঙ্গপরম্পরা উৎপন্ন করে, তখন উহাকে 'স্বপ্ন' বলে। জাগ্রৎকালে যাহাকে 'স্মৃতি' বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ তরঙ্গকেই 'স্বপ্ন' বলিয়া থাকে।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়।

এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচারপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? কারণ প্রত্যেক কার্যই হ্রদের উপরিভাগে কম্পনশীল স্পন্দনস্বরূপ। এই কম্পন কালে মিলাইয়া যায়। থাকে কি? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেক সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব' এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের

ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সান্ত্বনা আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাস দূর করিতেও পারি। আমাদের মনের ভিতর দিয়া যে চিন্তাস্পন্দনগুলি চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি দাগ রাখিয়া যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের চরিত্র এই-সকল সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। যখন কোন বিশেষ বৃত্তিতরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবান্বিত হয়। যখন সদ্গুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়; যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ সুখী হইয়া থাকে। অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য করিয়া যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশা নাই; কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা ঐগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ॥ ১৩॥

—ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে ‘অভ্যাস’ বলে।

অভ্যাস কাহাকে বলে? চিত্তরূপী মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ উহার তরঙ্গাকারে বহির্গমন নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যাস।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ॥ ১৪॥

—দীর্ঘকাল সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির) চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া যায়।

এই সংযম এক দিনে আসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে পর আসে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

—দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে একটি অপূর্ব ভাব আসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বলে।

দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক—(১) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অভিজ্ঞতা। এই দুই শক্তি আমাদের মনোহ্রদে নানা তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে। বৈরাগ্য এই শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিস্বরূপ। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন—এই কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তিদ্বয়কে ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করা। মনে কর, আমি একটি পথ দিয়া যাইতেছি, একজন লোক আসিয়া আমার ঘড়িটি কাড়িয়া লইল। ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি, আমি নিজে দেখিলাম, উহা আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে পরিণত করিল। ঐ ভাব আসিতে দিবে না। যদি উহা নিবারণ করিতে না পারো, তবে তোমার কোনই মূল্য নাই। যদি নিবারণ করিতে পারো, তবেই তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝা যাইবে। আবার সংসারী লোক যে বিষয়ভোগ করে, তাহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, বিষয়ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য। এগুলি আমাদের ভয়ানক প্রলোভন। ঐগুলিকে অস্বীকার করা ও ঐগুলি লইয়া মনকে বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই বৈরাগ্য। স্বানুভূত ও পরানুভূত বিষয় হইতে আমাদের যে দুই প্রকার কার্যপ্রবৃত্তি জন্মায়, সেগুলিকে দমন করা ও এইরূপে চিত্তকে উহাদের বশীভূত হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। প্রবৃত্তিগুলি যেন আমার আয়ত্তে থাকে, আমি যেন উহাদের আয়ত্তাধীন না হই—এই প্রকার মানসিক শক্তিকে বৈরাগ্য বলে; এই বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র উপায়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

—যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।

যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে পুরুষ বা আত্মা কী ও গুণগুলিই বা কী, তাহা আমাদের জানা উচিত। যোগদর্শনের মতে সমুদয় প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে; ঐ গুণগুলির একটির নাম তমঃ, অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সত্ত্ব। এই তিন গুণ বাহ্যজগতে অন্ধকার বা অলসতা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, ও উহাদের সামঞ্জস্য—এই ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, সবই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মা ইহাদের সবগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে; উহা স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ; আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরে। চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি স্থূলতম ভূত পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত—প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রকৃতি মনুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; যখন প্রকৃতি ঐ আবরণ সরাইয়া লয়, তখন আত্মা স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সূত্রে বর্ণিত এই বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতি বশীভূত হয় বলিয়া উহা আত্মার প্রকাশের পক্ষে অতিশয় সাহায্যকারী। পরের সূত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাই যোগীর চরম লক্ষ্য।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ[১] সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

—যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক সমাধি বলে।

সমাধি দুই প্রকার। একটিকে 'সম্প্রজ্ঞাত' ও অপরটিকে 'অসম্প্রজ্ঞাত' বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার সমুদয় শক্তি আসে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার। প্রথম প্রকারকে 'সবিতর্ক সমাধি' বলে। এই সমাধিতেই মনকে অন্যান্য বিষয় হইতে সরাইয়া

১ পাঠান্তর: বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ

বিষয়বিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় দুই প্রকার: (১) চতুর্বিংশতি (জড়) তত্ত্ব ও (২) চেতন পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই সাংখ্যদর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার—ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে। উহাকে 'চিত্ত' বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে। আবার শক্তি ও ভূত উভয়েরই কারণস্বরূপ এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাকে 'অব্যক্ত' বলে—উহা সৃষ্টির প্রাক্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা। কল্পান্তে সমুদয় প্রকৃতিই উহাতে প্রত্যাবর্তন করে, আবার কিছুকাল পরে পরকল্পে উহা হইতেই সব পুনরাবির্ভূত হয়। এই সমুদয়ের অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। কোন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। যে প্রকার সমাধিতে বাহ্য স্থূল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। 'বিতর্ক' অর্থে প্রশ্ন—'সবিতর্ক' অর্থে প্রশ্নের সহিত। যে প্রকার ধ্যানে ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি ঐরূপ ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে—যেন এইজন্যই ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা—তাহাকে 'সবিতর্ক' বলে। কিন্তু শক্তি লাভ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহা কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র। আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগসুখ হইতেই পারে না। ভোগসুখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন উপদেশ; কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতি কঠিন। যখন সে ইহার ধারণা করিতে পারে, তখন সে জড় জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহ্যশক্তি বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পরিশেষে তাহা হইতে আবার যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিয়া পতঞ্জলি এই গুহ্যশক্তিলাভের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেও তিনি ভুলেন নাই।

আবার সেই ধ্যানেই যখন ঐ ভূতসমূহকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্ করিয়া ঐগুলির স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখন সেই সমাধিকে নির্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন ধ্যান আর এক সোপান অগ্রসর হয় এবং তন্মাত্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় করিয়া উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তখন ঐ ধ্যানকে 'সবিচার সমাধি' বলে। আবার ঐ সমাধিতে যখন ঐ সূক্ষ্মভূতগুলিকে দেশকাল-বিবর্জিত উহাদের স্বরূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 'নির্বিচার সমাধি' বলে। পরবর্তী সোপানে সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার ভূতের চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে—মনকেই ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজস্তমোগুণ হইতে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা হয়, তখন উহাকে 'সানন্দ সমাধি' বলে। যখন মনই ধ্যানের বিষয় হয়, যখন ঐ সমাধি একাগ্র ও পরিপক্ক হইয়া যায়, যখন স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক অহঙ্কার মাত্র বর্তমান থাকে, তখন উহাকে 'অস্মিতা-সমাধি' বলে। এই অবস্থাতেও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে বেদে 'বিদেহ' বলিয়া থাকে। তিনি নিজেকে স্থূলদেহশূন্যরূপে চিন্তা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজেকে সূক্ষ্মশরীরধারী বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই। যাঁহারা এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরমপদ লাভ না করিয়া প্রকৃতিতে লয়-প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলে; কিন্তু যাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নন, তাঁহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

—অন্য প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের গূঢ় সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'; ঐ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না—আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীত অবস্থায় (সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরও বাহিরে) যাইতে

পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। যদিও এই ধ্যানের প্রণালী খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই : মনকেই ধ্যানের বিষয় কর ; যখনই মনে কোন চিন্তা আসিবে, তখনই উহা দমিত কর ; মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আসিতে না দিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য কর। যখনই আমরা যথার্থরূপে ইহা সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই আমরা মুক্তি লাভ করিব। পূর্ব সাধন যাহাদের আয়ত্ত হয় নাই, তাহারা যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের চিত্ত অজ্ঞান-স্বভাব তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তমোগুণ তাহাদের মনকে অলস ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। তাহারা কিন্তু মনে করে, আমরা মনকে শূন্য করিতেছি। ইহা ঠিকঠিকভাবে সাধন করিতে পারা উচ্চতম শক্তির প্রকাশ—সংযমের চূড়ান্ত। যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়, তখন ঐ সমাধি নির্বীজ হইয়া যায়।—ইহার অর্থ কি ? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহারা সংস্কার বা বীজাকারে থাকে, আবার সময় আসিলে পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন সংস্কারগুলিকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসে, তখনই সমাধি নির্বীজ হইয়া যায়। তখন মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে এই জীবন-লতিকা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে—যাহা হইতে এই অবিরাম জন্মমৃত্যু আবর্তিত হইতে পারে।

অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো, যেখানে জ্ঞান থাকিবে না, যেখানে মন থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা ? যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি, তাহা ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় এক নিম্নতর অবস্থামাত্র। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রান্তদ্বয় প্রায় একই প্রকার দেখায়। ইথারের কম্পন মৃদুতম হইলে উহাকে 'অন্ধকার' বলে, মধ্য অবস্থায় 'আলোক', উহার উচ্চতম কম্পন আবার অন্ধকার। কিন্তু ঐ দুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে ? উহার একটি—প্রকৃত অন্ধকার, অপরটি—অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহারা দেখিতে একই প্রকার। এইরূপে অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, আর ঐ জ্ঞানের অতীত একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত

অবস্থা দেখিতে একই প্রকার। আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, তাহা এক উৎপন্ন দ্রব্য—উহা একটি মিশ্র পদার্থ, উহা প্রকৃত সত্য নয়।

এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভ্যাস করিলে কি ফল হইবে? উহার ফলে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে মনের যে একটা প্রবণতা ছিল, তাহা তো নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া যাইবে। অপরিষ্কৃত সুবর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির করিবার জন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। যখন খনি হইতে উত্তোলিত ধাতুকে গলানো হয়, তখন যে রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশানো হয়, সেগুলি ঐ খাদের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই সর্বদা সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ও সৎপ্রবৃত্তিগুলিও চলিয়া যাইবে। এইরূপে সদসৎ প্রবৃত্তিদ্বয় পরস্পরকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ভাল মন্দ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া আত্মা স্ব-মহিমায় সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞরূপে অবস্থান করিবেন। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মা সর্বশক্তিমান্ হন; জীবনে অভিমান ত্যাগ করিয়াই জীবাত্মা মৃত্যু অতিক্রম করেন, কারণ তখন তিনি মহাপ্রাণরূপে অবস্থান করেন। তখনই জীবাত্মা জানিতে পারিবেন, কোনকালে তাঁহার জন্মমৃত্যু ছিল না, তাঁহার কখনই স্বর্গ বা পৃথিবী কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন তিনি বুঝিবেন, তিনি কখনও আসেন নাই, কোথাও যান নাই, আসা-যাওয়া—কেবল প্রকৃতির। আর প্রকৃতির ঐ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। দেওয়াল যেন ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি! আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ; চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা নিজেকে নানারূপে পরিণত করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছি। এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিয়া যাইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন—প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয়, আজ্ঞা করিবেন,—তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে; তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। সাংখ্যদর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এই দর্শনের মতে জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আর আত্মা

হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত। যে আত্মা প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ বা বশীভূত, তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি তো নিজেই ক্রীতদাস। অপর পক্ষে আত্মা যদি মুক্তই হন, তবে মুক্ত আত্মা কেন সৃষ্টি করিবেন, কেনই বা এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ করিবেন? উঁহার কোন বাসনা নাই, সুতরাং উঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতবাদ অনাবশ্যক। প্রকৃতি স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা করা যায়, তখন ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, যাঁহারা সিদ্ধাবস্থার প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মন কিছুকাল প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাঁহারা প্রকৃতির প্রভুরূপে পুনরাবির্ভূত হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, আনন্দময় বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, 'না, ঈশ্বর একজন্ আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্মা—সমুদয় পুরুষ হইতে পৃথক্ একজন বিশেষ পুরুষ আছেন; তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সকল গুরুর গুরু।' সাংখ্যেরা যাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলেন, যোগীরা তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহারা অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ যোগী। কিছুকালের জন্য তাঁহাদের চরমলক্ষ্য-প্রাপ্তি ব্যাহত হয়, তাঁহারা সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের নিয়ন্তারূপে অবস্থান করেন।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

—(এই সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ।

(ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে ঐ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ নন)

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্‌ ॥ ২০ ॥

—অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়।

যাঁহারা দেবত্বপদ অথবা কোন কল্পের শাসনভার প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে। তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

—যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাঁহারা অতি শীঘ্রই যোগে কৃতকার্য হন।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

—আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা অনুসারে যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

—অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি লাভ হয়)।

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

—এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ কর্ম কর্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর (পরম নিয়ন্তা)।

আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই ; যোগীরা কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। যোগীদিগের 'ঈশ্বর' অর্থে জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সূচিত হন নাই, বেদমতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা। বেদের অভিপ্রায় এই—জগতে যখন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য একজনের ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে।

যোগীরা ঈশ্বরাস্তিত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহাদের নিজস্ব এক নূতন ধরনের যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

—অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ (মাত্র) আছে, তাহা তাঁহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে।

অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতর মনকে ভ্রমণ করিতেই হইবে। তুমি অবশ্য সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে পারো, কিন্তু উহা চিন্তা করিতে গেলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে ঐ দেশরূপ ক্ষুদ্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার চতুর্দিকে অনন্ত-বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে। কাল সম্বন্ধেও ঐ কথা। মনে কর, তুমি এক সেকেণ্ড সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্তকালের কথা চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ, মানুষে কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে। যোগীরা সেই অনন্ত জ্ঞানকেই ঈশ্বর বলেন।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

—তিনি পূর্ব পূর্ব (প্রাচীন) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

আমাদের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে জাগরিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্তু উহাকে জাগাইতে হইবে। আর যোগীরা বলেন, ঐরূপে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। প্রাণহীন অচেতন জড়ের প্রভাবে কখন জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সর্বদা আমাদের নিকট থাকা প্রয়োজন, সুতরাং এই গুরুগণের প্রয়োজন সর্বদাই ছিল। পৃথিবী কখনও এই প্রকার আচার্য-বিরহিত হয় নাই। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত

কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ঈশ্বর সকল গুরুর গুরু, কারণ এই-সকল গুরু যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা দেবতাই হউন, অথবা দেবদূতই হউন, সকলেই বদ্ধ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বারা বদ্ধ নন।

যোগীদিগের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দুইটি: প্রথমটি এই যে, সান্ত বস্তুর চিন্তা করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। আর যদি ঐ মানসিক অনুভূতির এক অংশ সত্য হয়, তবে উহার অপর অংশও সত্য হইবে। কারণ—দুইটিই যখন সেই একই মনের অনুভূতি, তখন দুইটি অনুভূতির মূল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্পজ্ঞ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে—যদি এই দুইটি অনুভূতির একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ করিব না কেন? যুক্তি বলে—উভয়কে গ্রহণ কর, নতুবা উভয়কে পরিত্যাগ কর। যদি বিশ্বাস করি যে মানব অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার নিজের ভিতর হইতেই বিকশিত হয়—এ-কথা সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কতকগুলি অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। গুরু ব্যতীত আমরা কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এখন কথা হইতেছে, যদি মনুষ্য দেবতা বা স্বর্গীয় দূতবিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই তো সসীম; তাঁহাদের পূর্বে কে গুরু ছিলেন? বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতেই হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন নন। সেই এক অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরু, যাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

—প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাঁহার প্রকাশক শব্দ।

তোমার মনে যে-কোন ভাব আছে, তাহারই একটি প্রতিরূপ শব্দও আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যায় না। একই বস্তুর বাহ্যভাগটিকে

'শব্দ' ও অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা 'ভাব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্লেষণ-বলে কেহই চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক্ করিতে পারে না। কতকগুলি লোক একত্র বসিয়া কোন্ ভাবের জন্ত কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে করিতে ভাষা উৎপন্ন করিয়াছে—এইরূপ অনেকের মত; কিন্তু ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, ততদিন শব্দ ও ভাষা দুইই রহিয়াছে। ভাব ও শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ কি? যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাকা চাই-ই চাই, কিন্তু এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, তাহা নয়। কুড়িটি ভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য একটি না একটি শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক প্রকার ধ্বনিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেইজন্ত আমাদের টীকাকার বলিয়াছেন, 'যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাইতেছে না।'[১] এই সমস্ত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলা যায়, তাহা না হইলে সেই বাচক শব্দ কখনই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বাচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক। যদি সে বাচ্য বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ব হইতে থাকে, আর আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাই যে, ঐ বাচক শব্দটি ঐ বস্তুকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ বাচ্য-বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি ঐ পদার্থগুলি উপস্থিত নাও থাকে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহাদের বাচকের দ্বারাই সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী; অতএব যখন ঐ বাচক শব্দটি উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহা ঐ বাচ্য-পদার্থটির কথা মনে জাগাইয়া দিবে। সূত্রকার বলিতেছেন, 'ওঙ্কার

১ সর্বে এব শব্দাঃ সর্বাকারার্থাভিধানসমর্থা—ইতি স্থিত এবৈষাং সর্বাকারৈরর্থৈঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ।—ব্যাসভাষ্যের বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকা

ঈশ্বরের বাচক'। কেন তিনি এই শব্দটির উপর জোর দিলেন? 'ঈশ্বর'-ভাবটি বুঝাইবার জন্য তো শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি ভাবের সহিত সহস্র সহস্র শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর-ভাবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই তো ঈশ্বরের বাচক। বেশ কথা, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। ঐ বাচকগুলির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান—সাধারণ শব্দ-ভূমি বাহির করিতে হইবে, আর যে বাচক শব্দটি সাধারণ বাচক হইবে, সেই শব্দটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই সকলের প্রতিনিধিরূপে উহার যথার্থ বাচক হইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে আমরা কণ্ঠনালী ও তালুকে শব্দোচ্চারণের আধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশ, যাহা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক শব্দ? —ওঁ (অউম্) এই প্রকার শব্দ; উহাই সমুদয় শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ। উহার প্রথম অক্ষর 'অ' সমুদয় শব্দের মূল—উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাস্বরূপ, উহা জিহ্বা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। 'ম'—বর্গীয় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিতে হয়। আর 'উ' এই শব্দ জিহ্বামূল হইতে মুখমধ্যবর্তী শব্দাধারের শেষ সীমা পর্যন্ত যেন গড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে 'ওঁ' শব্দটি দ্বারা সমুদয় শব্দোচ্চারণ-ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাচক শব্দ—উহাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বরূপ। যত প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে—আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্দ-উচ্চারণের সম্ভাবনা আছে, উহা সেই সকলেরই সূচক।

এই-সকল আনুমানিক গবেষণা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, সব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ উত্তর এই—সর্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী,

দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের জন্য এই 'ওঙ্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই ওঙ্কার মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরেজী 'গড্' (God) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), পূর্ণ বা পরম (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; ঐগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু 'ওঁ'—শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

—এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের উপায়)।

পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? অবশ্য আমাদের সংস্কারবিষয়ক মতবাদের কথা স্মরণ আছে; সংস্কার-সমষ্টিই আমাদের মনের মধ্যে বাস করে; ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম হইয়া তাহারা অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই ব্যক্তভাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনই থামিবে না। যখন এই বিশ্বজগৎ লয় পাইবে, তখন বিরাট বিরাট স্পন্দন সব অন্তর্হিত হইবে; সূর্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী—সবই লয় হইয়া যাইবে; কিন্তু স্পন্দন—পরমাণুগুলির মধ্যে থাকিবে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কার্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণুতে সেই কার্যই সাধিত হইতেছে। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে যেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ। চিত্তের স্পন্দন যখন স্তিমিত হইবে, তখনও পরমাণু-স্পন্দন চলিতে থাকিবে, উত্তেজক কারণ পাইলেই ঐগুলি পুনঃপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বুঝা যাইবে। আমাদের ভিতর যে-সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জপ

সেগুলিকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ ভবসমুদ্র-পারের একমাত্র নৌকাস্বরূপ হয়।[1] সঙ্গের এতদূর শক্তি! বাহ্য সৎসঙ্গের যেমন শক্তি, আন্তর সৎসঙ্গেরও তেমনি শক্তি। এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহা হইলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক আসিবে এবং আত্মা প্রকাশিত হইবেন।

কিন্তু যেমন 'ওঁ'—এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, সেইসঙ্গে উহার অর্থও চিন্তা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখা দেয়। একই ভাবে আমাদের ভিতরে যে-সকল শুভ সংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত থাকিলেও সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে—ব্যক্তভাব ধারণ করিবে। সৎসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, কারণ সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায়—চিত্তহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার উপক্রম করে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

—উহা হইতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় ও যোগবিঘ্নসমূহ নাশ হয়।

এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল অনুভব করিবে—অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে এবং মানসিক ও শারীরিক যোগবিঘ্নসমূহ দূরীভূত হইতেছে। এখন প্রশ্ন—এই যোগবিঘ্নগুলি কি কি?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

—রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যমরাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, ঐ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে পতিত হওয়া—এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপকর অন্তরায়।

ব্যাধি: জীবন-সমুদ্রের অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য এই শরীরই আমাদের একমাত্র নৌকা। বিশেষভাবে ইহার যত্ন করিতে হইবে।

১ ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥—মোহমুদ্গর, শঙ্করাচার্য।

অসুস্থ ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না। স্ত্যান: মানসিক জড়তা আসিলে আমাদের যোগবিষয়ক প্রবল অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়; উহার অভাবে সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে না। সংশয়: আমাদের এই যোগবিজ্ঞান বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন দূরদর্শন-দূরশ্রবণাদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, ততদিন এই বিদ্যার সত্যতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে। এইগুলির একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে সাধক আরও অধ্যবসায়শীল হয়। অনবস্থিতত্ব: কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন করিবার সময় দেখিবে—মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে; বোধ হইতেছে, তুমি সাধনপথে দ্রুত উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে হঠাৎ তোমার এই উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল। জাহাজ চড়ায় ঠেকিলে যেরূপ অসহায় হইয়া যায়, তোমার সেইরূপ হইয়াছে। এরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্য হইও না। এইরূপে বারবার উত্থান-পতনের পথেই অগ্রগতি হইয়া থাকে।[১]

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

—দুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

যখনই একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তখনই মন ও শরীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে। সাধন যখন ঠিক পথে চালিত না হয়, অথবা যখন চিত্ত যথেষ্ট সংযত না থাকে, তখনই এই বিঘ্নগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। ওঙ্কার জপ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে মন দৃঢ় হয়, এবং দেহে মনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়। সাধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্নায়বীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ওদিকে খেয়াল না করিয়া সাধন করিয়া যাও। সাধনের দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

—ইহা নিবারণের জন্য 'এক-তত্ত্ব' অভ্যাস আবশ্যক।

---

১ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'প্রমাদ', 'আলস্য', 'অবিরতি', 'ভ্রান্তিদর্শন', 'অলব্ধভূমিকত্ব' বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। সূত্রার্থে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী বুঝিতে হইবে।

কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন একটি বিষয়বিশেষের আকারে আকারিত করিবার চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত বিঘ্নগুলি চলিয়া যায়। এই উপদেশটি খুব সাধারণভাবে দেওয়া হইল। পরবর্তী সূত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিত-ভাবে বিবৃত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে। এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, এইজন্য নানাপ্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে পারেন—কোন্‌টি তাঁহার পক্ষে খাটে।

মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা-
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্‌ ॥ ৩৩ ॥

—সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ—এই কয়েকটি ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্যক। আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি দয়াবান্‌ হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে দেখিলে সুখী হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, তখন সেইগুলির প্রতিও আমাদের ঐরূপ ভাব ধারণ করা আবশ্যক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি 'মৈত্রী' অর্থাৎ অনুকূল ভাব ধারণ করা আবশ্যক। এইরূপে যদি কোন দুঃখকর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি 'করুণা'ভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকল ভাব আসিলে মন শান্ত হইয়া যাইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ গোলযোগ ও অশান্তির কারণ মনের ঐ-সকল ভাব ধারণ করিবার অক্ষমতা। মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকার করিতে উদ্যত হইলাম। আর আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না লইয়া থাকিতে পারি না, তাহার কারণ আমরা চিত্তকে সংযত রাখিতে পারি না। চিত্ত উহার প্রতি

তরঙ্গাকারে ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। আমাদিগের মনে ঘৃণা অথবা অপরের প্রতি অনিষ্টভাব-পোষণরূপ যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা শক্তির অপচয়-মাত্র। আর কোন অশুভ চিন্তা বা ঘৃণা-প্রসূত কার্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকারী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। এরূপ সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নয়, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের অনুকূল শুভশক্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

—যথাযথ রেচক ও কুম্ভক দ্বারা (চিত্ত স্থির হয়)।

এখানে 'প্রাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নয়। সমগ্র জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম 'প্রাণ'। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, যাহা কিছু কাজ করিতে পারে, অথবা যাহার জীবন আছে, তাহাই এই প্রাণের বিকাশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে। কল্পারম্ভের প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ গতিহীন অবস্থায় (অব্যক্ত) থাকে, আবার কল্পারম্ভ-কালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই মনুষ্যজাতি অথবা অন্যান্য প্রাণীতে স্নায়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, ঐ প্রাণই আবার চিন্তা ও অন্যান্য শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মনুষ্যদেহেও ঐরূপ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সকল পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, আর বিভিন্ন শক্তি প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই 'প্রাণায়াম'। যোগশাস্ত্রের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটি মহতী বিদ্যা করিয়া তুলিয়াছেন। পতঞ্জলির মতে ইহা চিত্তবৃত্তিনিরোধের বহু উপায়ের

মধ্যে একটি উপায় মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। তাঁহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার ভিতরে টানিয়া লইবে এবং কিছুক্ষণ উহা ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত একটু স্থির হইবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা হইতেই 'প্রাণায়াম' নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরবর্তী যোগিগণ কি বলেন, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আবশ্যক।

এ-বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের মনে রাখিবার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই 'প্রাণ' বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না; যে শক্তিবলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণস্বরূপ, তাহাকে 'প্রাণ' বলে। আবার সমুদয় ইন্দ্রিয় বুঝাইতেও এই প্রাণ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়কেই 'প্রাণ' বলে। মনকেও আবার 'প্রাণ' বলে। অতএব দেখা গেল যে, 'প্রাণ' শক্তি। তথাপি আমরা ইহাকে শক্তি-নামে অভিহিত করিতে পারি না, কারণ শক্তি ঐ প্রাণের বিকাশস্বরূপ। শক্তি ও নানাবিধ গতিরূপে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। মনের উপাদান চিত্ত যন্ত্রবৎ চতুর্দিক হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করে এবং এই প্রাণ হইতেই শরীর-রক্ষার হেতুভূত ভিন্ন ভিন্ন জীবনীশক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে। এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াদ্বারা আমরা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। আমরা প্রথমতঃ ঐগুলিকে চিনিতে আরম্ভ করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করি, এবং ঐগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।

পতঞ্জলির পরবর্তী যোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণ-প্রবাহ আছে। একটিকে তাঁহারা 'ইড়া', অপরটিকে 'পিঙ্গলা' ও তৃতীয়টিকে 'সুষুম্না' বলেন। তাঁহাদের মতে—পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণদিকে, ইড়া বামদিকে, আর ঐ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শূন্য নালী সুষুম্না আছে। তাঁহাদের মতে—ইড়া ও পিঙ্গলা নামক শক্তিপ্রবাহদ্বয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের সাহায্যেই আমরা শরীরের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতেছি। সুষুম্না সকলের মধ্যেই আছে বটে, তবে কেবল যোগীর শরীরেই উহার কাজ হয়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যোগী যোগসাধনবলে

নিজের দেহ পরিবর্তিত করেন। যতই সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; সাধনের পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে আর সেরূপ থাকিবে না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়; ইহা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা যাহা কিছু নূতন চিন্তা করি, তাহাই যেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া একটি নূতন প্রণালী নির্মাণ করিয়া দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, মনুষ্যস্বভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; মানুষের স্বভাবই এই যে, উহা পূর্বাবর্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, কারণ উহা অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে করা যায়—মন একটি সূচি আর মস্তিষ্ক উহার সম্মুখে একটি কোমল পিণ্ডমাত্র, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্কমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ ঐ পথটিকে পৃথক্ রাখিবার জন্য উহার একটি সীমানা প্রস্তুত করিয়া দেয়। যদি ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোন স্মৃতি সম্ভব হইত না, কারণ স্মৃতির অর্থ—পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার উপর দাগা বুলানো। হয়তো তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সকলের পরিচিত কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া, ঐগুলিরই যোরফের করিয়া কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা সহজেই আমার কথা বুঝিতে পারো; ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এই চিন্তার পথ বা প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, কেবল ঐগুলিতে ফিরিয়া আসিতে হয়, এইমাত্র। কিন্তু যখনই কোন নূতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, তখনই মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী নির্মাণ করিতে হয়; এইজন্য তত সহজে উহা বুঝা যায় না। এইজন্য মস্তিষ্কই—অজ্ঞাতসারে এই নূতন ধরনের ভাবধারা পরিচালিত হইতে অস্বীকার করে, মানুষেরা নয়। উহা যেন গতিরোধ করে। প্রাণ নূতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তিষ্ক তাহা করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী, ইহাই তাহার গূঢ় রহস্য। মস্তিষ্কের মধ্যে এই প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে থাকে, আর প্রাণরূপ সূচি উহার ভিতর যত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত করে, মস্তিষ্ক ততই রক্ষণশীল হইবে, ততই উহা নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। মানুষ যতই চিন্তাশীল হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথগুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে,

ততই সহজে সে নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করিবে ও বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক নূতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। মস্তিকে একটি নূতন ভাব আসিলেই মস্তিকের ভিতর নূতন প্রণালী নির্মিত হয়। এইজন্য যোগ অভ্যাসের সময় আমরা প্রথমে এত শারীরিক বাধাপ্রাপ্ত হই, কারণ যোগ নূতন চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ধর্মের যে অংশ প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহা বহু লোকের গ্রাহ্য হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, যাহা কেবল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া ব্যাপৃত, তাহা সাধারণতঃ অবহেলিত হয়।

আমাদের এই জগতের সংজ্ঞা কি, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক ; জগৎ আমাদের সজ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত (প্রক্ষেপিত) অনন্ত সত্তামাত্র। অনন্তের কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা আমাদের 'জগৎ' বলিয়া থাকি। তাহা হইলেই দেখা গেল, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। অনন্তের যেটুকু ভাগ আমাদের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, যেটুকু দেশকালনিমিত্তরূপ পিঞ্জরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, এইটুকু লইয়া ধর্মের যে অংশ ব্যাপৃত, তাহা সহজে বোধগম্য হয়, কারণ আমরা তো পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে রহিয়াছি, আর এই জগতের ভাব প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ধর্মের যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ; সেইজন্য উহার চিন্তায় মস্তিকের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন বিপর্যস্ত হয় ; সেইজন্য সাধন করিতে গিয়া সাধারণ মানুষ প্রথমটা চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যথাসম্ভব এই বিপর্যয়ের ভাব কমাইবার জন্যই পতঞ্জলি এই-সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, এগুলি হইতে নির্বাচন করিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী একটি সাধন-প্রণালী আমরা অভ্যাস করিতে পারি।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

—যে-সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি হয়, সেই-সকল সমাধি মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে।

ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই ইহা আপনা-আপনি আসিতে থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ অনুভব করা যায়। এইরূপে জিহ্বামূলে মনকে একাগ্র করিলে, সুন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে দিব্য রসাস্বাদ হয়, জিহ্বামধ্যে মনঃসংযম করিলে বোধ হয়, যেন কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। তালুতে মনঃসংযম করিলে দিব্যরূপসকল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়া উহার সত্যতায় সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই-সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে অধ্যবসায়-সহকারে সাধন করিতে থাকিবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

—শোকরহিত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়।

ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন একটি পদ্ম রহিয়াছে, তাহার পাপড়ি অধোমুখে; উহার মধ্য দিয়া সুষুম্না গিয়াছে। তারপর পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, পাপড়ির সহিত ঐ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হইয়াছে, আর ঐ পদ্মের মধ্যে মহাজ্যোতিঃ রহিয়াছে। ঐ জ্যোতির ধ্যান কর।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

—অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

কোন সাধুপুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, যাঁহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, যাঁহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া জানো, তাঁহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অন্তঃকরণ

শান্ত হইবে। ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় আছে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

—অথবা স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার (এবং নিদ্রা বা সুষুপ্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্ত্বিক সুখের) ধ্যান করিলেও চিত্ত প্রশান্ত হয়।

কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, সে তাহা শুনিতেছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে। জাগরণের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে যে-কোন পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

—অথবা যে-কোন জিনিস তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই ধ্যান দ্বারা (সমাধি লাভ হয়)।

অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাসো—যে-কোন স্থান তুমি খুব ভালবাসো, যে-কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাসো, যে-কোন ভাব তুমি খুব ভালবাসো, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর।

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

—এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থ পর্যন্ত তাঁহার মন অব্যাহতগতি লাভ করে।

মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই (মনোবৃত্তিরূপ) মনের তরঙ্গগুলিও ক্ষীণতর হইয়া আসে।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা-সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

—যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় (বশীভূত হয়), তাঁহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তুতে (অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল লাভ হয়? আমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, পূর্বে এক সূত্রে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থূল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া; পরে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু আমাদের সমাধির বিষয় হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই-সকল সমাধির অভ্যাস দ্বারা স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ও আমরা সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় যোগী তিনটি বস্তু দেখিতে পান—গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থূল, যথা—শরীর বা জড় পদার্থসমুদয়। দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম বস্তুসমুদয়, যথা—মন বা চিত্তাদি। তৃতীয়তঃ গুণবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ অস্মিতা বা অহঙ্কার। এখানে 'আত্মা' বলিতে উহার যথার্থ স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। অভ্যাসের দ্বারা যোগী এই-সকল ধ্যানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার এতাদৃশী একাগ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই অন্যান্য বস্তু মন হইতে সরাইয়া দিতে পারেন। তিনি যে-বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত এক হইয়া যান (তৎস্থিতত্তা ও তদঞ্জনতা); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন একখণ্ড স্ফটিকতুল্য হইয়া যান; পুষ্পের নিকট স্ফটিক থাকিলে ঐ স্ফটিক যেন পুষ্পের সহিত প্রায় এক হইয়া যায়; যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ফটিকটিও লোহিত দেখায়, যদি পুষ্পটি নীল হয়, তবে স্ফটিকটিও নীল দেখায়।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

—শব্দ, অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

-এখানে 'শব্দ' অর্থে কম্পন। 'অর্থ' অর্থে যে স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর 'জ্ঞান' অর্থে প্রতিক্রিয়া। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা শুনিলাম, পতঞ্জলি এ-সবগুলিকেই সবিতর্ক বলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিতে আমরা বিষয়ী ও বিষয়—এই দ্বৈতভাব রক্ষা করি; শব্দ, উহার অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞানের মিশ্রণে উহা উৎপন্ন হয়। প্রথম বাহ্যকম্পন—'শব্দ'; উহা ইন্দ্রিয়-প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত হইলে তাহাকে 'অর্থ' বলে। তারপর চিত্তে এক প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ আসে, উহাকে 'জ্ঞান' বলা যায়। যাহাকে আমরা জ্ঞান (বাহ্যবস্তুর অনুভূতি) বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির মিশ্রণ বা সমষ্টি (সঙ্কীর্ণ) মাত্র। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা পাইয়াছি, তাহার সবগুলিতে এই মিশ্রণই আমাদের ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হইবে, তাহা উচ্চতর।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

—যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক থাকে না, যখন উহা ধ্যেয় বস্তুর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি।

পূর্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, এই তিনটি একত্র অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আসে, যখন উহারা আর মিশ্রিত হয় না, তখন আমরা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। এখন প্রথমতঃ এই তিনটি কি, তাহা আমরা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্বের সেই হ্রদের উপমার কথা স্মরণ কর; চিত্তকে হ্রদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তুর কম্পন যেন উহার উপর একটি তরঙ্গের ন্যায় আসিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই ঐ স্থির হ্রদ রহিয়াছে। মনে কর, আমি 'গো' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার চিত্তহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঐ তরঙ্গটি 'গো'শব্দ-সূচিত ভাব; আমরা উহাকেই আকার বা অর্থ বলিয়া থাকি। তুমি যে মনে করিয়া থাকো, আমি একটি 'গো'কে জানি, উহা কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তরঙ্গমাত্র। উহা বাহ্য ও

আভ্যন্তর শব্দপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গটিও লয় পায়। একটি বাক্য বা শব্দ ব্যতীত তরঙ্গ থাকিতে পারে না। অবশ্য তোমার মনে হইতে পারে যে, যখন কেবল 'গো'-বিষয়ে চিন্তা কর অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কানে আসে না, তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন ঐ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাকো। তুমি তখন নিজের মনে-মনেই 'গো' এই শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে থাকো, তাহা হইতেই তোমার অন্তরে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন তরঙ্গ উঠিতে পারে না; যখন বাহির হইতে ঐ উত্তেজনা আসে না, তখন ভিতর হইতেই উহা আসে। আর যখন শব্দটি থাকে না, তখন তরঙ্গটিও থাকে না। তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উহাই জ্ঞান। এই তিনটি আমাদের মনে এত দৃঢ়সম্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, তখনই ইন্দ্রিয়গণ কম্পিত হইয়া থাকে, আর প্রবাহসকল প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারা একটির পর আর একটি এত শীঘ্র আসিয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়া লওয়া অতি কঠিন; এখানে যে সমাধির কথা বলা হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে সকল সংস্কারের আধারভূমি স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই আমরা ঐগুলির মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে পৃথক্ করিতে পারি, ইহাকেই নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি বলে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

—পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথা বলা হইল, তদ্দ্বারাই সবিচার ও নির্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় সূক্ষ্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল।

এখানে পূর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্বোক্ত দুইটি ধ্যানের বিষয় স্থূল, এখানে ধ্যানের বিষয় সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গ-পর্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

—সূক্ষ্মবিষয় অলিঙ্গে অর্থাৎ অব্যক্ত বা প্রধানে (প্রকৃতিতে) পর্যবসিত হয়।

ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থূল বলে। সূক্ষ্মবস্তু তন্মাত্রা হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিস্বরূপ), অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব (যাহা সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান (প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত), এ-সবই সূক্ষ্ম বস্তুর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর পড়েন না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

—পূর্বোক্ত সমাধিগুলি সবই সবীজ সমাধি।

এই সমাধিগুলিতে পূর্বকর্মের বীজ নাশ হয় না; সুতরাং ঐগুলি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। তবে এগুলি দ্বারা কি হয়? তাহা পরবর্তী সূত্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

নির্বিচার-বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

—নির্বিচার সমাধিতে সত্ত্বগুণপ্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়, (ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা)।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

—উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে ঋতম্ভর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে।

পরসূত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

—যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা সাধারণ বস্তুবিষয়ক। যে-সকল বিষয় আগম-ও অনুমান-জন্য জ্ঞানের গোচর নয়, তাহারা পূর্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য।

ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণ-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষানুভব, তদুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। 'বিশ্বস্ত লোক' অর্থে যোগীরা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ঋষি অর্থে বেদবর্ণিত

ভাবগুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ যাঁহারা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এইজন্ত যে, উহা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাঁহারা বলেন, শুধু শাস্ত্র আমাদিগকে সত্য অনুভব করাইতে কখনই সমর্থ নয়। আমরা সমগ্র বেদপাঠ করিলাম, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্তু যখন আমরা সেই শাস্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কার্য করি, তখনই আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান যেখানে ঘেঁষিতে পারে না, উহা সেখানেও প্রবেশ করিতে সমর্থ, সেখানে আপ্তবাক্যেরও কোন কার্যকারিতা নাই। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম, উহাই ধর্মের সার, আর অবশিষ্ট যাহা কিছু—যথা ধর্মবক্তৃতাশ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তকপাঠ বা বিচার—কেবল ঐ পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নয়। কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সায় দেওয়া বা না-দেওয়া প্রকৃত ধর্ম নয়। যোগীদিগের মূল ভাব এই যে, আমরা যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি, ধর্মও তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বরং ধর্ম আরও গভীরভাবে অনুভূত হইতে পারে। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্মের যে-সকল প্রতিপাদ্য সত্য আছে, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ঐগুলি প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে না। চক্ষুদ্বারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বা হস্তদ্বারা ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারি না। আর ইহাও জানি যে, বিচার আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে না; উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সমস্ত জীবন আমরা বিচার করিতে পারি, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে পারিব না। এইরূপ বিচার তো সহস্রবর্ষ ধরিয়া চলিতেছে; আমরা যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি, তাহাই ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়া থাকি। অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়ানুভূতিরূপ গণ্ডির ভিতরেই ভ্রমণ করিতে হইবে; উহা তাহার বাহিরে কখনই যাইতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতির ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে। যোগীরা বলেন, মানুষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি দুই-ই অতিক্রম করিতে পারে। নিজ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের আছে, আর এই শক্তি

প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জীবে অন্তর্নিহিত। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তর্কের অগম্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

—এই সমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়া) সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না।

আমরা পূর্বসূত্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র উপায়—একাগ্রতা। আমরা আরও দেখিয়াছি পূর্বসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের ঐ প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আসে। যখনই ঈশ্বরচিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই ঐ-সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য সময়ে এগুলি তত প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই এগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা কর, তখনই উহারা নিশ্চয় আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই এগুলি এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি ঐগুলিকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ বলিয়াই উহারা সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য সময়ে উহারা ঐভাবে বল প্রকাশ করে না। এ-সকল পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই বা কত! চিত্তের কোন স্থানে উহারা জড়ো হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাঘ্রের মতো লম্ফ দিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঐগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেই ভাবটিই আসে, অন্যান্য ভাবগুলি চলিয়া যায়। তাহা না হইয়া ঐগুলি ঐ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মনের একাগ্রতা-শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা সংস্কারসমূহের আছে। সুতরাং যে সমাধির কথা এইমাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ উহা ঐ সংস্কারগুলি দমন করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধি-অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উত্থিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে যে, অন্যান্য সংস্কারের কার্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিবে।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

—তাহারও (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ করে) অবরোধ করিতে পারিলে সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নির্বীজ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহা প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত। আত্মা এই-সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হন কেন? চিত্তে নানাপ্রকার তরঙ্গ উঠিয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমরা কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। যদি ক্রোধরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধযুক্ত মনে করি; বলিয়া থাকি আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি প্রেমের একটি তরঙ্গ চিত্তে উত্থিত হয়, তবে ঐ তরঙ্গে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মনে করি, আমি ভালবাসিতেছি। যদি দুর্বলতারূপ তরঙ্গ আসে, উহাতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয় এবং মনে করি আমি দুর্বল। এই সংস্কারগুলি আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিলেই এই-সব বিভিন্ন ভাব উদিত হইয়া থাকে। চিত্তহ্রদে যতদিন পর্যন্ত একটি তরঙ্গও থাকিবে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হইবে না। যে পর্যন্ত না সকল তরঙ্গ একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমেই শিক্ষা দেন, এই তরঙ্গ-রূপ বৃত্তিগুলি কি; তারপর বলেন, ঐগুলি দমন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি। তৃতীয়তঃ শিক্ষা দিলেন—যেমন এক বৃহৎ অগ্নি ক্ষুদ্র অগ্নিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি তরঙ্গকে কিভাবে এত প্রবল করা যায়, যাহাতে অপর তরঙ্গগুলি একেবারে উহাতে লুপ্ত হইয়া যায়। যখন একটি মাত্র তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহাকেও দমন করা সহজ হইবে। যখন উহাও চলিয়া যাইবে, তখনই সেই সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলে। তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজ-স্বরূপে নিজ-মহিমায় অবস্থান

করিবেন। আমরা তখনই জানিতে পারিব, আত্মা মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ নন, আত্মাই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র মৌলিক পদার্থ, সুতরাং আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আত্মা অমর, অবিনশ্বর, নিত্য, চৈতন্যঘন সত্তা-স্বরূপ।

সাধন-পাদ

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

—তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল-সমর্পণকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে।

পূর্ব অধ্যায়ে যে-সকল সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করা অতি কঠিন। এইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে ঐ-সকল সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার প্রথম সোপানকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ—কর্মদ্বারা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেন অশ্ব, মন তাহার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, আত্মা সেই রথের আরোহী আর এই শরীর রথস্বরূপ।[১] মানুষের আত্মাই গৃহস্বামী, রাজা-রূপে এই রথে তিনি বসিয়া আছেন। অশ্বগণ যদি অতি প্রবল হয়, রশ্মিদ্বারা সংযত না থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিরূপ সারথি ঐ অশ্বগণকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে তাহা না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সংযত থাকে, আর মনরূপ রশ্মি বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তে দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে, তবে ঐ রথ ঠিক উহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। এখন এই তপস্যা-শব্দের অর্থ কি? 'তপস্যা' শব্দের অর্থ—এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কার্য করিতে না দিয়া আত্মবশে রাখা।

পাঠ বা স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, উপন্যাস বা গল্পের বই পড়া নয়—যে-সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তিবিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ আছে, সেই-সকল গ্রন্থপাঠ। আবার 'স্বাধ্যায়' বলিতে বিতর্কমূলক পুস্তকপাঠ মোটেই বুঝায় না। বুঝিতে হইবে যোগী বিতর্কমূলক পাঠ ও আলোচনা শেষ করিয়াছেন; তিনি তৃপ্ত, উহাতে আর তাঁহার রুচি নাই। তিনি পাঠ করেন শুধু তাঁহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার জন্য। দুই প্রকার

১ তুলনীয়: কঠ উপ., ১।৩।৩-৪

শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে: 'বাদ' (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক) ও সিদ্ধান্ত (মীমাংসাত্মক)। অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ প্রথমোক্ত প্রকার জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, উহা তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ—প্রত্যেক বিষয়ের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়া বিচার করা; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায়—সমাধানে উপনীত হন। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্তবিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে। শাস্ত্র অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব সকল বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করা জ্ঞানলাভের গোপন রহস্য। ঐ সারটুকু লইয়া ঐ উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ[১] প্রচলিত আছে—যদি তুমি কোন রাজহংসের সম্মুখে একপাত্র জলমিশ্রিত দুগ্ধ ধর, তবে সে দুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া অসারটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্যক। অন্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। যোগী এই তর্কযুক্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য—ঐ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, (বিচার করিও না; যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আসে, তুমি তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। কোন তর্কের উত্তর না দিয়া শান্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ তর্ক কেবল মনকে চঞ্চল করে। তর্কের প্রয়োজন ছিল কেবল বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য; অযথা বুদ্ধিকে চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি দুর্বল যন্ত্রমাত্র, উহা আমাদিগকে শুধু ইন্দ্রিয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে। যোগী চান ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির রাজ্যে যাইতে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এই-বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং আর তর্ক করেন না, মৌন অবলম্বন করেন। তর্ক করিতে গেলে মনের সাম্য নষ্ট হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; ইহা তাঁহার পক্ষে বিঘ্নমাত্র। এই-সব তর্ক ও যুক্তির দ্বারা তত্ত্বান্বেষণ শুধু প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে।

---

১ অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

এই তর্কযুক্তির অতীত রাজ্যে উচ্চতর তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে। সমগ্র জীবনটা কেবল বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় বিবাদ বা বিতর্ক-সমিতি লইয়া কাটাইবার জন্য নয়।

ঈশ্বরে কর্মফল-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্য নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্তিতে অবস্থান করা বুঝায়।

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

—ঐ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন সমাধি অভ্যাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং ক্লেশজনক বিঘ্নসমুদয় ক্ষীণ করা।

(আমরা অনেকেই মনকে আদুরে ছেলের মতো করিয়া ফেলিয়াছি। উহা যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি। এই জন্য সর্বদা ক্রিয়াযোগের অভ্যাস আবশ্যক, যাহাতে মনকে সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যায়। এই সংযমের অভাব হইতেই যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ও তাহাতেই ক্লেশের উৎপত্তি। এগুলি দূর করিবার উপায়—ক্রিয়াযোগের দ্বারা মনকে বশীভূত করা, মনকে উহার কার্য করিতে না দেওয়া।)

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (জীবনে আসক্তি), —এইগুলিই পঞ্চ ক্লেশ।

ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনরূপে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে। অবশ্য অবিদ্যাই কারণ এবং অন্য চারটি ফল। অবিদ্যাই আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ দুঃখ দেয়? আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ; আত্মাকে অজ্ঞান, ভ্রম বা মায়া ব্যতীত আর কোন্ বস্তু দুঃখী করিতে পারে? আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

—অবিদ্যাই পরবর্তীগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র; এগুলি কখন লীন (সুপ্ত)ভাবে, কখন সূক্ষ্মভাবে, কখন অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া থাকে, কখন বা প্রকাশিত (বিস্তারিত) থাকে।

অবিদ্যাই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের (জীবনে আসক্তির) কারণ। ঐ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। কখন ঐগুলি 'সুপ্ত'ভাবে থাকে। তোমরা অনেক সময় 'শিশুতুল্য নিরীহ' এই বাক্য শুনিয়া থাকো, কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়তো দেবতা বা অসুরের ভাব রহিয়াছে। ঐ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। যোগীর হৃদয়ে পূর্বকর্মের ফলস্বরূপ ঐ সংস্কারগুলি 'তনু' (সূক্ষ্ম)-ভাবে থাকে। ইহার তাৎপর্য এই, ঐগুলি খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে; যোগী ঐগুলি দমন করিয়া রাখিতে পারেন—যাহাতে উহারা ব্যক্ত হইতে না পায়। 'বিচ্ছিন্ন' অবস্থায় কতকগুলি প্রবল সংস্কার অন্য কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের জন্য অভিভূত বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু যখনই ঐ কারণগুলি চলিয়া যায়, তখনই আবার অন্য সংস্কারগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই শেষ অবস্থাটির নাম 'উদার' (বিস্তৃত)। ঐ অবস্থায় সংস্কারগুলি অনুকূল পরিবেশ পাইয়া শুভ বা অশুভরূপে প্রবলভাবে কার্য করিতে থাকে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

—অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে 'অবিদ্যা' বলে।

এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্যা। আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিদ্যা কি। আমরা সকলেই মনে করি, 'আমি শরীর; শুদ্ধ জ্যোতির্ময় নিত্য-আনন্দস্বরূপ আত্মা নই'—ইহাই অবিদ্যা। আমরা মানুষকে শরীর বলিয়াই ভাবি এবং সেইভাবেই দেখি, ইহা মহা ভ্রম।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা ॥ ৬ ॥

—দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিতা।

আত্মাই যথার্থ 'দ্রষ্টা', তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনন্ত ও অমর। আর 'দর্শনশক্তি' অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি? চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ—এইগুলি আত্মার যন্ত্র। এইগুলি তাঁহার বাহ্য জগৎ দেখিবার যন্ত্রস্বরূপ, আর আত্মার সহিত ঐগুলির একীভাবকে অস্মিতারূপ অবিদ্যা বলে। আমরা বলিয়া থাকি, 'আমি চিত্ত', 'আমি চিন্তা', 'আমি রুষ্ট হইয়াছি', অথবা 'আমি সুখী'। কিন্তু কিরূপে আমরা

রুষ্ট হইতে পারি বা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি? আত্মার সহিত নিজেকে অভেদ জানিতে হইবে। আত্মার তো কখন পরিণাম হয় না। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এই সুখী, এই দুঃখী হইতে পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। কে তাঁহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে? আত্মা সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কে তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে? জগতের কোন কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য করিতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতাবশতঃ নিজদিগকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিয়া ফেলি এবং মনে করি সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

—যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে।

আমরা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি; যে-সব বিষয়ে আমরা সুখ পাই, সেগুলির দিকে মন একটি প্রবাহের মতো প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ-কেন্দ্রের দিকে ধাবমান আমাদের মনের ঐ প্রবাহকেই 'রাগ বা আসক্তি' বলে। আমরা যাহাতে সুখ পাই না, এমন কোন বিষয়ে আমরা কখনই আকৃষ্ট হই না। অনেক সময়ে আমরা নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহা সর্বত্রই খাটে। আমরা যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হই।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

—দুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষকে দ্বেষ বলে।

যাহাতে আমরা দুঃখ পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাই।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

—যাহা পূর্ব পূর্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা।

এই জীবনের প্রতি মমতা প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর পরজন্ম-সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার অনেক চেষ্টা

হইয়াছে, মানুষ জীবনকে এত বেশী ভালবাসে বলিয়া ভবিষ্যতেও সে একটি জীবন আকাঙ্ক্ষা করে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্যদেশসমূহে এই জীবনের প্রতি মমতা হইতে যে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাব্যতা সূচিত হয়, তাহা কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, অন্যান্য জন্তুর পক্ষে নয়। ভারতবর্ষে—জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিস্বরূপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারি না বা বুঝিতেও পারি না। কুক্কুটশাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটী দ্বারা হংসডিম্ব ফুটানো হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে; কুক্কুটী-মাতা মনে করে, শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে এই কুক্কুটশাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল অথবা ঐ হংসশাবকগুলি কোথায় শিখিল জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান? যদি বলো, ইহা সহজাত জ্ঞান (instinct), তবে তো কিছুই বুঝা গেল না—কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ করা হইল, ব্যাখ্যা কিছুই হইল না। এই সহজাত জ্ঞান কি? এইরূপ সহজাত জ্ঞান আমাদেরও অনেক আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন; আপনাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির পর আর একটিতে কত যত্নের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহু বৎসরের অভ্যাসের পর এখন আপনারা হয়তো কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর আঙুলগুলি আপনা-আপনি চলিতে থাকিবে। উহা এখন আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য যে-সব কাজ আমরা করিয়া থাকি, সেগুলি সম্বন্ধেও ঐরূপ। অভ্যাসের দ্বারা কোন কাজ স্বাভাবিক হইয়া যায়, স্বয়ংক্রিয় হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এখন যে ক্রিয়াগুলিকে স্বভাবজ

বলি, সেগুলি পূর্বে বিচার-সহিত করিতে হইত, এখন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদের ভাষায় সহজাত জ্ঞান যুক্তি-বিচারের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র। বিচার-জনিত জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান বা সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব আমরা যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা যে বিচারজনিত জ্ঞানের সঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র, এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত যুক্তিবিচার সম্ভব নয়, সুতরাং সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। কুক্কুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, এ-দুইটিই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এখন প্রশ্ন: এই অনুভূতি—জীবাত্মার অথবা কেবল শরীরের? হংস এখন যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা কেবল ঐ হংসের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতা হইতে আসিতেছে, না উহা হংসের নিজের অভিজ্ঞতা? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা কেবল তাহার শরীরের ধর্ম। কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা মনের অনুভূতি—শরীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে মাত্র। ইহাকেই পুনর্জন্মবাদ বলে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—আমাদের সমুদয় জ্ঞান, যেগুলিকে প্রত্যক্ষ, বিচার-জনিত বা সহজাত জ্ঞান বলি, সে-সবই জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল, উহাই এখন নিম্নস্তরে নামিয়া সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানে উন্নীত হইয়া থাকে। সমুদয় জগতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জন্মবাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। পুনঃপুনঃ অনুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কালক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে দুঃখযন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা জানেন, এই শরীর চলিয়া যাইবে, যাঁহারা বলেন, 'ভয় নাই, চিন্তা নাই; আমাদের শত শত শরীর হইয়া গিয়াছে, আত্মা কখনও মরে না', তাঁহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে আমরা এই জীবনের প্রতি আসক্তি দেখিতে পাই। কেন এই জীবনের প্রতি আসক্তি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের

সহজাত বা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা 'সংস্কারে' পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। এই সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম বা গুপ্তভাবে চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্বমৃত্যুর এই-সব অভিজ্ঞতা, যেগুলিকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, সেগুলি অবচেতন-ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। ঐগুলি চিত্তেই বাস করে, নিষ্ক্রিয় মনের তরঙ্গ নয়, ভিতরে ভিতরে কাজ করিতেছে।

এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ যেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশিত, সেগুলিকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি; ঐগুলিকে দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই সূক্ষ্মতর সংস্কারগুলির সম্বন্ধে কি করা যায়? ঐগুলি দমন করা যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই, তখন আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাট তরঙ্গাকার ধারণ করে। আমি উহা অনুভব করিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়া নাড়িতে পারি, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীরে উহার কারণে যাইতে না পারি, তবে কখনই আমি উহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলিল, আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি উত্তেজিত হইতেছি, সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, আত্মবিস্মৃত হইলাম, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন নিজেকে মিশাইয়া ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল আমি যেন ক্রুদ্ধ হইতেছি। তখন ক্রোধ একটি ও আমি একটি, পৃথক্ পৃথক্ ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। ঐ বৃত্তিগুলিকে মূলে বীজভাবেই সূক্ষ্মাবস্থাতেই সংযত করিতে হইবে। ঐগুলি আমাদের উপর ক্রিয়া করিতেছে,—আমরা ইহা বুঝিবার পূর্বেই ঐগুলিকে সংযত করিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নয়। যে অবস্থায় ঐ বৃত্তিগুলি অবচেতনভূমি হইতে একটু একটু করিয়া উদিত হয়, তাহাকেই বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা বলা যায়। যখন কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্বুদ উত্থিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই না; শুধু তাই নয়, উপরিভাগের খুব নিকটে আসিলেও আমরা উহা

দেখিতে পাই না; যখনই উহা উপরে উঠিয়া মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখনই আমরা জানিতে পারি—একটি তরঙ্গ উঠিতেছে। যখন আমরা সূক্ষ্মাবস্থাতেই তরঙ্গগুলিকে ধরিতে পারিব, তখনই ঐগুলিকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইব। এইরূপে স্থূলভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই সূক্ষ্মাবস্থায় ঐ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি যত দিন না আমরা সংযত করিতে পারি, ততদিন আমাদের কোন বৃত্তিই পূর্ণভাবে জয় করার আশা নাই। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইলে ঐগুলিকে মূলে সংযত করিতে হইবে। কেবল তখনই আমরা বৃত্তিগুলির বীজ পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব; যেমন ভর্জিত বীজ মৃত্তিকায় ছড়াইয়া দিলে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি এই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি আর উদিত হইবে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

—সেই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা (কার্যকে কারণে পরিণত করিয়া) নাশ করিতে হয়।

ধ্যানের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে সূক্ষ্মসংস্কার বা বাসনা বলে। উহা নাশ করিবার উপায় কি? উহাকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। প্রতিলোম-পরিণাম অর্থ—কার্যের কারণে লয়। চিত্তরূপ কার্য যখন সমাধি-দ্বারা অস্মিতা বা অহঙ্কার-রূপ স্বকারণে লীন হইবে, তখনই চিত্তের সহিত ঐ সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে। ধ্যানের দ্বারা এগুলি নষ্ট করা যায় না।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

—ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থূলাবস্থা নাশ করিতে হয়।

ধ্যানই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মন বৃত্তিরূপ তরঙ্গগুলি প্রশমিত করিতে পারে। যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাস কর, যতদিন না উহা তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, যতদিন না ঐ ধ্যান আপনা হইতেই আসে ততদিন যদি এরূপ কর, তাহা হইলে ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে, সংযত হইবে।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

—কর্মের আশয় বা আধারের মূল এই পূর্বোক্ত ক্লেশগুলি ; বর্তমান অথবা পর-জীবনে উহারা ফল প্রসব করে।

কর্মাশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সমষ্টি। আমরা যে-কোন কাজ করি না কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। আমরা মনে করি, ঐ কাজটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। উহা সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, ঐ স্থানেই রহিয়াছে। যখন আমরা ঐ কার্যের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্বার উদিত হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। অতএব উহা মনের ভিতরই গূঢ়ভাবে ছিল ; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত। সুতরাং প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে। সুখকর অথবা দুঃখকর—সকল প্রকার চিন্তাকেই 'ক্লেশ'-জনক বাধা বলে, কারণ যোগীদের মতে উভয়েই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে-সব সুখ পাওয়া যায়, পরিণামে সেগুলি দুঃখ আনিবে। ভোগে ভোগতৃষ্ণা বাড়িতেই থাকে ; তাহার ফল দুঃখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাসনা করিতেছে ; বাসনা করিতে করিতে যখন সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, কোনমতে তাহার বাসনা আর পূর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীরা শুভ ও অশুভ সংস্কার-সমষ্টিকে 'ক্লেশ' বলিয়া থাকেন, এগুলি আত্মার মুক্তি পথে বাধা দেয়।

সকল কার্যের সূক্ষ্মমূলস্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে ; তাহারা কারণস্বরূপ হইয়া ইহজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে (দৃষ্ট- বা অদৃষ্ট- জন্ম-বেদনীয়)। বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন ঐ সংস্কারগুলি খুব প্রবল হয়, তখন শীঘ্রই ফল দান করে ; অত্যুৎকট পুণ্য বা পাপকর্ম ইহজীবনেই ফল উৎপন্ন করে। যোগীরা বলেন, যে-সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, তাঁহারা ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। যোগীদের গ্রন্থে এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইহারা নিজেদের

শরীরের উপাদান পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, দেহের পরমাণুগুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাঁহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাঁহাদের নিকট আসিতে পারে না। এরূপ হইবে না কেন? শারীরবিজ্ঞানে খাদ্যের অর্থ—সূর্য হইতে শক্তিগ্রহণ। ঐ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদ আবার কোন পশু ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আমরা সূর্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লই। যদি এইরূপ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার একটিমাত্র উপায় থাকিবে কেন? আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তিসংগ্রহের উপায় ঠিক তাহা নয়; আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যোগীরা বলেন, তাঁহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও তাঁহারা যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। উর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বিস্তার করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে সেই তন্তু অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের উপাদান-পদার্থ হইতে এই স্নায়ুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই স্নায়ুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কাজ করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এই তত্ত্বটি আর একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর যে-কোন দিকে তড়িৎশক্তি প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদিগকে উহা তারের ভিতর দিয়া পাঠাইতে হয়। প্রকৃতি তো বিনা তারেই বহু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করিতেছে। আমরাই বা কেন তাহা করিতে পারিব না? আমরা চতুর্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, তাহা প্রায় তড়িৎশক্তির মতো। স্নায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যে কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আছে ইহা অতি স্পষ্ট, কারণ তড়িতের ন্যায় উহারও দুই প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের ধর্মগুলি উহাতে দেখা যায়। এই তড়িৎশক্তিকে

এখন আমরা কেবল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা কেন ইহা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইব না? যোগী বলেন, ইহা খুবই সম্ভব এবং ইহা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকার্য হইলে তুমি সমগ্র জগতে এই শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্য না লইয়াই যেখানে ইচ্ছা যে-কোন শরীরের দ্বারা কার্য করিতে পারিবে। যখন কোন জীবাত্মা এই স্নায়ুপ্রণালীর ভিতর দিয়া কাজ করে, আমরা তখন বলি মানুষটি জীবিত, এবং যখন এই যন্ত্রগুলির দ্বারা কাজ হয় না, তখন বলি মানুষটি মৃত। কিন্তু যখন কেহ এই-সকল স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে বা স্নায়ু ব্যতীতই কাজ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু—এই দুই শব্দের আর কোন অর্থই নাই। জগতে সব শরীরই তন্মাত্রা দ্বারা রচিত, প্রভেদ কেবল বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই ঐ বিন্যাসের কর্তা হও, তাহা হইলে তুমি যেরূপে ইচ্ছা, ঐ তন্মাত্রাগুলির বিন্যাস করিয়া শরীর রচনা করিতে পারো। এই শরীর—তুমি ছাড়া আর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়া দিত, তবে তোমাকে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। ঐ খাদ্য হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমি। ঐ রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। আমরাই দেহের প্রভু এবং উহাতে বাস করিতেছি। দেহ কিভাবে আবার তরুণ করিয়া তোলা যায়, সেই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যন্ত্র-তুল্য স্বয়ংক্রিয়—অবনত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা দেহের পরমাণুগুলির বিন্যাসপ্রণালী ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা যন্ত্রের মতো যাহা করিতেছি, তাহা জ্ঞাতসারে করিতে হইবে। আমরাই দেহের প্রভু, সুতরাং আমাদিগকেই সেই বিন্যাসপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত দেহকে আবার তরুণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু—কিছুই থাকিবে না।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

—মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখদুঃখাদি ভোগ হয়।

মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপ কারণগুলি ভিতরে থাকে, তাহারাই ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়া কার্যের উদয় হয়, আবার কার্য সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া পরবর্তী কার্যের কারণস্বরূপ হয়। বৃক্ষ বীজ প্রসব করে, বীজ আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হয়; এইরূপেই কার্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার কাজকর্ম সবই পূর্বসংস্কারের ফলস্বরূপ। এই কার্যগুলি আবার সংস্কারে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্যের কারণ হইবে; এইভাবেই চলিতে থাকে। এইজন্যই এই সূত্র বলিতেছে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্য অবশ্যই হইবে। এই ফল প্রথমতঃ 'জাতি'রূপে প্রকাশ পায়; কেহ বা মানুষ হইবে, কেহ দেবতা, কেহ পশু, কেহ বা অসুর হইবে। তারপর এই কর্ম আবার আয়ুকেও নিয়মিত করে। একজন হয়তো পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে, আর একজন একশত বৎসর, আবার কেহ হয়তো দুই বৎসর বয়সেই মরিয়া যায়; সে আর পূর্ণবয়স্ক হয় না। জীবনের এই-সব বিভিন্নতা পূর্বকর্মদ্বারাই নিয়মিত হয়। কেহ যেন সুখভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদি সে বনে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সুখ তাহাকে অনুসরণ করিবে। আর একজন যেখানেই যায়, দুঃখ তাহাকে অনুসরণ করে, সবই তাহার নিকট দুঃখময়। এই-সবই তাহাদের নিজ নিজ পূর্বকর্মের ফল। যোগীদিগের মতে পুণ্যকর্ম হইতে সুখ, পাপকর্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, সে নিশ্চয়ই দুঃখকষ্টরূপে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

—পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল যথাক্রমে আনন্দ ও দুঃখ।

**পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ
দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥**

—কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগ-ব্যাঘাতের আশঙ্কায় অথবা সুখ-সংস্কারজনিত নূতন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং গুণবৃত্তি (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই যেন দুঃখ বলিয়া বোধ হয়।

যোগীরা বলেন, যাঁহার বিবেকশক্তি আছে, যাঁহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সুখ ও দুঃখ নামধেয় সর্ববিধ বস্তুর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন উহারা সর্বদা সর্বত্র সমভাবে রহিয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মানুষ সমগ্র জীবন কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে কখনই তাহার বাসনাপূরণে সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, 'জীবনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্তেই প্রাণিগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও মনে করিতেছি, আমরা কখনই মরিব না।'[১] চতুর্দিকে মূর্খ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পণ্ডিত—শুধু আমরাই মূর্খশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। সর্বপ্রকার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাসা। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও স্বার্থপরতা-মিশ্রিত। যোগী বলেন, 'পরিণামে দেখিতে পাইব, এমন কি পতিপত্নীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুদের প্রীতি—সবই অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া আসে।' এই সংসারে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখনই সংসারের সকল বাসনা, এমন কি ভালবাসা পর্যন্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় মানুষ বুঝিতে পারে এই জগৎ কিভাবে ব্যর্থ, কতখানি স্বপ্নসদৃশ! তখনই তাহার চোখে বৈরাগ্যের ক্ষণিক আলো দেখা দেয়, তখনই সে অতীন্দ্রিয় সত্তার যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই জগদতীত তত্ত্বটি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এমন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহাকে এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সুখভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধই দুঃখের কারণ। একটি মানুষকে একদিকে, অপরটি আর একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

---

১ অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।—মহাভারত, বনপর্ব

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

—যে দুঃখ এখনও আসে নাই, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

কর্মের কিঞ্চিদংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমরা বর্তমানে ভোগ করিতেছি, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমাদের যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে, তাহা তো চুকিয়া গিয়াছে। আমরা বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে, কেবল যে-কর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে, তাহাই আমরা জয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। এই দিকেই আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। এজন্যই পতঞ্জলি বলিয়াছেন (২।১০) —সংস্কারগুলিকে কারণে লয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

—এই যে হেয়, অর্থাৎ যে দুঃখকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ।

এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মানুষের আত্মা—পুরুষ। দৃশ্য কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্যন্ত সমুদয় প্রকৃতি। এই পুরুষ ও (প্রকৃতির) মনের সংযোগ হইতেই সমুদয় সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধস্বরূপ; যখনই উহা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুখ বা দুঃখ অনুভব করে বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

—'দৃশ্য' বলিতে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা প্রকাশ-ক্রিয়া- ও স্থিতিশীল। উহা দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য।

দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা গঠিত; ভূত বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম বা গুণ আবার তিন

প্রকার, যথা—প্রকাশ, কার্য ও জড়তা। ইহাদিগকেই অন্ত ভাষায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—যাহাতে পুরুষ সমুদয় ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার মহান্ ঐশ্বরিক ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি বড় সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া কর্দমের ভিতর বাস করিতেন, তাঁহার অবশ্য একটি শূকরী ছিল, সেই শূকরী হইতে তাঁহার অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। দেবতারা তাঁহার দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপনি দেবরাজ, দেবতারা আপনার শাসনে বাস করেন; আপনি এখানে কেন?' কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, 'আমি বেশ আছি, কিছু ভাবিও না; এই শূকরী ও শাবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না।' তখন সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহারা স্থির করিলেন, একে একে শাবকগুলি সব মারিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া শাবকগুলি সব নিহত হইলে দেবগণ অবশেষে সেই শূকরীকেও মারিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; দেবতারা ইন্দ্রের শূকরদেহটি চিরিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শূকরদেহ হইতে নির্গত হইয়া হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমি দেবরাজ, আমি এই শূকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম; শুধু তাই নয়, সমগ্র জগৎ শূকরদেহ ধারণ করুক, —আমি এইরূপ ইচ্ছাও করিতেছিলাম।' পুরুষও এইভাবে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া বিস্মৃত হন যে, তিনি শুদ্ধস্বভাব ও অনন্তস্বরূপ। পুরুষকে 'অস্তিত্ববান্' বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্বস্বরূপ। পুরুষ বা আত্মাকে 'জ্ঞানী' বলিতে পারা যায় না, কারণ আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাকে 'প্রেমসম্পন্ন' বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। আত্মা অস্তিত্ববান্, জ্ঞানযুক্ত অথবা প্রেমময়—এরূপ বলা ভুল। প্রেম, জ্ঞান ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নয়, ঐগুলি তাঁহার স্বরূপ। যখন ঐগুলি কোন বস্তুর উপর প্রতিবিম্বিত হয়, তখন ঐগুলিকে সেই বস্তুর গুণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু এগুলি পুরুষের গুণ নয়, এগুলি সেই মহান্ আত্মার—অনন্ত পুরুষের স্বরূপ—তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ

করিতেছেন। কিন্তু তিনি স্বরূপ ভুলিয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয়া বলো, 'তুমি শূকর নও', তিনি চীৎকার করিতে থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন।

মায়ার মধ্যে—এই স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। এখানে কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল হাহাকার—এখানে কয়েকটি স্বর্ণগোলক গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহা পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে না। প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, ধৈর্যের সহিত ইহা শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, কিরূপে—এই প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, মন ও জগতের সহিত এক করিয়া ফেলিয়া পুরুষ নিজেকে দুঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও বলেন, এই দুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়া। অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে যত শীঘ্র উহা শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা নিজেদের এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা নিজেরা এই ফাঁদে পা দিয়াছি, নিজ চেষ্টাতেই আমাদিগকে ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। অতএব এই পতিপত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি ও অন্যান্য যে-সকল ছোটখাট স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্বদা স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই নির্বিঘ্নে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কখনও ভুলিও না—এই অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। অভিজ্ঞতাই—আমাদের একমাত্র মহান্ শিক্ষক, কিন্তু ঐ সুখদুঃখগুলিকে কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে। এগুলি ধাপে ধাপে আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের মতো মনে হইবে, এবং উহা আপনিই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতেই হইবে, কিন্তু আমরা যেন আমাদের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত না হই।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥

—গুণের এই কয়েকটি অবস্থা আছে, যথা—বিশেষ, অবিশেষ, চিহ্নমাত্র (মহৎ) ও চিহ্ন-শূন্য (প্রকৃতি)।

আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র সাংখ্য-দর্শনের উপর স্থাপিত; এখানেও পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের জগৎসৃষ্টি-প্রকরণ আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—দুই-ই। এই প্রকৃতিতে আবার ত্রিবিধ উপাদান আছে, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃ উপাদানটি অন্ধকার, যাহা কিছু অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্থ সবই তমোময়। রজঃ ক্রিয়াশক্তি।' সত্ত্ব শান্তভাব—প্রকাশস্বভাব। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে বলে 'অব্যক্ত'—অবিশেষ বা অবিভক্ত; ইহার অর্থ—যে অবস্থায় নামরূপের বিভাগ নাই, যে অবস্থায় ঐ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে। তারপর ঐ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, এই তিন উপাদান বিবিধভাবে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিনটি উপাদান বিরাজমান। যখন সত্ত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়; রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলস্য ও অজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করে। সাংখ্যমতানুসারে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ 'মহৎ' অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহাকে সমষ্টি-বুদ্ধি বলা যায়, ব্যষ্টি মনুষ্যবুদ্ধি উহারই একটি অংশমাত্র। সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে 'মন' ও 'বুদ্ধি'র মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। মনের কার্য কেবল বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনা-গুলিকে সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি-মহতের সমীপে উপনীত করা। বুদ্ধি ঐ-সকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে অহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম-ভূতের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্মভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া এই বাহ্য স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি, সাংখ্যদর্শনের মত—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া একখণ্ড প্রস্তর পর্যন্ত সবই এক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা লইয়াই উহাদের প্রভেদ। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রকৃতির বাহিরে, তিনি জড় নন; বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা অথবা স্থূলভূত কোন কিছুর সদৃশ

মন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্যই মৃত্যুরহিত, কারণ তিনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহা মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখনও নাশ হইতে পারে না। এই পুরুষ বা আত্মাসমূহের সংখ্যা অসীম।

এখন আমরা এই সূত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। 'বিশেষ' অর্থে স্থূল-ভূত—যেগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। 'অবিশেষ' অর্থে সূক্ষ্মভূত—তন্মাত্রা, এই তন্মাত্রা সাধারণ মাহুষ উপলব্ধি করিতে পারে না। পতঞ্জলি বলেন, 'যদি তুমি যোগাভ্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অনুভব-শক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি তন্মাত্রাগুলি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে।' তোমরা শুনিয়াছ, প্রত্যেক ব্যক্তির চারিদিকে এক প্রকার জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, কেবল যোগীই উহা দেখিতে পান। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই সূক্ষ্মকণা নির্গত হয়, যেগুলি দ্বারা আমরা আঘ্রাণ পাই, সেইরূপ আমাদের শরীর হইতেও সর্বদাই এই তন্মাত্রাসকল বাহির হইতেছে। প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ শক্তি ও ভাবরাশি বাহির হইতেছে; এবং আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই পরিবেশ এই তন্মাত্রায় পূর্ণ থাকে। ইহার প্রকৃত রহস্য না জানিলেও এইভাবেই অজ্ঞাতসারে মাহুষের মনে মন্দির, গির্জাদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্য মন্দিরনির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা কর না কেন? কারণ না জানিলেও মাহুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সকলে প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মাহুষ পবিত্র হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির অন্তরে বেশী সত্ত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহারও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মাহুষ মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়—অশ্বের সম্মুখে শকট যোজনা করে। প্রথমে মাহুষই

এই স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াছিল, তারপর সেই স্থানের পবিত্রতা আবার কারণ হইয়া অপরকেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্বদা অসাধু লোকই যাতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের মতোই অপবিত্র হইয়া যাইবে। বাড়িঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু এটি আমরা সর্বদা ভুলিয়া যাই। এই কারণেই সমধিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দিকে ঐ সত্ত্বগুণ বিকিরণ করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের উপর দিনরাত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন স্পর্শ করা যায়। সাধুর শরীর পবিত্র, তিনি যেখানে বিচরণ করেন, সেখানেই পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হয়। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই পবিত্র হইয়া যায়।

এখন 'লিঙ্গমাত্রের' অর্থ কি, দেখা যাক। 'লিঙ্গমাত্র' বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায়; উহা প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহা হইতেই অন্যান্য সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে। গুণের শেষ অবস্থাটির নাম 'অলিঙ্গ' বা চিহ্নশূন্য। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাদের তাৎপর্য এই যে, চৈতন্যই সৃষ্টির আদি বস্তু; তাহা হইতেই স্থূলভূতের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, চৈতন্য সৃষ্টির শেষ বস্তু। তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তুসকল অল্পে অল্পে জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে, এই জীবজন্তু ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মনুষ্যরূপে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, জগতের সমুদয় বস্তু যে চৈতন্য হইতে প্রসূত হইয়াছে তাহা নয়, বরং চৈতন্যই সৃষ্টির সর্বশেষ বস্তু। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও দুইটি সিদ্ধান্তই সত্য। একটি অনন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ-ইত্যাদি; প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা খ আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্য 'ক'কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু যদি তুমি উহাকে খ-ক এইভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে 'খ'কেই আদি ধরিতে

হইবে। আমরা যে দিক দিয়া দেখিতেছি, তাহার উপর উহা নির্ভর করে। চৈতন্য পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্থূলভূতের আকার ধারণ করে, স্থূলভূত আবার চৈতন্যরূপে পরিণত হয়, এইভাবেই চলিতে থাকে। সাংখ্যেরা ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ চৈতন্যকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে ঐ শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা—প্রথমে চৈতন্য, পরে জড়। বৈজ্ঞানিক জড়কে গ্রহণ করিয়া বলেন, 'প্রথমে জড়, পরে চৈতন্য'। উভয়েই একই শৃঙ্খলের কথা বলিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্য ও জড়—উভয়েরই পারে পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা বুদ্ধিরও অতীত; বুদ্ধি তাঁহারই প্রতিফলিত আলোক।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

—দ্রষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্রস্বরূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন।

এখানেও সাংখ্যদর্শনের কথা বলা হইতেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের এই মত যে, নিম্নতম বিকাশ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত; পুরুষগণ প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে আত্মা দুঃখী বা সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হন কেন? প্রতিফলনের দ্বারা। একখণ্ড স্ফটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে ঐ স্ফটিকটিকে লাল দেখাইবে; সেইরূপ আমরা যে সুখ বা দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহা বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এ-সকল কিছুই নাই। আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রকৃতি এক বস্তু, আত্মা এক বস্তু, এই দুই চিরদিন পৃথক্। সাংখ্যেরা বলেন যে, (বুদ্ধিজাত) জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে, উহা পরিবর্তনশীল; শরীরের ন্যায় উহাও ক্রমশঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যে-সকল ধর্ম, উহাতেও প্রায় সে-সকল ধর্ম বিদ্যমান। শরীরের পক্ষে নখ যেমন, এই জ্ঞানের পক্ষে দেহও সেইরূপ। নখ শরীরের একটি অংশ, উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর বাঁচিয়া থাকে। সেইরূপ এই শরীর বহুবার পরিত্যক্ত হইলেও (বুদ্ধিজাত) জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশী হইতে পারে না, কারণ উহা পরিবর্তনশীল, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। আর

যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা কখনও অবিনাশী হইতে পারে না। এই জ্ঞান অবশ্যই জড়পদার্থ। আর ইহা হইতেই বুঝাইতেছে, অন্য আর এক পদার্থ আছে। জড়পদার্থ কখনও মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সবকিছু প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং চিরকালের জন্য বদ্ধ। তবে মুক্ত কে? যিনি কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত। তুমি যদি বলো, মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, আমি বলিব, বন্ধনের ভাবটিও ভ্রমাত্মক। আমাদের জ্ঞানে এই দুই ভাবই সদা বিরাজিত, পরস্পরের আশ্রিত—একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে ইহাই আমাদের ধারণা। যদি দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে চাই, আমাদের মাথা দেওয়ালে ধাক্কা খায়; তাহা হইলে বুঝিলাম, আমরা ঐ দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমাদের একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। এবং মনে করি, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারি। প্রতিপদে এই বিরোধী ভাব-দুইটি আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে আমরা মুক্ত; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দেখিতেছি, আমরা মুক্ত নই। দুইটি ভাবের মধ্যে একটি যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও ভ্রমাত্মক হইবে; আর একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অনুভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী বলেন, এই দুইটি ভাবই সত্য, বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমরা বদ্ধ। কিন্তু আত্মা হিসাবে আমরা মুক্ত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ—কার্যকারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে। এই আত্মার মুক্তস্বভাবটি জড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পরিস্রুত হইয়া বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে। আত্মারই জ্যোতিঃ সবকিছুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির নিজের কোন আলো নাই। মস্তিষ্কে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি কেন্দ্র আছে। সকল ইন্দ্রিয়ের যে একটিমাত্র কেন্দ্র, তাহা নয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র পৃথক্ পৃথক্। তবে আমাদের এই অনুভূতিগুলি সামঞ্জস্য লাভ করে কিভাবে? কোথায় তাহারা একত্ব লাভ করে? মস্তিষ্কে যদি তাহারা এই একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। মানুষ কিন্তু একই সময়ে দেখিতে

ও শুনিতে পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই একটি একত্ব আছে। বুদ্ধি মস্তিষ্কের সহিত সম্বদ্ধ—কিন্তু এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একত্বস্বরূপ। তাঁহার নিকট গিয়াই সমুদয় বেদনা ও অনুভূতি মিলিত হয় ও একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি মিলিত ও একীভূত হয়। সেই আত্মা মুক্তস্বভাব। এই আত্মার মুক্ত স্বভাবই তোমাকে প্রতি মুহূর্তে বলিতেছে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ। সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুক্তস্বভাব নয়। তুমি তখন সেই মুক্ত স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাকো, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন, তুমি আবার ভুল করিয়াছ। এই জন্যই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্ত ও বদ্ধ, উভয় অবস্থারই বিশ্লেষণ করেন; এবং তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত, জ্ঞানঘন; বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়া তিনিই এই সান্ত (সীমাবদ্ধ) জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

—দৃশ্যের (অর্থাৎ প্রকৃতির) আত্মা (স্বভাব, প্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন আকারে পরিণাম) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও মুক্তির) জন্য।

প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাহার শক্তি প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রের আলোক যেমন তাহার নিজের নয়, প্রতিফলিত,—প্রকৃতির শক্তিও তদ্রূপ। যোগীদের মতে প্রকৃতির সমুদয় অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন; কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করা ছাড়া প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

—যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি

(বা অজ্ঞান) নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, কারণ অপরের পক্ষে উহা থাকে।

আত্মা যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহা জানানোই প্রকৃতির সব কাজের একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহা জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই সমুদয় প্রকৃতি লয় পায়। কিন্তু অনন্ত কোটি আত্মা বা পুরুষ চিরকালই থাকিবে, তাহাদের জন্য প্রকৃতি কার্য করিয়া যাইবে।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

—দৃশ্য ও উহার প্রভু দ্রষ্টার শক্তিদ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপ) স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

এই সূত্রানুসারে—আত্মা ও প্রকৃতি যখন সংযুক্ত হন, তখনই (এই সংযোগবশতঃ) উভয়ের (যথাক্রমে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব) দুই শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখনই এই জগৎপ্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু। আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দুঃখ বা সুখের কারণ—শরীরের সহিত সংযোগ। যদি আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমার শীত-গ্রীষ্ম বা অন্য কিছুরই খেয়াল থাকিত না। এই শরীর একটি সংহতি মাত্র। আমার একটি দেহ আছে, তোমার অন্য একটি দেহ আছে, সূর্যের আবার একটি পৃথক্ দেহ—এরূপ বলা কেবল রূপকথা-মাত্র। সমগ্র জগৎ জড়ের এক মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের এক বিন্দুর নাম 'তুমি', এক বিন্দুর নাম 'আমি' ও আর এক বিন্দুর নাম 'সূর্য'। আমরা জানি, এই জড়রাশি সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করিতেছে। আজ যাহা সূর্যের উপাদানভূত, কাল তাহা আমাদের শরীরের উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

—এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।

আমরা অজ্ঞানবশতঃ এক নির্দিষ্ট শরীরে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। 'আমি শরীর' এই ধারণা একটি কুসংস্কার

মাত্র। এই কুসংস্কারই আমাদিগকে সুখী বা দুঃখী করিতেছে। অজ্ঞান-প্রসূত এই কুসংস্কার হইতে আমরা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ—এই সব বোধ করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্রম করা। কি করিয়া ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া দেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন বিশেষ অবস্থায় শরীর দগ্ধ হইলেও মানুষ কোন যন্ত্রণা বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ আকস্মিক উচ্চাবস্থা হয়তো এক নিমিষের জন্য ঘূর্ণাবর্তের মতো আসে, আবার পরক্ষণেই চলিয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাভ করি, তাহা হইলে আমরা স্থায়িভাবে অনুভব করিব—শরীর হইতে আত্মা পৃথক্।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

—এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই হান (অজ্ঞানের পরিত্যাগ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি বা মুক্তি।

যোগদর্শনের মতে আত্মা অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাই সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র। যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যতদিন না আমরা প্রকৃতির প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে পারি, ততদিন তো আমরা ক্রীতদাস; প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেইভাবে চলিতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি জড়কেও বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, সুতরাং উহার সহিত সংগ্রাম করা—উহাকে জয় করা—অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি জয় করিয়াছেন,

সমুদয় জগৎ তাঁহার বশীভূত, তাঁহার দাসস্বরূপ। প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় রাজযোগে উপস্থাপিত হইয়াছে। আমরা বাহ্যজগতে যে-সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে আনিতে হইবে। এই শরীর মনের একটি বাহ্য আবরণ মাত্র। শরীর ও মন যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহা নয়, উহারা শুক্তি ও তাহার কঠিন আবরণের মতো। উহারা এক বস্তুরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা। শুক্তির আভ্যন্তরীণ পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়া ঐ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করে। এইভাবেই মনোনামধেয় এই আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম-শক্তিসমূহও বাহির হইতে স্থূল পদার্থ লইয়া তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং যদি আমরা অন্তর্জগৎ জয় করিতে পারি, তবে বাহ্যজগৎ জয় করা খুব সহজ হইয়া পড়ে। আবার এই দুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন, তাহা নয়। কতকগুলি শক্তি শারীরিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নয়। যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ সূক্ষ্মজগতের স্থূল প্রকাশ মাত্র, তেমনি বাহ্য-শক্তিগুলিও সূক্ষ্মশক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

—নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায়।

সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক—এইটি বিশেষরূপে জানা যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষ জড়ও নন, মনও নন; আর উনি প্রকৃতি নন বলিয়া উঁহার কোনরূপ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কেবল প্রকৃতিই সর্বদা পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ও পুনঃসংশ্লেষ ঘটিতেছে। যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান চলিয়া যাইবে। তখনই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্- ও সর্বব্যাপি-রূপে প্রতিভাত হইবেন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

—তাঁহার (জ্ঞানীর) বিবেকজ্ঞানের উচ্চতম ভূমির সাতটি স্তর।

যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা একটির পর আর একটি করিয়া সপ্তস্তরে আসিতে থাকে। যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি।

প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে হইবে—'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি'; মনে তখন আর কোনরূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যতক্ষণ আমাদের জ্ঞানপিপাসা থাকে, ততক্ষণ আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানেই কিছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, অমনি সেদিকে ধাবিত হই। সেখানে উহা না পাইলে মনে অশান্তি আসে, আবার অন্য একদিকে সন্ধান করি। যতদিন না অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, যতদিন না বোধ করি, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভে সাহায্য করিতে পারে না, আমাদের নিজেদের সাহায্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যান্বেষণই বৃথা। বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমরা যে সত্যের নিকটবর্তী হইতেছি, তাহার প্রথম এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যে, ঐ অসন্তোষের ভাব চলিয়া যাইবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইবে, আমরা সত্য পাইয়াছি এবং ইহা সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্যস্বরূপ সূর্য উদিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞানরজনী প্রভাত হইতেছে। তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে,—যতদিন না সেই পরমপদ লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত দুঃখ চলিয়া যাইবে। বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্তব্যের অবসান হইবে। তারপরে 'চিত্তবিমুক্তি' অবস্থা আসিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের বিঘ্নবিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে। যেমন কোন পর্বতের চূড়া হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড নিম্নে উপত্যকায় পতিত হইলে আর কখন উপরে উঠিতে পারে না, সেইরূপ মনের সংগ্রাম ও চঞ্চলতা সব নীচে পড়িয়া যাইবে, আর মনে উঠিবে না। পরবর্তী অবস্থায়—চিত্ত বুঝিতে পারিবে, ইচ্ছামাত্রই উহা স্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে। অবশেষে দেখিতে পাইব, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আছি; দেখিব, এতদিন জগতে কেবল একাকী আত্মারূপে আমরাই রহিয়াছি। মন বা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। উহারা তো আমাদিগের সহিত কখনই যুক্ত ছিল না। উহারা আপন আপন কাজ করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ নিজদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা একাকী, নিঃসঙ্গ, কেবল, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী

ও সদানন্দ। আমাদের আত্মা এত পবিত্র ও পূর্ণ ছিল যে, আমাদের আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরাই সুখস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব, এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইবে। ইহাই যোগীর চরম অবস্থা; যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়া যান, আর কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না, আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত হন না এবং দুঃখ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানিতে পারেন, 'আমি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বরূপ ও সর্বশক্তিমান্।'

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

—যোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের মলিনতা দূর হইয়া গেলে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; উহার শেষ সীমা বিবেক-খ্যাতি।

এখন সাধনের কথা বলা হইতেছে। এতক্ষণ যাহা বলা হইতেছিল, তাহা অনেক উচ্চতর ব্যাপার। উহা অনেক দূরে, অনেক উর্ধ্বে, কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ। প্রথমতঃ শরীর ও মন সংযত করা আবশ্যক। তখনই পূর্বোক্ত আদর্শের উপলব্ধি স্থায়ী হইতে পারে। আদর্শ কি, তাহা আমরা জানিয়াছি; এখন উহা লাভের জন্য সাধন করিতে হইবে।

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এইগুলিকে 'যম' বলে।

পূর্ণ যোগী হইতে গেলে সাধককে স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই ; তবে লিঙ্গাভিমান দ্বারা নিজেকে অবনমিত করিবে কেন ? পরে আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই-সকল ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌর্য যেমন অসৎকার্য, পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাও সেইরূপ অসৎকর্ম। যিনি অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাঁহার মন দাতার মন দ্বারা প্রভাবিত হয়, সুতরাং যিনি দান গ্রহণ করেন, তাঁহার পতিত হইবার সম্ভাবনা। অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে, আমরা ক্রীতদাসতুল্য হইয়া পড়িতে পারি। অতএব কোন দান গ্রহণ করিও না।[১]

এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

—এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় (অর্থাৎ সাময়িক কর্তব্য বা উদ্দেশ্য) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইলে সার্বভৌম (অর্থাৎ সর্বজনীন) মহাব্রত বলিয়া কথিত হয়।

এই সাধনগুলি অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-নির্বিশেষে অনুষ্ঠেয়।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

—বাহ্য ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ বা অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বরোপাসনা এইগুলি 'নিয়ম'।

বাহ্যশৌচ অর্থে শরীরকে পবিত্র রাখা ; অশুচি ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবশ্যক। পূর্বে সমাধিপাদ, ৩৩শ সূত্রে যে ধর্মগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ আসে। অবশ্য বাহ্যশৌচ অপেক্ষা অন্তঃশৌচ অধিকতর প্রয়োজন, কিন্তু উভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে ; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্যশৌচ কোন কাজে আসে না।

---

১ 'যমে'র প্রথম তিনটি সাধনের জন্য 'সংক্ষেপে রাজযোগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥

—যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে ঐগুলির বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

পূর্বে যে-সকল ধর্মের কথা বলা হইল সেগুলি অভ্যাস করিবার উপায়—মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করা; অন্তরে চৌর্যের ভাব আসিলে অচৌর্যের চিন্তা করিতে হইবে। দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইলে উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥

—পূর্বসূত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপ: বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি কৃত, কারিত অথবা অনুমোদিত; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ-ভাবনা বলে।

আমি নিজে মিথ্যা কথা বলিলে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা বলিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা বলিলে তাহা অনুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণ পাপ হয়। মিথ্যা সামান্য হইলেও উহা মিথ্যা। পর্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি পাপ চিন্তা করিয়া থাকো, যদি কাহারও প্রতি অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকো, তাহা হইলে তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপর প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহা প্রবলবেগে তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি ঈর্ষা ও ঘৃণার ভাব পোষণ কর এবং চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে বর্ধিতভাবে উহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। জগতের কোন শক্তিই উহা নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যখন একবার ঐ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। এইটি স্মরণ করিলে তুমি অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

—যাহার অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সমীপে অপরের স্বাভাবিক বৈরিতাও পরিত্যক্ত হয়।

যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন, তবে তাঁহার সম্মুখে যে-সকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র, তাহারাও শান্তভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি অহিংসভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

—সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন কর্ম না করিয়াই যোগী নিজের জন্য বা অপরের জন্য সেই কর্মের ফল লাভ করিবার শক্তি অর্জন করেন।

যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নেও তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কায়মনোবাক্যে সত্য আচরণ করিবে, তখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও বলো, 'তুমি কৃতার্থ হও,' সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বলো, 'রোগমুক্ত হও,' সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া যাইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

—অচৌর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধন-রত্নাদি আসিয়া থাকে।

তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই তোমার অনুসরণ করিবে; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

—ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা শক্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মচর্যবান্ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। পবিত্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা মানুষের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। মানবসমাজের ধর্ম-নেতাগণ সকলেই ব্রহ্মচর্যবান্ ছিলেন, এই ব্রহ্মচর্য হইতেই তাঁহারা শক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; অতএব যোগী অবশ্যই ব্রহ্মচর্যবান্ হইবেন

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

—অপরিগ্রহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

যখন কেহ অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, তখন তাঁহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা হয় না, তিনি স্বাধীন ও মুক্তই থাকেন। তাঁহার মন শুদ্ধ হইয়া যায়। প্রতিটি দানের সহিত দাতার মন্দ ভাবগুলিও গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া যায়, আর ইহা হইতে যে-সকল শক্তি লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রথম পূর্বজন্মকথা মনে করিতে পারা। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজ আদর্শে দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান, বহুবার তিনি কেবল যাওয়া-আসা করিতেছেন। সুতরাং তিনি তখন হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আর যাওয়া-আসা করিব না, আর প্রকৃতির দাস হইব না।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

—শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, অন্যের সঙ্গ করিতেও আর প্রবৃত্তি থাকে না।

যখন বাস্তবিক বাহ্য ও আন্তর—উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আসে ; কিসে উহা ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহা সুন্দর দেখাইবে, এ-সকল ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মনে করিবেন। এই দেহতৃষ্ণা মনুষ্যজীবনে সর্বনাশের কারণ। সুতরাং শৌচ-প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলিয়া ভাবিতে

চাহিবে না। আমাদের মধ্যে যখন এই শৌচ বা পবিত্রতা আসে, তখনই আমরা এই দেহ-ভাব অতিক্রম করিতে পারি।

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

—এই শৌচ হইতে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

এই শৌচ-অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইবে, সুতরাং মনও একাগ্র ও প্রফুল্ল হইবে। তুমি যে ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি বেশ প্রফুল্ল হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম নয়। সুখই সত্ত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম; সাত্ত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সবই সুখময় বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি যোগসাধনায় উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা তমোগুণপ্রসূত, সুতরাং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। বিষণ্ণতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, সুস্থকায় যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর দৃষ্টিতে সবই সুখময়। যে-কোন মনুষ্যমুখ তিনি দেখেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ হয়। ইহাই ধার্মিক লোকের লক্ষণ। পাপই কষ্টের কারণ, আর অন্য কিছু নয়। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা ভয়ঙ্কর! এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সারাদিন ঘরে কাটাইয়া দাও। সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন তুমি সমুদয় শরীরও বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর তুমি এই যন্ত্রের ক্রীতদাস থাকিবে না; এই দেহযন্ত্রই তোমার ভৃত্য হইয়া থাকিবে। দেহযন্ত্র আত্মাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে না, বরং উহাই মুক্তিপথে শ্রেষ্ঠ সহায় হইবে।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

–সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

—অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্যা হইতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে।

তপস্যার ফল কখন কখন সহসা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

—মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা করিবে, সাধনাও সেই পরিমাণে কঠোর করিতে হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

—ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বারা সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

—যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন।

এখন আসনের কথা বলা হইবে। যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনে কিছুতেই কৃতকার্য হইবে না। আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি শরীরের অস্তিত্ব মোটেই অনুভব করিবে না। এইরূপ হইলেই বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বলা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, শরীরে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিতে থাকিবে। কিন্তু যখনই তুমি এই স্থূলদেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়া ফেলিবে। তখন আর তুমি সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার শরীরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন অনুভব করিবে, যেন অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ। যদি শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে জয় করিয়া উহাকে দৃঢ় রাখিতে

পারিবে, তখন তোমার সাধনাও দৃঢ় হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার শারীরিক বিঘ্নবাধাগুলি আসিতে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার স্নায়ুমণ্ডলী চঞ্চল থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

—শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ন আছে, তাহা শিথিল করিয়া দিয়া ও অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে।

অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমরা সেই নিরপেক্ষ অনন্ত (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু আমরা অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিতে পারি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

—এইরূপে আসনজয় হইলে দ্বন্দ্ব-পরম্পরা আর কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।

দ্বন্দ্ব অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী দুই দুই পদার্থ। এগুলি আর তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

—এই আসন-জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত করাকে ‘প্রাণায়াম’ বলে।

যখন এই আসন-জয় সমাপ্ত হইয়াছে তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিভঙ্গ (অভাব) করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এইভাবে প্রাণায়ামের বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম কি? শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনা। যদিও ‘প্রাণ’ শব্দ সচরাচর শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক উহা শ্বাস-প্রশ্বাস নয়। ‘প্রাণ’ অর্থে জাগতিক শক্তিসমষ্টি। উহা প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তি এবং উহার বাহ্যপ্রকাশ—এই ফুসফুসের গতি। প্রাণ যখন শ্বাসকে ভিতরদিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি আরম্ভ হয়; ‘প্রাণায়ামে’ আমরা উহাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই। এই

প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিবার সহজতম উপায়রূপে আমরা প্রথমে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করি।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ॥ ৫০ ॥

—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম হওয়াতে উহাদেরও আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে।

এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম—যখন আমরা শ্বাসকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করি; দ্বিতীয়—যখন আমরা উহা বাহিরে নিক্ষেপ করি; তৃতীয়—যখন শ্বাস ফুসফুসের মধ্যেই ধৃত হয় বা বাহির হইতে শ্বাস-গ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। উহারা আবার দেশ, কাল ও সংখ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 'দেশ' অর্থে—প্রাণকে শরীরের কোন অংশবিশেষে আবদ্ধ রাখা। 'সময়' অর্থে—প্রাণ কোন্ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং 'সংখ্যা' অর্থে—কতবার ঐরূপ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে। এইজন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকাদি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামের ফল 'উদ্ঘাত' অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ॥ ৫১ ॥

—চতুর্থ প্রকার প্রণায়ামে বাহ্য বা আন্তর বিষয় চিন্তা দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ করা হয়।

ইহা প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত চিন্তাসহ দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা স্বাভাবিক কুম্ভক (স্তম্ভবৃত্তি) হইয়া থাকে। অন্য প্রাণায়ামগুলিতে চিন্তার সংস্রব নাই।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্॥ ৫২ ॥

—তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়।

চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সত্ত্বপদার্থ দ্বারা নির্মিত, কিন্তু উহা রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের এই আবরণ দূরীভূত হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

—(তাহা হইতেই) 'ধারণা' বিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়।

এই আবরণ চলিয়া গেলে আমরা মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হই।

স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৫৪॥

—যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে 'প্রত্যাহার' বলা যায়।

এই ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক ঐ পুস্তকাকৃতি বাইরে নাই, উহা মনেই অবস্থিত। বাহিরের কোন-কিছু ঐ আকৃতি জাগাইয়া দেয় মাত্র; বাস্তবিক রূপ বা আকৃতি চিত্তেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি, তাহাদের সম্মুখে যাহা আসিতেছে, তাহারই সহিত মিশিয়া গিয়া তাহারই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারো, তবে তোমার মন শান্ত হইবে এবং ইন্দ্রিয়গুলিও শান্ত হইবে। ইহাকেই 'প্রত্যাহার' বলে।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

—তাহা (প্রত্যাহার) হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া থাকে।

যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহির্বস্তুর আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহাদিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকার্য হন, তখনই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। আর যখন ইন্দ্রিয়গণ সর্বতো-ভাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রত্যেকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয়া থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়গণই সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্যের কেন্দ্রস্বরূপ। এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্যকে জয় করিতে পারিবেন, সমগ্র শরীরটিই তাঁহার বশীভূত হইবে। এইরূপ অবস্থালাভ হইলেই মানুষ দেহ-ধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিক ঠিক বলিতে পারে, 'জন্মিয়া-ছিলাম বলিয়া আমি সুখী।' যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক এই শরীর অতি আশ্চর্য পদার্থ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভূতি-পাদ

এই অধ্যায়ে যোগের বিভূতি (শক্তি বা ঐশ্বর্য) আলোচিত হইবে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

—চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে ধরিয়া রাখার নাম 'ধারণা'।

যখন মন শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয় ও কিছুকাল ঐ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণা (একাগ্রতা) বলে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

—সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে।

মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, মস্তকের উপরে অথবা হৃদয়ে নিজেকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি মন শরীরের কেবল ঐ অংশ দিয়াই সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের অন্য সকল অঙ্গকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, তবে তাহার নাম 'ধারণা'; আর মন যখন কিছুক্ষণ নিজেকে ঐ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে বলা হয় 'ধ্যান'।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

—তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্রকে প্রকাশ করে, তখন 'সমাধি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহ্যভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই সমাধি-অবস্থা আসে। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি, ধীরে ধীরে আমি উহার উপর মন একাগ্র করিতে কৃতকার্য হইলাম, তখন কেবল ভিতরের ভাবগুলি অনুভব করিব, অর্থটুকু বুঝিব, কোনরূপ আকারে উহা প্রকাশিত হইবে না। ধ্যানের ঐ অবস্থাকে 'সমাধি' বলে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

—এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ একই বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে।

যখন কেহ তাঁহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া কোন বস্তুর উপর স্থির করিতে পারেন, পরে অন্তর্ভাগ হইতে বাহ্য বস্তু পৃথক্ করিয়া তাহার উপর মনকে অনেকক্ষণ রাখিতে পারেন, তখনই ‘সংযম’ হইল। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এইগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে এক বস্তুর উপরে অভ্যস্ত হইয়া একত্র হয়। তখন বস্তুর বাহ্য আকার অন্তর্হিত হয়, মনে তাহার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

—এই সংযমের দ্বারা যোগীর মনে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়।

যখন কেহ এই সংযমসাধনে কৃতকার্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার আয়ত্ত হয়। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্র। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। উহারা স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থূলের জ্ঞানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে উহা সূক্ষ্মতর বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

—এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা উচিত।

খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সূত্র এইরূপ সমাধান করিয়া দিতেছে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

—এই তিনটি পূর্বকথিত সাধনগুলি অপেক্ষা আরও অন্তরঙ্গ সাধন।

পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে। উহারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধির তুলনায় বহিরঙ্গ। এই ‘ধারণা’দি অবস্থা লাভ করিলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ হইতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা বা সর্বশক্তিমত্তা তো মুক্তি নয়। ঐ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন

নির্বিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশূন্য হইতে পারে না, ঐ ত্রিবিধ সাধন আয়ত্ত হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে। যোগীদের ভাষায় সেই বীজগুলি 'ভর্জিত' হইয়া গেলেই তাহাদের নূতন অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিভূতিসমূহ বীজগুলি ভর্জিত করিতে পারে না।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

—কিন্তু এই 'সংযম'ও (ধারণা ধ্যান সমাধি একত্র) নির্বীজ সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গস্বরূপ।

এই কারণে নির্বীজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে এইগুলিকেও বহিরঙ্গ বলিতে হইবে। আমরা এখনও প্রকৃত সর্বোচ্চ সমাধি-অবস্থা লাভ না করিয়া একটি নিম্নতর ভূমিতেই আছি; সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এখনও আছে, বিভূতি বা সিদ্ধিসকল এই জগতেরই অন্তর্গত।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

—যখন ব্যুত্থান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব (নাশ) ও নিরোধ-সংস্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত হয়, উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে।

ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়; কারণ তাহা হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদিত হইয়াছে, যাহা মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী ঐ বৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এ অবস্থায় ঐ সংযমচেষ্টাটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে হইবে। একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গ দ্বারা নিবারিত হইল, সুতরাং উহা সর্ব তরঙ্গের নিবৃত্তিরূপ সমাধি নয়, কারণ ঐ সংযমটিও একটি তরঙ্গ। তবে যে অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা এই নিম্নতর সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির খুবই নিকটবর্তী।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

—অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়।

দিনের পর দিন অভ্যাস করিলে মনঃসংযমের এই নিরন্তরচেষ্টাপ্রবাহ স্থির হইয়া যায় এবং মন সর্বদা একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

—মনে সর্বপ্রকার বস্তু গ্রহণ করা ও এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা, এই দুইটির যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে।

মন সর্বদাই নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বপ্রকার বস্তুতেই যাইতেছে—ইহা নিম্ন অবস্থা। ইহা অপেক্ষা মনের একটি উচ্চতর অবস্থা আছে, সেখানে মন একটিমাত্র বস্তু গ্রহণ করে এবং আর সকল বস্তু ত্যাগ করে। এই এক বস্তু গ্রহণ করার ফল সমাধি।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

—যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্যপ্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

কি করিয়া জানা যাইবে—মন একাগ্র হইয়াছে? মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞাতসারে যতই সময় অতিবাহিত হয়, বুঝিতে হইবে, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না; আবার যখন পুস্তকপাঠে বিরত হই, তখন ভাবিয়া আশ্চর্য হই, কতখানি সময় চলিয়া গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্র হইয়া বর্তমানে একীভূত হইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, যখন অতীত ও বর্তমান আসিয়া একত্র মিলিত হয়, তখনই মন একাগ্র হইয়া থাকে।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

—ইহা দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল।

পূর্ব তিনটি সূত্রে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল। মন ক্রমাগত বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের 'ধর্মরূপ' পরিণাম। উহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্য দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের 'লক্ষণরূপ' পরিণাম; আর কখনও যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্বল অথবা তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের 'অবস্থারূপ' পরিণাম। মনের এই পরিণাম-ত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্রিবিধ পরিণামও বুঝিতে হইবে। যথা, মৃত্তিকারূপ ধর্মীর পিণ্ডরূপ ধর্ম গিয়া উহাতে যে ঘটাকার ধর্ম আবির্ভূত হয়, তাহা ধর্ম-পরিণাম। ঐ ঘটের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থারূপ পরিণামকে লক্ষণ-পরিণাম এবং উহার নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে।

পূর্ব পূর্ব সূত্রে যে-সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য, যোগী যাহাতে মনের বৃত্তি বা পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥

—শান্ত (অর্থাৎ অতীত), উদিত (বর্তমান) ও অব্যপদেশ্য (ভবিষ্যৎ) ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধর্মী।

ধর্মী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য করিতেছে, যাহা সর্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

—ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিন্নতা (পূর্বাপর পার্থক্য)।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

—পূর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহা যেন বিস্মৃত না হই। যখন মন বস্তুর বাহ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার আভ্যন্তরীণ ভাব-

গুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে 'সংযম' বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কেবল সংস্কারের পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতকগুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভূতের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে।

'শব্দ' বলিলে বুঝিতে হইবে বাহ্যবিষয়, যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়। 'অর্থ' বলিলে বুঝিতে হইবে, যে শরীরাভ্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা লব্ধ বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে লইয়া গিয়া মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয় তাহাকে, আর 'জ্ঞান' বলিলে বুঝিতে হইবে মনের সেই প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ানুভূতি হয়। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে একটি স্পন্দন হইল, তারপর একটি আন্তরবেদনাপ্রবাহ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা মনে নীত হইল, তখন মন প্রতিঘাত করিল, এবং আমি (অর্থ সহ) শব্দটি জানিতে পারিলাম। আমি ঐ যে শব্দটি জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ—প্রথম কম্পন, দ্বিতীয় বেদনাপ্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ এই তিনটি পৃথক্ করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারেন। সাধক যখন এগুলিকে পৃথক্ করিবার শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যে-কোন শব্দের উপর 'সংযম' প্রয়োগ করেন, তাহার উদ্দিষ্ট অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন—তা ঐ শব্দ মনুষ্যকৃতই হউক বা অন্য কোন প্রাণিকৃতই হউক।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

—সংস্কারগুলি ধরিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সবই আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে আসিয়া থাকে, উহা আবার চিত্তেই মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহা সেখানে অতি সূক্ষ্ম আকারে থাকে, যদি আমরা ঐ তরঙ্গটি পুনরায় উত্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই 'স্মৃতি' হইল। সুতরাং যোগী যদি মনের এই-সকল পূর্বসংস্কারের উপর 'সংযম' করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার পূর্ব পূর্ব সকল জন্মের কথা স্মরণ করিতে থাকিবেন।

প্রত্যয়স্য পরচিত্ত-জ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

—অপরের শরীরে যে-সকল চিহ্ন আছে, সেগুলিতে সংযম করিলে ঐ ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই কতকগুলি বিশেষ প্রকার চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিহ্নগুলির উপর 'সংযম' করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের গঠন বা অবস্থা জানিতে পারেন।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

—কিন্তু ঐ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা জানিতে পারেন না, কারণ উহা তাঁহার সংযমের বিষয় নয়।

শরীরের উপর 'সংযম' করিয়া মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। সেজন্য দুইবার সংযম করিবার আবশ্যক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমূহের উপর ও তারপর মনেরই উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনে কি আছে, সবই জানিতে পারিবেন।

**কায়রূপসংযমাত্তদ্‌গ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে
চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্[১] ॥ ২১ ॥**

---

১ পাঠান্তর: … চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগেঽন্তর্ধানম্

—দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তি স্তম্ভিত (বাধাপ্রাপ্ত) ও চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী লোকসমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন।

মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক অন্তর্হিত হন তাহা নয়, তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না এইমাত্র। শরীরের আকৃতি ও শরীর এই দুইটিকে তিনি যেন পৃথক্ করিয়া ফেলেন। এটি যেন স্মরণ থাকে, যোগী যখন এরূপ একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর আকার ও বস্তুকে পরস্পর পৃথক্ করিতে পারেন, তখনই তিনি ঐভাবে অদৃশ্য হইতে পারেন। যোগী আকার ও ঐ আকারবান্ বস্তুর পার্থক্যের উপর সংযম প্রয়োগ করেন এবং ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তিকে বাধা দেন, আকৃতি ও আকারবান্ বস্তুর সংযোগ হইলেই আমরা আকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

—ইহা দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্ধান অর্থাৎ শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে না দেওয়াও ব্যাখ্যা করা হইল।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ-পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২৩ ॥

—কর্ম দুই প্রকার, একপ্রকারের ফল শীঘ্র লাভ হইবে, অন্যপ্রকার বিলম্বে ফল প্রসব করিবে। ইহাদের উপর 'সংযম' করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীবা দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন।

যখন যোগী তাঁহার নিজ কর্মের উপর অর্থাৎ তাঁহার মনের ভিতর যে সংস্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলি দ্বারা জানিতে পারেন—কবে তাঁহার শরীরপাত হইবে। কোন্ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের

সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। মৃত্যু যে সর্বদা আসন্ন—এইটি জানা হিন্দুরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, কারণ গীতায় এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত্যুচিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ শক্তিশালী।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

—মৈত্রী করুণা ইত্যাদি (১।৩৩) গুণগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগী ঐ গুণগুলি প্রকর্ষতা লাভ করে।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

—হস্তী প্রভৃতির বলের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর শরীরে সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে।

যখন যোগী এই সংযমশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে ঐ শক্তি লইয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী উহা লাভ করিবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

—(পূর্বকথিত) মহা-জ্যোতির (১।৩৬) উপর সংযম করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্তী বস্তুও তিনি দেখিতে পান। যাদ কোন বস্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুও তিনি দেখিতে পারেন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

—সূর্যে সংযমের দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞানলাভ হয়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

—চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞানলাভ হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

—ধ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহ-জ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

—নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

—কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়।

অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ঠকূপে চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয়।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্ ॥ ৩২ ॥

—কূর্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের স্থিরতা আসে।

যখন তিনি সাধনা করেন, তখন তাঁহার শরীর চঞ্চল হয় না।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

—মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয়।

সিদ্ধগণ ভূতযোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের। যোগী যখন তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই সিদ্ধগণের দর্শন পান। এখানে 'সিদ্ধ' শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না, অনেক সময় উহা ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্ ॥ ৩৪ ॥

—অথবা প্রতিভা-শক্তিদ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়।

যাঁহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ-জ্ঞান-বিশেষ আছে, (পূর্বোক্ত) কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই তাঁহারা এই সমুদয় জ্ঞানের অধিকারী হন। যখন মানুষ উচ্চ প্রতিভা-শক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট সবই স্পষ্ট হইয়া যায়। কোন প্রকার 'সংযম' ব্যতীতই, সমুদয় জ্ঞান স্বতই তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিদ্ ॥ ৩৫ ॥

—হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্ ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬ ॥

—পুরুষ ও বুদ্ধির বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপরের বা পুরুষের জন্য। বুদ্ধির অন্য এক অবস্থার নাম 'স্বার্থ'; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহার সহিত আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এবং তাহাতেই নিজেকে সুখী বা দুঃখী বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে 'পরার্থ' বলে, কারণ উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নয়—পুরুষের জন্য। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে—উহার নাম 'স্বার্থ'। যখন বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান হইয়া অতিশয় নির্মল হয়, তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইয়া পুরুষমাত্রাবলম্বন হয়। সেই স্বার্থ-নামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষমাত্রাবলম্বন-বুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই—শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাতা বলিয়া কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥

—তাহা হইতে প্রাতিভ[১] (অলৌকিক) শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

—ইহারা সমাধির পথে বাধা, কিন্তু সংসার-অবস্থায় উহারা সিদ্ধির স্বরূপ।

১ প্রাতিভাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টাতীতানাগত জ্ঞানং, শ্রাবনাদ্ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদনাদ্ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্ দিব্যরূপসম্বিৎ। আস্বাদাদ দিব্যরসসম্বিৎ, বার্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানং ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে।—ব্যাসভাষ্য

যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগ হইতে হইয়া থাকে, যদি তিনি 'আত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্ বস্তু' এই সত্যের উপর চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তিনি 'পুরুষে'র জ্ঞান লাভ করেন। তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান উদিত হয়। যখন তিনি এই 'বিবেক' লাভে কৃতকার্য হন, তখন তাঁহার প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই শক্তিসমুদয় সেই উচ্চতম লক্ষ্যের পথে বাধা অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মার জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। পথিমধ্যে যেন এগুলির সহিত সাক্ষাৎ হয়। যোগী যদি এগুলি পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাভ করিয়া প্রলুব্ধ হন, তবে তাঁহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য
পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

—যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ শিথিল হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচার-স্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে) অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া সেই দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে উঠাইয়া গতিশীল করিতে পারেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়া সাময়িকভাবে সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে 'সংযম' প্রয়োগ করিলেই ইহা সিদ্ধ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মাই যে সর্বব্যাপী তাহা নয়, তাঁহার মনও সর্বব্যাপী— অবশ্য যোগীদিগের মতে। উহা সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র। এখন কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্য করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন স্নায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্যান্য বস্তু বা শরীরের দ্বারাও কার্য করিতে পারেন।

উদান-জয়াজ্জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০ ॥

—উদান-নামক স্নায়ুপ্রবাহ জয় করিতে পারিলে যোগী জলে বা পঙ্কে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন।

'উদান' নামক যে স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুস্‌ফুস্ ও শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন তাহা জয় করিতে পারেন. তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে চলিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাত্র এই শরীর ত্যাগ করিতে পারেন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১ ॥

—সমান-প্রবাহকে জয় করিলে তিনি জ্যোতিঃ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন।

এ-অবস্থায় তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২ ॥

—কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়।

এই আকাশ (ইথার) ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্রস্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে। ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমুদয় শব্দ শুনিতে পান। বহু দূরে কোন কথাবার্তা বা শব্দ হইলে তাহাও তিনি শুনিতে পান।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩ ॥

—শরীরের ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্তসংযম করিয়া এবং তুলা প্রভৃতির ন্যায় আপনাকে লঘু ভাবনা করিয়া যোগী আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারেন।

আকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই এক বিশেষরূপে এই শরীর হইয়াছে। যদি যোগী শরীরের উপাদান ঐ আকাশ-ধাতুর উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও বায়ুর মধ্য দিয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেহের বাহিরে মনের যে 'যথার্থ বৃত্তি' অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার নাম 'মহাবিদেহ'; তাহার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহা ক্ষয় হইয়া যায়।

মন অজ্ঞতাবশতঃ বিবেচনা করে, সে এই দেহের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমি কেবল এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব কেন, অথবা এই অহংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? ইহার তো কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগী চান, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি এই 'আমিত্ব' অনুভব করিবেন। অহংভাব চলিয়া গিয়া যে মানসিক বৃত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিত হয়, তাহাকে 'অকল্পিতা বৃত্তি' বা 'মহাবিদেহ' বলে। যখন তিনি উহার উপর 'সংযম' করিতে পারেন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সমস্তই তাঁহার নিকট জ্ঞানময় —চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব-সংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভূতগণের স্থূল স্বরূপ, সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ভূতজয় হয়।[১]

যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্থূলভূতের উপর, তারপর উহার সূক্ষ্ম অবস্থার উপর 'সংযম' করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই সংযমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। খানিকটা কাদার তাল লইয়া তাঁহারা উহার উপর 'সংযম' প্রয়োগ করেন, এবং ক্রমশঃ উহা যে-সকল

---

১ স্বরূপ—পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তারল্যাদি। অন্বয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক ভূতে অন্বিত রহিয়াছে, ইহা জানা। অর্থবত্ত্ব—বিশেষ বিশেষ ভোগপ্রদান-সামর্থ্য।

সূক্ষ্মভূতে নির্মিত, তাহা দেখিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা ঐ সূক্ষ্মভূতের বিষয় জানিতে পারেন, তখনই তাঁহারা ঐ ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই এইরূপ বুঝিতে হইবে—যোগী এগুলি সবই জয় করিতে পারেন।

ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

—তাহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয় (অর্থাৎ ধ্বংস হয় না)।

ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্টসিদ্ধি[১] লাভ করেন। তিনি নিজেকে ইচ্ছামত 'অণু' করিতে পারেন, খুব বৃহৎ করিতে পারেন, পৃথিবীর ন্যায় গুরু ও বায়ুর ন্যায় লঘু করিতে পারেন, যাহার উপর ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই জয় করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছায় সিংহ তাঁহার পদতলে মেষের ন্যায় শান্তভাবে বসিয়া থাকিবে ও তাঁহার সমুদয় বাসনাই তাঁহার ইচ্ছামত পরিপূর্ণ হইবে।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

—কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকান্তি, বল ও বজ্রবৎ দৃঢ়তা বুঝায়।

তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যায়, কিছুই উহার কোন্ ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কিছুই তাঁহার শরীর বিনাশ করিতে পারে না, 'কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে সশরীরে বাস করেন।' বেদে লিখিত আছে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন ক্লেশ হয় না।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

—ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান

---

১ অষ্টসিদ্ধি : অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি (দূরস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওয়া), প্রাকাম্য (ইচ্ছার অনভিঘাত), বশিত্ব, ঈশিত্ব, যত্রকামবসায়িত্ব (সত্যসংকল্পতা)।

হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব—এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয়।

বাহ্য বস্তুর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অস্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে 'সংযম' প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে-কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ—যথা একখানি পুস্তক—তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। তারপর পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯ ॥

—তাহা হইতে দেহে মনের ন্যায় বেগ, ইন্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে।

যেমন ভূতজয় দ্বারা কায়সম্পৎ লাভ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা পূর্বোক্ত শক্তিসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥

—পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়।

যখন প্রকৃতি জয় করা হইয়া গিয়াছে ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ জানা গিয়াছে যে, পুরুষ অবিনাশী পবিত্র ও পূর্ণস্বরূপ, তখন সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা লাভ হয়।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥

—এগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়।

এই অবস্থায় সাধক কৈবল্য লাভ করেন, স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যান। যখন তিনি সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—শক্তি-দুটিও ত্যাগ করেন, তখন সমুদয় ভোগ,

এমন কি দেবগণকৃত প্রলোভনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী এই-সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে বড় নয়। সর্বশক্তিমত্তাও স্বপ্নতুল্য। উহা কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই সর্বশক্তিমত্তা বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনকেও অতিক্রম করিয়া।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

—দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া বা আনন্দবোধ (স্ময়) করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

আরও অনেক বিঘ্ন আছে। দেবতা ও অন্যেরা যোগীকে প্রলুব্ধ করিতে আসেন; তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যায়। আমরা যেমন ঈর্ষাপরায়ণ, দেবতারাও সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের অপেক্ষা অধিক। পাছে পদভ্রষ্ট হন, সেই ভয়ে তাঁহারা অতিশয় ভীত। যে-সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, মৃত্যুর পর তাঁহারাই দেবতা হন। তাঁহারা সোজা পথ ছাড়িয়া পাশের এক গলিপথে চলিয়া যান এবং এই ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তাঁহাদের আবার জন্মাইতে হইবে, কিন্তু যিনি এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলিও প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনি একেবারে লক্ষ্যে পৌছিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

—ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি এড়াইবার উপায় কি? বিবেকবলে যখন সদসৎবিচারশক্তি হয়, তখনই এই-সকল বিঘ্ন চলিয়া যাইবে। যাহাতে বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের সূক্ষ্মতম অংশের এবং উহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযমের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥
—জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না, এবং সেজন্য তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগকেও ঐ পূর্বোক্ত সংযমের দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে।

আমরা যে দুঃখ ভোগ করি, তাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যদৃষ্টির অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সকলেই মন্দকে ভাল বলিয়া ও স্বপ্নকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য, ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্নমাত্র; আমরা ভাবি, আমরা শরীর। সুতরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ। এই অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রসূত। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে বলও আসে, তখনই আমরা এই শরীর, স্বর্গ ও দেবাদির কল্পনা পরিহার করিতে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমরা বস্তুগুলিকে পৃথক্ করিয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ একটি গাভীর কথা ধরা যাক। কুকুর হইতে গাভীর ভেদ জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়া থাকি? চিহ্নের দ্বারা। আবার দুইটি বস্তু সর্বাংশে সমান হইলে আমরা স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। কিন্তু যখন বস্তুসকল এমন মিশাইয়া থাকে যে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি কোন কাজে আসে না, তখন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ বিবেক-বলে আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং বিশ্ব-জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র 'অমিশ্র' বস্তু। শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, তথাপি আমরা সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের মহাভ্রম এই যে, ঐ পার্থক্যটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যখন এই বিবেকশক্তি লাভ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায় যে, জগতের বাহ্য ও আন্তর—সকল বস্তুই মিশ্র পদার্থ, সুতরাং ঐগুলি 'পুরুষ' হইতে পারে না।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥
—যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর সর্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 'তারকজ্ঞান' বলে।

'তারক' অর্থে যাহা যোগীকে সংসার (জন্ম-মৃত্যুর সাগর) হইতে তারণ করে। সমগ্র প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্থূল সর্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে। এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা সমুদয় বস্তুকে যুগপৎ—একদৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারে।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

—যখন সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্যলাভ হয়।

কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারা যায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারেন যে, তিনি চিরকাল একাকী—'কেবল' ছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। যতদিন আমরা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাই, ততদিন আমরা দাসমাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন—তিনি মুক্তস্বভাব ও তাঁহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না—জানিতে পারেন যে, এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়, তখনই এই কৈবল্যলাভ হয়। যখন আত্মা জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে দেবতা পর্যন্ত কোন কিছুরই উপর তিনি নির্ভর করেন না, তখন আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য (পৃথকত্ব) ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধির মিশ্রণ 'সত্ত্ব' অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষেরই মতো শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন এই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে, তখন সেই শুদ্ধবুদ্ধি কেবল নির্গুণ পবিত্রস্বরূপ পুরুষকেই প্রতিফলিত করে।

কৈবল্য-পাদ

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

—সিদ্ধি(শক্তি)সমূহ জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়।

কখনও কখনও মানুষ পূর্বজন্মলব্ধ সিদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে সে যেন তাহাদের ফলভোগ করিতেই আসে। সাংখ্যদর্শনের পিতাস্বরূপ কপিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ[১] হইয়া জন্মিয়াছিলেন। 'সিদ্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি সফল বা কৃতকার্য হইয়াছেন।

যোগীরা বলেন, রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা এই-সকল শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। তোমরা সকলেই জানো যে, রসায়নবিদ্যার প্রারম্ভ আলকেমি (alchemy) হইতে। মানুষ পরশ-পাথর (Philosopher's stone), সঞ্জীবনী অমৃত (Elixir of life) ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে 'রাসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মত ছিল: সূক্ষ্মতত্ত্বপ্রিয়তা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম—এ-সব খুবই ভাল, কিন্তু এ-গুলি লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর। যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেই চরমলক্ষ্যে পৌছিতে অনেক সময় লাগিবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে ইচ্ছুক। কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ লইয়া পুনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, আবার তাহার মৃত্যু হইল; এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হইয়া গেল। যদি শরীরকে এরূপ সবল ও সম্পূর্ণ করিতে পারা যায় যে, উহার জন্মমৃত্যু একবারে বন্ধ হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। এই কারণে এই রাসায়নেরা বলিয়া থাকেন, 'প্রথমে শরীরকে খুব সবল কর।' তাঁহারা বলেন, শরীরকে অমর করা যাইতে পারে। ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীরগঠন করিবার কর্তা

১ তুলনীয়: 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'—গীতা, ১০।২৬

যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত শক্তিপ্রকাশের এক একটি বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তি সংগ্রহ করিবার কোন সীমা নির্দিষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পারিব না কেন? যত শরীর আমরা ধারণ করি, সব আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যখনই এই শরীরের পতন হইবে, তখন আবার আমাদিগকেই আর একটি শরীর গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমতা থাকে, তবে এই শরীর হইতে বাহিরে না গিয়া আমরা এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকার্য করিতে পারিব না কেন? তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহা যদি সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পরও (কোন একভাবে) জীবিত থাকি, এবং নিজ নিজ শরীর গঠন করি, তবে শরীরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিয়া কেবল উহাকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত করিয়া এই পৃথিবীতে (নূতনতর) শরীর গঠন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? তাঁহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারদে ও গন্ধকে অত্যদ্ভুত শক্তি লুক্কায়িত আছে। এই দ্রব্যগুলি হইতে প্রস্তুত কোন বিশেষ 'রসায়ন' দ্বারা মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীরকে অবিকৃত রাখিতে পারে। অপর কেহ বিশ্বাস করিত যে, ঔষধবিশেষের সেবনে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি-লাভ হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ঔষধই, বিশেষতঃ ঔষধে ধাতুর ব্যবহার আমরা এই রসায়নবিদ্যা হইতেই পাইয়াছি। কোন কোন যোগিসম্প্রদায় দাবি করেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান গুরুরা অনেকে এখনও তাঁহাদের পুরাতন শরীরেই বিদ্যমান আছেন। যোগসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণভূত (যাঁহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই) পতঞ্জলিও ইহা অস্বীকার করেন না।

মন্ত্রশক্তি: মন্ত্র-নামক কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে; নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে এগুলি হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হইয়া থাকে। আমরা দিনরাত অদ্ভুত ঘটনারাশির মধ্যে বাস করি, সেগুলির বিষয় কিছু চিন্তাও করি না। মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা নাই।

তপস্যা: তোমরা দেখিবে, প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন আছে। ধর্মের এই-দিকটিতে হিন্দুরাই সর্বদা চরম সীমায় গিয়া থাকেন। দেখিবে— এমন অনেকে আছে, যাহারা সারা জীবন উর্ধ্বে হাত তুলিয়া রাখে, যে পর্যন্ত না উহা শুকাইয়া অবশ হইয়া যায়। অনেকে দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকে,

অবশেষে তাহাদের পা ফুলিয়া যায়; যদি তারপরও তাহারা জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের পা এত শক্ত হইয়া যায় যে, তাহারা আর পা মুড়িতে পারে না। বাকী জীবন তাহাদিগকে দাঁড়াইয়াই থাকিতে হয়। আমি একবার এক উর্ধ্ববাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, 'যখন প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতেন, তখন কিরূপ বোধ করিতেন?' তিনি বলেন, 'প্রথম প্রথম ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইত। এত যন্ত্রণা হইত যে, নদীতে গিয়া জলে ডুবিয়া থাকিতাম; তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল না।' এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।

সমাধি: ধ্যানই সমাধি, ইহাই প্রকৃত যোগ; এই বিজ্ঞানের ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়; আর ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূর্বে আলোচিত বিষয়-গুলি গৌণ। সেগুলির দ্বারা উচ্চতম অবস্থা লাভ করা যায় না। সমাধি-দ্বারাই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু, সবই আমরা লাভ করিতে পারি।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত শক্তিগুলি কখন জন্মদ্বারা, কখন রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা অথবা তপস্যাদ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা করা যাইতে পারে। এখন তিনি বলিতেছেন: এই শরীর একজাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হয় কেন? তাঁহার মতে—ইহা প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা হইয়া থাকে। পরবর্তী সূত্রে তিনি ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

—সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, কিন্তু ঐগুলি উহার বাধাভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র—যেমন কৃষক জলেব গতি-পথে বাধা বাঁধ ভাঙিয়া দিলে জল নিজের স্বভাববশেই প্রবাহিত হয়।

যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল রুদ্ধ আছে। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয়, এবং জল স্বতই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছে। পূর্ণতা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব; কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত হইবে; তখন মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং প্রকৃতির শক্তি অপ্রতিহত ভাবে ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা যাহাদিগকে দুষ্ট বলি, তাহারা সাধু হইয়া যায়। স্বভাব বা প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে, কালে এই প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় লইয়া যাইবে। ধার্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্যমাত্র—কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দেওয়া, জন্মগত অধিকারস্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া —পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব।

প্রাচীন যোগীদিগের পরিণামবাদ আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও সহজে ও ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে এবং যোগীদের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে অনেক ভাল। আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটি কারণ—যৌন-নির্বাচন (Sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন (Survival of the fittest)।[১] কিন্তু এই দুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও সঙ্গী নির্বাচন করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আধুনিক-দিগের মতে মানুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভর্ৎসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা নিজেদের দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং যত দুষ্ট

১ ডারুইনের মত: সকল জীবই নিজ নিজ যৌন-সঙ্গী নির্বাচন করিয়া লয়; এ জীবন-সংগ্রামে যে যোগ্যতম, সেই-ই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

ও অনুপযুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিতে চান (তাঁহারাই যেন মানুষের যোগ্যতা-অযোগ্যতার একমাত্র বিচারক)—এইভাবে তাঁহারা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিবেন! কিন্তু সেই মহান্ প্রাচীন পরিণামবাদী পতঞ্জলি ঘোষণা করিয়াছেন: ক্রমবিকাশ বা পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে পূর্ণতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহারই বিকাশ মাত্র; ঐ পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বাধার ওপারে অনন্ত তরঙ্গস্রোত নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। বাঁধের বাহিরে যে অনন্ত তরঙ্গ-স্রোত রহিয়াছে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ; কেবল জীবনধারণের অথবা ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য প্রতিযোগিতা অজ্ঞানজাত ক্ষণিক অনাবশ্যক বাহ্য ব্যাপার মাত্র। সকল প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া গেলেও যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের এই অন্তর্নিহিত পূর্ণস্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। অতএব প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর 'মানুষ' চাপা রহিয়াছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি সবেগে 'মানুষ' বহির্গত হয়; এইরূপে মানুষের ভিতরও দেবতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গলে ও শৃঙ্খলে তিনি বন্দী হইয়া আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভাঙিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশিত হন।

নির্মাণ-চিত্তান্যস্মিতা-মাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

—যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত সৃজন করিতে পারেন।

কর্মবাদের তাৎপর্য এই যে, আমরা আমাদিগের সদসৎ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকি, আর সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য—মানুষের নিজ মহিমা অবগত হওয়া। সকল শাস্ত্রই মানবের আত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাদ প্রচার করিতেছে: শুভ কর্মের

ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি শুভাশুভ কর্ম আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা তো কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্ম কেবল পুরুষের স্বরূপ প্রকাশের বাধা দেয়; শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দূর করিয়া দেয়; তখনই পুরুষের মহিমা প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কখনই পরিবর্তিত বা পরিণামপ্রাপ্ত হন না। তুমি যাহাই কর না কেন, কিছুই তোমার মহিমা—তোমার নিজ স্বরূপ নষ্ট করিতে পারে না; কারণ কোন বস্তুই আত্মার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, আত্মার উপর কেবল একটি আবরণ পড়ে এবং উহার পূর্ণতা আচ্ছাদিত হয়।

যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য 'কায়ব্যূহ' অর্থাৎ একসঙ্গে বহু দেহ সৃজন করেন। এই-সকল দেহের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব হইতে অনেকগুলি মন সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথকত্ব বুঝাইবার জন্য এই নির্মিত চিত্তসমূহকে 'নির্মাণচিত্ত' বলা হয়।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

—যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্ট মনের কার্য নানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক আদি মনই সবগুলির নিয়ন্তা।

ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে 'নির্মাণচিত্ত' এবং এই শরীরগুলিকে 'নির্মাণদেহ' বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত শরীর ও মন। ভূত (মূল উপাদান) ও মন যেন দুইটি অফুরন্ত ভাণ্ডারগৃহের মতো। যোগী হইলেই তুমি এ-দুটিকে জয় করিবার রহস্য অবগত হইবে। এই জ্ঞান বরাবরই তোমার ছিল, তুমি শুধু উহা ভুলিয়া গিয়াছ। যোগী হইলে উহা তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখন তুমি উহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মাণচিত্তও সেই উপাদান হইতে নির্মিত। মন এক পদার্থ আর ভূত এক পৃথক্ পদার্থ, তাহা নয়; উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন দিক মাত্র। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা হইতে যোগীর এই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যখনই যোগী প্রকৃতির

এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা-নামক উপাদান হইতে যত ইচ্ছা তত মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

--ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে-চিত্ত সমাধিদ্বারা লব্ধ, তাহা বাসনাশূন্য।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের পূর্ণ একাগ্রতা বা সমাধি-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি ঔষধ, মন্ত্র অথবা কৃচ্ছ্রতাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসনা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত।

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

–যোগীদের কর্ম কৃষ্ণও নয়, শুক্লও নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র।

যখন যোগী সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার কার্য ও ঐ কার্যদ্বারা যে-সব কর্মফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না; কারণ তিনি তো ঐগুলি চান নাই। তিনি কেবল কর্ম করিয়া যান। তিনি পরহিতের জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ-কর্ম করেন, কিন্তু ফলের দিকে তাকান না, অতএব কর্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা আলাদা; যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—কৃষ্ণ (অসৎ বা অশুভ কর্ম), শুক্ল (সৎ বা শুভ কর্ম) ও মিশ্র।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

—এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত। (অন্যগুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে।)

মনে কর, আমি সৎ অসৎ ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার কর্মই করিলাম; তারপর মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম।

মনুষ্যদেহের বাসনা আর দেবদেহের বাসনা একরূপ নয়। দেবশরীর ভোজন বা পান কিছুই করে না। তাহা হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম আহার ও পানের বাসনা সৃজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশিত হইতে পারে। যে-সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হইয়াছে, কেবল সেগুলিই প্রকাশ পাইবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব বাসনা রহিয়াছে। আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলি ফলোন্মুখ হইবে, কারণ ঐগুলি প্রকাশের জন্য পরিবেশ উপযুক্ত হইয়াছে। আমি যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব বাসনাগুলিই আগাইয়া আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে এই বাসনাগুলি আমরা দমন করিতে পারি। কেবল যে কর্ম সেই বিশেষ পরিবেশের উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পরিবেশের শক্তিতে কর্মকেও নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

—স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্য হইবে।

অনুভূতিসমূহ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে পরিণত হয়, জাগরিত সংস্কারকেই 'স্মৃতি' বলে। বর্তমানে জ্ঞাতসারে কৃত কর্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্বানুভূতিসমূহের মনের অগোচরে যে সমন্বয় হয়, তাহাও এই স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে যে-সকল সংস্কার লব্ধ হইয়াছে, কেবল সেগুলি সেই দেহে কর্মের কারণ হইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার তখন স্তিমিতভাবে থাকিবে। প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি শরীরের উত্তর-পুরুষরূপে কার্য করিবে। এইরূপে বাসনার পৌর্বাপর্য নষ্ট হয় না।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

—সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি।

আমাদের সকল ভোগ ও অভিজ্ঞতা সুখী হইবার বাসনা হইতেই উৎপন্ন। এই ভোগের কোন আদি নাই; কারণ প্রত্যেক নূতন ভোগই পূর্বভোগের দ্বারা আমাদের চিত্তে যে একপ্রকার প্রবণতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

—এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার বিষয়—এইগুলি দ্বারা একত্র গ্রথিত বলিয়া ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়।

এই বাসনাগুলি কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত[১]; মনে কোন বাসনা উদিত হইলে উহা স্বীয় ফলপ্রসব না করিয়া বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সংস্কার-রূপে পরিণত অতীত বাসনাসমূহের আধার—বৃহৎ ভাণ্ডারস্বরূপ; যতক্ষণ না ঐগুলি কর্মরূপে নিঃশেষিত হইতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। আবার যতদিন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নূতন বাসনা উত্থিত হইবে। যদি এইগুলি (কার্য, কারণ, আধার ও বিষয়) হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই বাসনার বিনাশ হইতে পারে।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

—বস্তুর ধর্ম (বা গুণ) সকলই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ (বর্তমানে দৃষ্ট না হইলেও) তাহাদের স্বরূপেই অবস্থিত আছে।

তাৎপর্য এই যে, অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে কখনও সৎ (অস্তিত্ব) উৎপন্ন হয় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে।

---

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : যোগসূত্রের ২।৩, ২।১৩ ও ৪।৭ সূত্র।

তে ব্যক্ত-সূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

—উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা সূক্ষ্ম অবস্থায় চলিয়া যায়, আর গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ।

গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন উপাদানকে বুঝায়, উহাদের স্থূল অবস্থাই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

—পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু বাস্তবিক এক।

যদিও উপাদান তিনটি—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তথাপি তাহাদের পরিণাম ও পরিবর্তনের ভিতরে একটি সম্বন্ধ থাকায় সকল বস্তুতেই একত্ব আছে, বুঝিতে হইবে।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

—বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা ও অনুভূতি হইয়া থাকে। একই বস্তু সম্পর্কে যেহেতু অনুভূতি ও বাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব মন ও বিষয় ভিন্নস্বভাব।[১]

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৬ ॥

—চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্তু কখন জ্ঞাত ও কখন অজ্ঞাত থাকে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

—চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী।

---

১ কোন কোন গ্রন্থে এইখানে আর একটি সূত্র আছে। এই সূত্রটি বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ব্যাসভাষ্যে আছে :

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥

(দৃশ্য) বস্তু একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, যখন সেই চিত্তের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে তখন ঐ বস্তুর কি হইবে?—উহার তখন অস্তিত্ব থাকিবে না।

এতক্ষণ ধরিয়া যে মতের কথা বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই। আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই পুস্তকখানি কি? ইহা নিত্যপরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কতকগুলি বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আসিতেছে, উহা একটি আবর্তস্বরূপ। কিন্তু এই একত্ববোধ কি করিয়া হইতেছে? এটি যে সেই একই পুস্তক, এই বোধ কি করিয়া হইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে তালে হইতেছে; তালে তালে উহারা আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ করিতেছে। যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদা পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে। মনও এইরূপ সদা পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে গতিশীল একই পদার্থের দুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটি মৃদু ও অপরটি দ্রুততর বলিয়া অবশ্য আমরা ঐ দুইটি গতির মধ্যে পার্থক্য অনায়াসে ধরিতে পারি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে এবং একখানি গাড়ি তাহার পাশ দিয়া যাইতেছে। কিছুদূর পর্যন্ত এই উভয়েরই গতি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্তু একটি থাকিলেই গতিকে অনুভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই-তিনটি বস্তু বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তখন আমরা প্রথমে দ্রুততরটির, পরিশেষে মৃদুতর গতিশীল বস্তুটির গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি করিয়া অনুভব করিবে? উহাও নিয়ত গতিশীল। সুতরাং অপর একটি বস্তু থাকা প্রয়োজন, যাহা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে গতিশীল; পরে তদপেক্ষা মৃদুতর, তদপেক্ষা মৃদুতর এইরূপ চলিতে চলিতে ইহার আর সীমা পাওয়া যাইবে না। সুতরাং যুক্তি তোমাকে কোন একস্থানে থামিতে বাধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়া তোমাকে এই পর্যায়ের শেষ করিতেই হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে আলোক আসিয়া স্থির বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাতে নানা বর্ণের চিত্র উৎপন্ন করে, অথচ কোনরূপেই উহাকে মলিন বা রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এইসব সংস্কার স্থির পুরুষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

—মন দৃশ্য (পদার্থ) বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ নয়।

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতি স্বপ্রকাশ নয়, স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ নয়। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্যোতিতেই প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহারই শক্তি জড় ও অন্যান্য শক্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতেছে।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ১৯ ॥

—এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নয়।

মন যদি স্বপ্রকাশ হইত, তবে একই সময়ে উহা নিজেকে ও উহার প্রকাশ্য বস্তুগুলিকে অনুভব করিতে পারিত; মন তো তাহা পারে না। যদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অন্য বস্তুতে মন এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া উহা স্বপ্রকাশ নয়, পুরুষই স্বপ্রকাশ।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২০ ॥

যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত ঐ চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না এবং স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে।

মনে কর—আর একটি মন রহিয়াছে, উহা এই সাধারণ মনটিকে অনুভব করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন একটি মনের আবশ্যক, যাহা আবার ঐ মনটিকে অনুভব করিবে, সুতরাং কোথাও ইহার শেষ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে স্মৃতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ স্মৃতির কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার থাকিবে না।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্ ॥ ২১ ॥

—চিতি (পুরুষের শক্তি) অপরিণামী (পরিবর্তিত হয় না, অপরের দিকে সঞ্চারিত হয় না); যখন মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ করে, তখনই উহা জ্ঞানময় হয়।

জ্ঞান যে পুরুষের গুণ নয়, ইহা স্পষ্টতর ভাবে বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বলিলেন। মন যখন পুরুষের নিকট আসে, তখন যেন পুরুষ মনের উপর প্রতিফলিত হন আর মন সাময়িকভাবে জ্ঞানবান্ হয়, আর বোধ হয় যেন মনই পুরুষ।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥ ২২ ॥

—মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত (রঞ্জিত) হয়, তখন উহা সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে।

একদিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাহ্য জগৎ মনের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপর দিকে দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছেন; এইভাবেই মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আসে।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

—সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হইলেও সংহত পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য করে।

মন নানাপ্রকার পদার্থের সংহতি; সুতরাং উহা নিজের জন্য কার্য করিতে পারে না। এই জগতে যত সংহত পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্তুতে—এমন কোন তৃতীয় বস্তুতে—যাহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং নানাপ্রকার বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন মনও পুরুষের জন্য।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

—বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের পক্ষে মনে আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়।

বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নন।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং[১] চিত্তম্ ॥ ২৫ ॥

—তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে।

---

১ পাঠান্তর—কৈবল্যপ্রাগ্ভারং।—তখন অর্থ হইবে, মনে বিবেকজ্ঞান গভীর হয়, এবং উহা কৈবল্যের অভিমুখে ধাবিত হয়।

এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়া যায়, আমরা তখন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের জন্য এই-সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে। আমরা তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি জগতের প্রভু নয়। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতি কেবল আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন রাজা পুরুষকে এইসব দৃশ্য দেখাইবার জন্য। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়া যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

—উহার বিঘ্নরূপে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য যে চিন্তা মনে উঠে, তাহা সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হয়।

আমাকে সুখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্তু আবশ্যক—এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে-সকল ভাব হইতে আসে, সেগুলি সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক। পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ ও আনন্দস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান পূর্বসংস্কারের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্যক।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

—(অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি) ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা ধ্বংস করার কথা বলা হইয়াছে (২।১০), এগুলিকেও ঠিক সেই উপায়েই নাশ করিতে হইবে।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮ ॥

—তত্ত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানলাভের ঠিক পূর্বে ঐশ্বর্যরূপ ফলও যিনি ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞানের ফলে তাঁহার ধর্মমেঘ-নামক সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট পূর্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্রকৃত যোগী এগুলি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তখন তিনি এক বিশেষ আলোক দেখিতে পান—তিনি ধর্মমেঘ-নামক এক আশ্চর্য জ্ঞানের অধিকারী হন। ইতিহাস যে-সকল ধর্ম-

গুরুর কথা বর্ণনা করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের ভিতরেই জ্ঞানের বিশাল ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সত্য তাঁহাদের নিকট বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তিসমূহের অভিমান ত্যাগ করাতে শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা তাঁহাদের স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

—তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়।

যখন এই ধর্মমেঘ-সমাধি হয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাঁহাকে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, আর তাঁহার কোন দুঃখকষ্ট থাকে না।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩০ ॥

—তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও অশুদ্ধিশূন্য হওয়ায় অনন্ত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে।

জ্ঞান তো ভিতরেই রহিয়াছে, উহার আবরণ সরিয়া গিয়াছে। কোন বৌদ্ধশাস্ত্র 'বুদ্ধ' (ইহা একটি অবস্থার সূচক) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন— অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান। যীশু ঐ অবস্থা লাভ করিয়া 'খ্রীষ্ট' হইয়াছিলেন। তোমরা সকলেই ঐ অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যাইবে। সর্বপ্রকার জ্ঞেয়বস্তু-সমন্বিত সমগ্র জগৎ পুরুষের নিকট যেন শূন্যে পরিণত হয় সাধারণ মানুষ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করে, কারণ তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া বোধ হয়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥ ৩১ ॥

—যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির পর পর যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়া যায়।

তখন গুণগুলির এই-সব বিবিধ পরিণাম,—এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণতি—সব একেবারে শেষ হইয়া যায়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

—যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্তসম্বন্ধ লইয়া অবস্থিত ও যাহাকে

একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে) যাইয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্রম।

পতঞ্জলি এখানে 'ক্রম'-শব্দের সংজ্ঞা দিতেছেন। যে পরিণামগুলি মুহূর্তকাল-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, 'ক্রম' শব্দ দ্বারা সেগুলিকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, ইহারই মধ্যে কত মুহূর্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তেই ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু আমরা ঐ পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীর অন্তে (অর্থাৎ অনেক পরিণামশ্রেণীর পর) ধরিতে পারি। ইহাকে 'ক্রম' বলে। কিন্তু যে-মন সর্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর 'ক্রম' নাই। তাহার পক্ষে সবই বর্তমান হইয়া গিয়াছে। কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তখন সেই মন কালকে জয় করে আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সবই তাহার নিকট বিদ্যুতের মতো এক ঝলকে প্রকাশ পায়।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ
কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ ৩৩ ॥

—গুণসকলে যখন পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে 'কৈবল্য' বলে, অথবা উহাকে চিৎশক্তির (চৈতন্যশক্তির) স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

প্রকৃতির কার্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদচিহ্নহীন জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।

যাঁহারা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক! তাঁহারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন!

পরিশিষ্ট

যোগবিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লেখ ঃ

১. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

দ্বিতীয় অধ্যায়

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে ।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥

—যেখানে অগ্নিকে মথন করা হয়, যেখানে বায়ুকে রোধ করা হয় এবং যেখানে অপর্যাপ্ত সোমরস প্রবাহিত হয়, সেখানে (সিদ্ধ) মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ।
ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥

—বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলা দ্বারা সকল ভয়াবহ স্রোত পার হইয়া যান ।

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত ।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥

—সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযত করেন । যখন উহা শান্ত হইয়া যায় তখন নাসিকা দ্বারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ করেন । যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বগণকে সংযত করেন অধ্যবসায়শীল যোগীও সেইভাবে মনকে ধারণ করিবেন ।

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

—সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকাশূন্য, মনুষ্যকৃত অথবা কোন জলপ্রপাতজনিত মনশ্চাঞ্চল্যকর শব্দ-শূন্য, মনের অনুকূল, চক্ষুর প্রীতিকর পর্বতগুহাদি নির্জন স্থানে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥

—নীহার, ধূম, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, চন্দ্র—এই রূপগুলি সম্মুখে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রহ্মকে অভিব্যক্ত করে।

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২ ॥

—যখন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে যৌগিক অনুভূতিসমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ যোগাগ্নিময় শরীর পাইয়াছেন, তাঁহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

—শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোভশূন্যতা, সুন্দর বর্ণ, স্বরমাধুর্য, মূত্রপুরীষের অল্পতা ও শরীরে একটি পরম সুগন্ধ—যোগারম্ভ করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি প্রথমেই প্রকাশ পায়।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তং।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

—যেমন সুবর্ণ ও রজত প্রথমে মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত থাকে, পরিশেষে উত্তমরূপে ধৌত হইয়া তেজোময় দীপ্তিতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেহী আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া একস্বরূপ, কৃতার্থ ও দুঃখবিমুক্ত হয়।

২. শঙ্কর-উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য

আসনানি সমভ্যস্য বাঞ্ছিতানি যথাবিধি।
প্রাণায়ামং ততো গার্গি জিতাসনগতোঽভ্যসেৎ ॥
মৃদ্বাসনে কুশান্ সম্যগাস্তীর্যাজিনমেব চ।
লম্বোদরং চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ ॥
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
অতিভুক্তমভুক্তং চ বর্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥
নাড়ীসংশোধনং কুর্যাদুক্তমার্গেণ যত্নতঃ।
বৃথা ক্লেশো ভবেত্তস্য তচ্ছোধনমকুর্বতঃ ॥

নাসাগ্রে শশভৃদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্।
সপ্তমস্য তু বর্গস্য চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্ ॥

বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে ।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহ্যং দ্বাদশমাত্রকৈঃ ॥
ততোঽগ্নিং পূর্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্জালাবলীযুতম্ ।
রুষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমণ্ডলসংস্থিতম্ ॥
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য ঘ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ ॥
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ ।
ত্রিচতুর্বৎসরং চাপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা ॥
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্যেবং সমভ্যসেৎ ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়ং স্নাত্বা ষট্‌কৃত্ব আচরেৎ ॥
সন্ধ্যাদি কর্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেঽপি নিত্যশঃ ।
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক্ ॥
শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিবিবর্ধনম্ ।
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিসূচকম্ ॥

প্রাণায়ামং ততঃ কুর্যাদ্রেচকপূরককুম্ভকৈঃ ।
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

*　　　　*　　　　*

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্ ।
মাত্রৈর্দ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়োর্নিশ্চলং মূর্ধ্নি দেশতঃ ।
কুম্ভকং ধারণং গার্গি চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া ॥
ঋষয়স্তু বদন্ত্যন্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
পবিত্রীভূতাঃ পূতাত্মাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ ॥
তত্রাদৌ কুম্ভকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া ।
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈর্ন্যাসেনৈকেন সুন্দরি ॥

তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া।
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥

—যথাবিধি বাঞ্ছিত আসন অভ্যাস করিয়া অতঃপর হে গার্গি, জিতাসনগত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আসনে কুশ সম্যক্ বিছাইয়া, তাহার উপর মৃগচর্ম বিছাইয়া, ফল ও মোদকের দ্বারা গণেশের পূজা করিয়া, সেই আসনে সুখাসীন হইয়া বামহস্তে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া, সম-গ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, নিশ্চল হইয়া, পূর্বমুখ বা উত্তরমুখে বসিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, অতিভোজন বা একেবারে অনাহার ত্যাগ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে যত্নপূর্বক নাড়ী শোধন করিবে; এই নাড়ী শোধন না করিলে সাধনের ক্লেশ সমস্তই বৃথা হয়।

পিঙ্গলা ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নাসিকার সংযোগস্থলে) 'হুং' বীজ চিন্তা করিয়া ইড়াকে দ্বাদশমাত্রা বাহ্য বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবে, পরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও 'রং' বীজ ধ্যান করিবে; এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গলা (দক্ষিণ নাসিকা) দিয়া বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় পিঙ্গলার দ্বারা পূরক করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ধীরে ধীরে ইড়া দ্বারা রেচন করিবে। গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহা তিন-চারি বৎসর অথবা তিন-চারি মাস অভ্যাস করিবে। উষাকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্যরাত্রে, যতদিন না নাড়ীশুদ্ধি হয় ততদিন গোপনে অভ্যাস করিতে হইবে; তখন তাঁহাতে এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় যথা, শরীরের লঘুতা, সুন্দরবর্ণ, ক্ষুধা ও নাদ-শ্রবণ।

পরে রেচক, কুম্ভক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে। অপানের সহিত প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম।

১৬ মাত্রায় মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত পূরক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক করিবে।

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও শেষে ১৬ মাত্রায় পূরক করিতে হইবে।

প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। ধারণা

দ্বারা মনের অপবিত্রতা দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং ধ্যানের দ্বারা নাশ হইয়া যায়—যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবৃত করিয়া রাখে।

৩. সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায়

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥

—প্রগাঢ় ধ্যানবলে শুদ্ধস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতির মতো সমুদয় শক্তি আসিয়া থাকে।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০ ॥

—আসক্তির নাশকে ধ্যান বলে।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

—সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়।

ধারণাসনস্বকর্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

—ধারণা, আসন ও নিজ কর্তব্যকর্ম নিষ্পাদনের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়।

নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥

—শ্বাসের ছর্দি (ত্যাগ) ও বিধারণ (ধারণ) দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধ হয়।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৩৪ ॥

—যেভাবে বসিলে স্থৈর্য ও সুখ লাভ হয়, তাহার নাম আসন।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

—বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারাও।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥

—'ইহা নয়, ইহা নয়' বলিয়া প্রকৃতির প্রত্যেকটি তত্ত্বকে ত্যাগ করিতে পারিলে বিবেক সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

—বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্যক।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

—শ্যেনপক্ষী যেমন মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়া সুখী হয়, সাধুও সেইরূপ ইচ্ছাপূর্বক সর্বত্যাগ করিয়া সুখী হইবেন।

অহিনির্ব্বয়নীবৎ ॥ ৬ ॥

—সর্প যেমন হেয়জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে পরিত্যাগ করে (সাধকও সেইরূপ পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিবেন)।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

—যাহা বিবেকজ্ঞানের সাধন নয়, তাহা চিন্তা করিবে না, কারণ উহা বন্ধনের হেতু ; দৃষ্টান্ত—ভরত রাজা।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥

—বহু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাদির কারণ বলিয়া ধ্যানের বিঘ্নস্বরূপ ; দৃষ্টান্ত—কুমারীহস্তের বহু শঙ্খ।

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥

—দুইজন (বা দুইটি শঙ্খ) একসঙ্গে থাকিলেও এইরূপ।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥

—আশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ ১৩ ॥

—যদিও বহু শাস্ত্র ও বহু গুরুর উপাসনা করা হয়, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে, মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে।

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥

—শরনির্মাতার মতো একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥

—লৌকিক বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা অনর্থের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ইহাতেও।

প্রণতিব্রহ্মচর্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাত্তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

—প্রণতি, ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবাদ্বারা বহুকালে সিদ্ধিলাভ হয়, যেমন ইন্দ্রের হইয়াছিল।

ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥

—জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। যেমন, বামদেব মুনির (গর্ভাবস্থায় জ্ঞানোদয়) হইয়াছিল।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

—যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গদ্বারাও বিবেক লাভ হইয়া থাকে।

ন ভোগাদ্ রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭ ॥

—যেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্যেরও ভোগে রাগশান্তি হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥

—ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য হয় বলিয়া যেমন লোকে ঔষধাদির শক্তি অস্বীকার করে না, যোগজ সিদ্ধিও সেইরূপ অস্বীকার করা চলিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥

—স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও সুখকর হয়, এরূপভাবে উপবেশনের নামই আসন।

৪. ব্যাস (বেদান্ত) সূত্র

৪র্থ অধ্যায়—১ম পাদ

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

—উপাসনা বসিয়াই সম্ভব, সুতরাং বসিয়া উপাসনা করিবে।

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

—ধ্যান-হেতুও (উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে দেখিয়া লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব)।

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

—কারণ ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

—কারণ, স্মৃতিতেও এইরূপ আছে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

—যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিবে, কারণ কোন্ স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে, তাহার কোন বিশেষ বিধান নাই।

*　*　*

এই কয়েকটি উদ্ধৃত অংশ দেখিলেই একটা ধারণা হয়—যোগসম্বন্ধে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের কি বলিবার আছে।

তথ্যপঞ্জী

চিকাগো বক্তৃতা

গ্রন্থপরিচয়: বিশ্বমেলার অঙ্গ ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ভারতের প্রাচীন বৈদিক ও বৈদান্তিক ধর্মাদর্শ—যাহা সাধারণের নিকট 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত—তাহা যুগের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধেও কয়েকটি আলোচনা আছে। Paper on Hinduism—এটিই মূল বক্তৃতা, ইহার যে দুইটি বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহাতে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়—একটি স্বামীজী বা তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, অন্যটি Parliament of Religion-এর বিবৃতির অন্তর্গত।

[ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতাসূচী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩ ১ বিশ্বমেলা: কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন (১৪৯৪ খৃঃ) তাই আমেরিকার অপর নাম 'কলম্বিয়া'। আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০তম বর্ষ উপলক্ষে ১৮৯৩ খৃঃ শিকাগোতে এক মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার নাম 'কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশন' (Columbian Expositon)। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পার্থিব উন্নতি প্রদর্শন করা। ১৮৯১ খৃঃ প্রথম পরিকল্পনা হয় ধর্ম-মহাসভাও ইহার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। বিশ্বমেলা (World's Fair) প্রধানতঃ শিল্প ও কলা প্রদর্শনী। এই মেলা জ্যাকসন পার্কে ১৩৩৭ একর জমিতে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্প, কলা, শিক্ষা ও বিজ্ঞান এবং তৎসহ ধর্ম—এগুলিই ছিল এই মেলার প্রধান বিভাগ। ধর্মসভা 'হল অব কলম্বাস' আর্ট প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে পর্যন্ত এই সভা বসে। কার্ডিনেল গিবনস্ ইহার উদ্বোধন করেন। রেভারেণ্ড ব্যারোজ ইহার সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রায় ৫০টি জাতি ইহাতে যোগদান করে। এইটিই প্রথম বিশ্ব ধর্মমহাসভা।

চার্লস ক্যারল বনী নামে আমেরিকার এক খ্যাতনামা আইনজীবী প্রথম এই বিরাট মহামেলার পরিকল্পনা করেন। ইহা বহুলভাবে সমাদৃত হয় এবং ১৮৯০ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর মিঃ

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা

সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

সভার দিন-সংখ্যা	তারিখ ও বার	বৈঠক	বক্তৃতার বিষয়	বক্তৃতার ক্রমিক সংখ্যা
১ম	১১ই, সোমবার	অপরাহ্ণ	অভ্যর্থনা	১ম
৫ম	১৫ই, শুক্রবার	„	ভ্রাতৃভাব	২য়
৯ম	১৯শে, মঙ্গলবার	„	হিন্দুধর্ম	৩য়
১০ম	২০শে, বুধবার	সন্ধ্যা	ভারতে খ্রীষ্টান পাদরী, পৌত্তলিকতা ও পুনর্জন্মবাদ	৪র্থ
১৬শ	২৬শে, মঙ্গলবার	„	হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক	৫ম
১৭শ	২৭শে, বুধবার	সকাল	বিদায়-ভাষণ	৬ষ্ঠ
		ধর্ম-মহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে		
১২শ	২২শে, শুক্রবার	সকাল	গোঁড়া হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত,—প্রশ্ন ও উত্তর	১ম
১৩শ	২৩শে, শনিবার	অপরাহ্ণ	ভারতের বর্তমান ধর্মাদি	২য়
১৫শ	২৫শে, সোমবার	সকাল	জাপানী বৌদ্ধমত	৩য়
		অপরাহ্ণ	হিন্দুধর্মের সার	৪র্থ

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

বনীর সভাপতিত্বে World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition সংগঠিত হয়। আড়াই বৎসর ধরিয়া ব্যাপক প্রস্তুতির পর ১৮৯৩ খৃঃ ১৫ই মে হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত চিকাগো শহরে ২০টি অধিবেশন হয়। বিষয় ছিল—নারী-প্রগতি, পাবলিক প্রেস, শল্য-চিকিৎসা, মিতাচার, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সঙ্গীত, আইনসংস্কার, ধর্ম ইত্যাদি। ঐ সকল অধিবেশনের মধ্যে ধর্মমহাসভাই সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে।

৩ ১ চারিটি সমাবেশ হইয়াছিল

বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প এবং আইন বা মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মিলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২১ দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিষ্য

স্বামীজীকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় পাঠাইবার জন্য যাঁহারা তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আলাসিঙ্গা পেরুমল, ডি. আর. বালাজী রাও, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র, জি. জি. নরসিংহচারিয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামনাদের রাজাও এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

৪ ১৫ অধ্যাপক রাইট: ডক্টর জন হেনরী রাইট ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। 'ব্রীজী মেডোজ'-এর মিস স্যানবর্নের সৌজন্যে ইঁহার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীকে প্রদত্ত পরিচয়-পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'ইনি এমন একজন মানুষ, যাঁহার পাণ্ডিত্য আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।'

৫ ২৬ রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ: প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক। ধর্মসম্মেলনের জেনারেল কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

এই কমিটি ১৬টি বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে তিনি চমৎকার বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন 'The World's Parliament of Religions' বিবরণী গ্রন্থে।

৫ ২৯ কলম্বস হল্: চিকাগোর মিশিগান অ্যাভিনিউ-এ নূতন প্রতিষ্ঠিত আর্ট ইনষ্টিটিউটের (বাড়িটি তখনও চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য খোলা হয় নাই) হলে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রস্তর-নির্মিত বিরাট বাড়িটি আজও মহাসভার স্মৃতি বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই খণ্ডে চিত্র দ্রঃ।

২৯ চার হাজার উৎসুক শ্রোতৃবর্গ

বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রায় চার হাজার শ্রোতা কলম্বস হলের গ্যালারী ও মেঝেতে সমবেত হইয়াছিল। ডেলিগেটদের আসার অপেক্ষায় তাহারা শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিল—বর্ণিত আছে, সেখানে এমন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল যে, একটি ছোট পাখি জানালা দিয়া উড়িয়া গেলেও তাহার শব্দ শোনা যায়। হলের বাহিরেও এক বৃহৎ জনতা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল।

৬ ৫ কার্ডিনাল গিবন্স্: ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রোমের পোপ যে সকল ধর্মযাজকের সাহায্যে ধর্মীয় কার্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদের 'কার্ডিনাল' বলা হয়।

১৩ ব্রাহ্মসমাজের বি. বি. নাগারকর

বোম্বাই হইতে 'প্রার্থনা-সমাজে'র প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাসভার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রার্থনা-সমাজ একেশ্বরবাদী, অনেকটা ব্রাহ্মসমাজের মতো।

১৪ বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপাল

অনাগারিক ধর্মপাল; সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ প্রতিনিধি। ১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেলুড় মঠে আসেন।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি এবং সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

৬ ২২ তাও ধর্ম: খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লাও-ৎ-স্থ (Lao-tze জন্ম ৬০৪ খৃঃ পূঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চীনের দর্শনমূলক ধর্ম। কর্মফল ত্যাগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধ্যানমগ্ন হওয়া তাও-ধর্মের লক্ষ্য। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত প্রশান্তিবাদ (Quietism) কনফুসীয় ধর্মের বুদ্ধিবাদের (rationalism) বিপরীত। চীনে যে তিনটি ধর্মের প্রাধান্য, 'তাও' তাহাদের মধ্যে একটি। লাও-ৎ-স্থ প্রণীত তাও-তে-কিঙ (Tao-Teh-King) গ্রন্থে মুক্তির জন্য পথ বা 'তাও' নির্দেশ করিয়াছেন। কথিত আছে কুং-ফু-ৎস্থ বা কংফুছের (Confucius) সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়।

২২ কংফুছের মত: চীনদেশের কংফুছের আসল নাম কুং-ফু-ৎস্থ (K'ung Fu-tsu জন্ম ৫৫১ খৃঃ পূর্বাব্দে)—পাশ্চাত্যদেশে ইনি কনফ্যুসিয়াস নামে পরিচিত। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের আচার ব্যবহারে আমূল পরিবর্তনের জন্য তিনি উপদেশ দেন। জীবনের শেষভাগে গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

কনফ্যুসিয়াস ও সেনসিয়াস (খৃঃ পূর্ব ৩৮৫ বা ৩৭২ হইতে ২৮৯ খৃঃ পূর্বাব্দ) প্রদত্ত নৈতিক দর্শনের শিক্ষাই কনফুসীয় ধর্মের মূলগত বস্তু। মানুষের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া এই ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ নৈতিক অনুশাসন, মাতাপিতার প্রতি ভক্তির উপরও জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই মত অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল—কালক্রমে ইহাতে ধর্মীয় বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করে।

২২ শিন্টো ধর্ম: শিন্টো বা কামি-নো-মিচি (Kami-no-Michi) অর্থাৎ 'দেবতার পথ' জাপানের একটি প্রাচীন ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে জাপানে ইহার প্রাধান্য ছিল। এই ধর্মের উপদেশ ও বিধিগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হইত এবং

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে সেইগুলি লিখিত হয় নাই। এই ধর্মে সম্রাট বা অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জীবিতকালে বা মৃত্যুর পর দেবতারূপে পূজিত হয়। তাহাদের নামে ধর্মমন্দির উৎসর্গীকৃত হয়।

স্থূলভাবে বহুদেবতার উপাসনার বাহিরে ইহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা সম্বন্ধে ধারণা বা কোন নৈতিক বিধি এই ধর্মে নাই বলিলেই চলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি-উপাসনার ধর্ম। তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সম্রাট ও পূর্বপুরুষের উপাসনা। এই কারণে জাপানীদের কাছে দেশ-ভক্তি ধর্ম-বিশেষে পরিণত হইয়াছে।

৬ ২৪ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার: ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত, 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি আমেরিকা যান এবং বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯১ খৃঃ যখন চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি চলিতেছিল, তখন মজুমদার কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ৭ম খণ্ডে ব্যক্তি-পরিচয় দ্রঃ।

২৯ জান্তের গ্রীক ধর্মযাজক

জান্তে (Zante) গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এখানকার চার্চ গ্রীসের প্রাচীন চার্চের অনুবর্তী। কনস্টান্টিনোপল-এর প্যাট্রিয়ার্কই এই ধর্মমণ্ডলীর প্রধান।

৭ ৩ আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট

বেঞ্জামিন ডব্লু. আর্নেট ছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনের শেষ বক্তা

১৩ অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি

সম্রাট অশোকের আদেশে তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীতে এক বৌদ্ধধর্মসংগীতি আহূত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত আছে। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মতবাদগুলি সুসঙ্গত ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভ্রান্ত মতগুলির নিরসন করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

পৃষ্ঠা-পঙ্‌ক্তি

৭ ১৩ আকবরের ধর্মসভা

সম্রাট আকবর (১৫২৬-১৬০৫) প্রচলিত ধর্মগুলির মতবাদ বিষয়ে আলোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রির রাজভবনে 'ইবাদত-খানা' বা পূজামন্দির নির্মিত করিয়াছিলেন। এখানে নিয়মিত-ভাবে ধর্মসভা আহূত হইত এবং সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ধর্মের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিতেন।

৯ ৪ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজ

বৈদিক সন্ন্যাসিগণই প্রাচীনতম সন্ন্যাসী। অশোকের শিলালিপিতে অন্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের পূর্বেও ভারতে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ছিল, যদিও বৌদ্ধধর্মই ঐতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসিসমাজ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড (বেদান্ত) মুখ্যতঃ সন্ন্যাসীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। বৃহদারণ্যক ও মুণ্ডক-উপনিষদে সন্ন্যাস বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। চতুর্থ আশ্রম—সন্ন্যাস গ্রহণের জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগ করেন।

৫ সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ

বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য। বেদ হইতেই বিভিন্ন ধর্মভাব প্রসূত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—'বেদোঽখিলধর্মমূলম্'—বেদই সকল ধর্মের মূল। সকল ধর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেদ হইতেই আত্মা পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ভাবগুলি পাইয়াছে।

২০ ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্টাংশ

নীরোর রাজত্বকালে ৭০ খৃঃ টাইটাস কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংসের পর ইহুদীরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশে তাহাদের চরম নিপীড়ন সহ্য করিতে হয়, এবং তাহাদের জাতীয় বহু বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভারতে যাহারা আসে, তাহারা নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্মাচার ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়া অদ্যাবধি বাস করিতেছে।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

১০ ১ জরথুষ্ট্রের অনুগামী···আশ্রয়দান করিয়াছিল

যীশুখৃষ্টের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে জরথুষ্ট্র পারস্যে তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন। ইহাতে অগ্নি উপাসনা আছে। সপ্তম শতকে পারস্য যখন আরবের মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন একদল পারসীক তাহাদের ধর্মরক্ষার জন্য ভারতে বোম্বাই প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দুগণ তাহাদের সাদরে আশ্রয় দান করেন। এদেশে ইহারা 'পার্শী' নামে পরিচিত।

১৩ ১ ইহুদী : সেমিটিক জাতি, ভাষা হিব্রু। ইহারা একেশ্বরবাদী। আদিম বাস মেসোপোটেমিয়া। আরবের নানা স্থানে ঘুরিয়া ইহারা মিশরে যায় (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০), সেখানে বহু দুর্দশাভোগের পর মুশার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করিয়া ফিলিস্তিনে (Palestine) বসবাস করে। ৭০ খৃঃ রোমানরা আসিয়া ফিলিস্তিন অধিকার করে ও জেরুজালেম ধ্বংস করিয়া ইহুদীদের বিতাড়িত করে। তখন হইতে ইহারা ভবঘুরে হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হয়। বর্তমানে তাহাদের পুরাতন বাসভূমিতে যে নূতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, তার নাম ইস্রায়েল (Israel)।

১৮ বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ : বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্পর্কে মৌন ছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। সেই কারণে বৌদ্ধগণকে অজ্ঞেয়বাদী বলা হয়।

১৯ জৈনদের নিরীশ্বরবাদ : জৈনেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর না মানিলেও জৈনেরা মুক্ত, পূর্ণ ও সিদ্ধপুরুষদের ধ্যান ও পূজা করেন। জিন বা সিদ্ধপুরুষেরাই জৈনধর্মে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

২৪ আপ্তবাক্য

আপ্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত (Revealed); বেদ মানুষ কর্তৃক রচিত পুস্তক নয়। ভগবানের তত্ত্ব ঋষিদের নিকট উদ্ভাসিত হইত বলিয়া ইহাকে আপ্তবাক্য এবং অপৌরুষেয় বলা হয়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৪ ১৩ ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন

গার্গী, মৈত্রেয়ী ও অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ (দেবীসূক্তের দ্রষ্ট্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘোষা, বিশ্ববারা, যমী প্রভৃতি আরও নাম পাওয়া যায়।

১৭ বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ

—ইহা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ সূত্র। ইহাকে Law of Conservation of Energy বলা হয়। ইহার অর্থ জগতের সকল শক্তির একত্র পরিমাপ সর্বদা সমান।

১৫ ২৭ দেহমনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ মনের······লব্ধ হয় না কি ?

ক্রমবিকাশবাদের এই নিয়মানুসারে মাতাপিতার দেহমনের প্রবণতা সন্তানে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু স্বামীজীর মতে দৈহিক প্রবণতা পূর্বপুরুষের দেহ হইতে সঞ্চারিত হইলেও মনের প্রবণতা ঐভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। উহা নিজ নিজ পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল।

১৬ ৯ মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম

দ্রষ্টব্য : শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্ ৫।১১-১২

২৬ পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে

'সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।'—পাতঞ্জল যোগসূত্র ৩।১৮

—চিত্তের সংস্কারগুলিকে সংযম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে পূর্ব জন্মের জ্ঞান হয়।

১৮ ২৯ হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥—প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক

১৯ ১০ যাঁহার আদেশে······পরিভ্রমণ করিতেছে

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

—কঠ, ২।৩।৩.

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২০ ১ প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন……ভালবাসিতে পারি।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,

১৭ আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না

নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত॥

… … …

ধর্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্॥

—মহাভারত, বনপর্ব ৩১।২।৫

২৭ তখনই—কেবল তখনই হৃদয়ের……

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮

২১ ২৩ তখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।—ঐ, ৩।২।৯

২২ ৪ যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥—ঈশোপনিষৎ, ৭

১৬ রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে

আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সকল পদার্থের পরমাণুই ইলেক্ট্রন, প্রোটোন প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহাদের সংখ্যা ও সংহতির তারতম্যের উপরই পদার্থের বিভিন্নতা নির্ভর করে। বাস্তবিকই কয়েকটি ক্ষেত্রে পরমাণু-সংহতির রদবদল করিয়া এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। আর কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বভাবতই এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যথা ইউরেনিয়ম

পৃষ্ঠা পঙক্তি

ভাঙিয়া ভাঙিয়া অন্যান্য কয়েকটি তথাকথিত 'মৌলিক পদার্থ' সৃষ্ট হইতেছে।

২২ ১৮ পদার্থবিদ্যা যদি……অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র

বৈদ্যুত শক্তি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে, অথবা বলা যায় আলোক, তাপ, চৌম্বক (এমন কি হয়তো মহাকর্ষ) শক্তিও বৈদ্যুত শক্তিরই বিভিন্ন রূপ।

২৩ ২৫ ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি

—মেরী, খ্রীষ্ট, সন্ত (saints) ও দেবদূতদের (angels) মূর্তি।

২৪-২৩ শাস্ত্র বলিতেছেন : বাহ্যপূজা-মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ স্তুতির্জপোঽধমো
ভাবো বহিঃ পূজাঽধমাধমা। —মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪।১২

২৬ ১০ যেমন ডাইনী পোড়ানো দোষ

খৃষ্টানরা ডাইনী (witch) বলিয়া বহু নিরীহ কুরূপা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে পোড়াইত। ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্জী ৪৮৪ পৃঃ দ্রঃ।

২৬ আমাদের জাতি ও ধর্মমতের……সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই,

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ। —বেদান্তসূত্র, ৩।৪।৩৬

২৮ ৪ পারসীকদের অহুর-মজদা : পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্-আবেস্তায় (Zend-Avesta) আছে যে, এই বিশ্বের সকল মঙ্গলের প্রতীক হইলেন অহুর-মজদা (Ahura-Mazda)। অমঙ্গলের প্রতীক অহ্রিমান (Angre Mainyu)—উভয়ে সর্বদা সংগ্রামরত।

৪ 'ইহুদীদিগের জিহোবা : ইহুদীদিগের পরম দেবতা বা ঈশ্বর। তাঁহার আসল নাম Yahweh, হিব্রু উচ্চারণে 'জিহোবা'।

৩১ ১ ওল্ড টেস্টামেণ্ট : বাইবেলের প্রথম অংশ, যাহাতে ইহুদীজাতির ইতিহাস ও ঈশ্বরের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ ইহাকে আদি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

১৬ তাঁহার (বুদ্ধের) কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন

মহাকাশ্যপ, সারিপুত্ত, মোগ্গলায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণবংশজাত।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩১ ২১ আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব

বুদ্ধদেব সর্বসাধারণে প্রচলিত পালি ভাষায় শিক্ষা দিতেন, যাহাতে সকলে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে পারে, ত্রিপিটক পালি ভাষাতেই লিখিত।

৩২ ৯ জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিককে বলিতে হইয়াছে

মেগাস্থিনিস (Megasthenes) তাঁহার 'Indica' গ্রন্থে ভারতের এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছিলেন।

কর্মযোগ

গ্রন্থপরিচয় : স্বামীজীর কর্মযোগ গীতার কর্মযোগের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত কার্য করিতেছি; কিন্তু কি করিয়া এই কর্মকে উপাসনায় পরিণত করা যায়, কি করিয়া এই কর্মের দ্বারাই আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি, কোন কর্মই যে ছোট নয় এবং স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আমরা কেহই যে ছোট নই, স্বামীজী প্রাঞ্জল ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতায় তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই তাহার প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণকালে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৬ খৃঃ নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে উহা 'কর্মযোগ' নামক ইংরেজী পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় ও অতঃপর উহা স্বামী শুদ্ধানন্দজী কর্তৃক অনূদিত হইয়া 'উদ্বোধন' হইতে প্রকাশিত হয়।

এই বক্তৃতাগুলির সারমর্ম : প্রত্যেক কর্ম দ্বারা আমাদের চরিত্র গঠিত হয়; আমরা যেরূপ কাজ, যেরূপ চিন্তা বা যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুযায়ী আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের চিন্তা ও বাক্যগুলি শুদ্ধ হইলে আমরাও শুদ্ধ হইয়া যাইব। কিন্তু কি করিয়া ঐগুলি শুদ্ধ করা যায়, স্বামীজী 'কর্মরহস্যে' তাহাই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

কর্মযোগ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আচার্য 'বিহিত কর্মে'র উপরই জোর দিয়াছেন তাঁহাদের মতে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হইয়া ঐ সকল কর্ম করিলে উহাতেই শীঘ্র বা বিলম্বে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং তাহাতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু স্বামীজীর মতে সকল কর্মই কর্ম, উহা শুদ্ধভাবে বা অনাসক্ত হইয়া করিতে পারিলে তাহাতেই জ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয়; কর্মের ভিতরে ছোট

বড় ভেদ নাই, যে রাজা সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য পালন করিতেছেন ও যে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিতেছে—উহাদের উভয়ের কর্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে পারে। তবে ইহার রহস্য হইতেছে—অনাসক্ত হইয়া কর্ম করা। 'কর্মণ্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' গীতার এই বাক্যই কর্মের রহস্য। ঐ উপদেশ শুধু অর্জুনের জন্য নয়, সকলের জন্য ; কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। কিন্তু কি করিয়া এইরূপ অনাসক্ত হওয়া যায়, স্বামীজী তাঁহার 'কর্মরহস্য' ও অন্যান্য বক্তৃতায় সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা দুই প্রকারে সম্ভব :

(১) ভক্তির আচার্যেরা বলিতেছেন—আমাদের শুভাশুভ সকল কর্মই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। আমরা যে-কোন কাজ করিতেছি, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যে যন্ত্রবৎ করিতেছি, বুঝিতে হইবে। ধাত্রী যেমন অপরের সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো পালন করে, কিন্তু অন্তরে ঠিক জানে যে ঐ সন্তান তাহার নয়—আমাদিগকেও সেইভাবে কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা ভক্ত বা ভগবানে বিশ্বাসী তাঁহাদের পক্ষেই এইভাবে কাজ করা সম্ভব।

(২) কিন্তু যাহারা ভগবানে বিশ্বাসী নয়, তাহারা কিরূপে অনাসক্ত হইবে? এ-কথা স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করিয়াছেন। স্বার্থপরতাই সংসার—স্বার্থপরতাই বন্ধনের কারণ। আমরা আমাদের নিজেদের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র আমিকেই আমাদের সব বলিয়া মনে করি, ঐ ক্ষুদ্র আমিকে 'বৃহৎ আমি'তে পরিণত করিতে হইবে—বিস্তৃত করিতে হইবে। উহা করিবার উপায়ও স্বামীজী তাঁহার 'কর্ম ও চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব' বক্তৃতায় বিশদভাবে বলিয়াছেন।

আমাদের সাংসারিক কর্তব্যগুলিও ঐ স্বার্থপরতা কমাইবার জন্য, ঐ-সকল কর্তব্য করিয়া আমরা কর্তব্যাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিব।

জ্ঞান ভক্তি বা যোগাদির উদ্দেশ্যও এই 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি'তে পরিণত করা। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই এক।

নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিতে শিখিলে 'বুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা বা খ্রীষ্ট প্রার্থনা দ্বারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, মানুষ কর্ম দ্বারাও সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে'—ইহাই কর্মরহস্য।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৪৪ ৩ নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন

ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রীঃ) প্রথমে মাধ্যাকর্ষণ পরে মহাকর্ষ নিয়ম (law of gravitation) আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের চিন্তাজগতে এক নবযুগের সূচনা করেন। এই নিয়মের অর্থ এই বিশ্বজগতের সকল বস্তুই—এমন কি অণুপরমাণু অপর সকল বস্তুকে অণুপরমাণু বা অংশকে আকর্ষণ করিতেছে।

৪৬ ১৬ পুরুষানুক্রমিক শক্তিসঞ্চার : Hereditary transmission—ইহা ডারউইনের বিবর্তনবাদেরই (theory of evolution) একটি নিয়ম। ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্জী, ৪৭২ পৃঃ দ্রঃ।

১৮ যোশেফ : যীশুর লৌকিক পিতা—সূত্রধরের কাজ করিতেন।

২০ বুদ্ধের পিতা : শুদ্ধোধন, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর রাজা ছিলেন।

৫৭ ২৭ তাঁহাদের (হিন্দু) শাস্ত্রে ও ধর্মনীতিবিষয়ক পুস্তকে

এইরূপ বহু গ্রন্থের মধ্যে মনুসংহিতাই প্রধান। চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, চতুর্বর্গ প্রভৃতি বিষয় বারটি অধ্যায়ে বর্ণিত। মনুসংহিতার অপর নাম 'মানবধর্মশাস্ত্র'। ইহার প্রণয়নকাল নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ধারিত করা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজের উপর মনুসংহিতার প্রভাব অসামান্য।

পাদ টীকা : মহানির্বাণ তন্ত্র : চৌদ্দটি উল্লাসে চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ও নানা প্রকার সাধনপদ্ধতি বর্ণিত আছে। তন্ত্রসকলের মধ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

৭৬ ৫ যেমন কূর্ম তাহার পদ ও মস্তক…

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—গীতা, ২।৫৮

৮১ ২৮ সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত

এই নকুলের গল্পটি মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আছে।

—৯০তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

৮৫ ৭ বাইবেল : গ্রীক শব্দ Biblia-র অর্থ—পুস্তিকাসংগ্রহ। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মশাস্ত্রের নাম হয় 'বাইবেল'। ইহার দুই ভাগ—ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট। প্রথমাংশ প্রধানতঃ ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, হিব্রুভাষায় লিখিত। ওল্ড টেস্টামেণ্টে ৩৯টি অধ্যায় (Books) আছে। নিউ টেস্টামেণ্টে আছে ২৭টি; ইহা প্রথম শতাব্দীতে গ্রীকভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয়। ইহাতে আছে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব, তাঁহার জীবন ও বাণী এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যদের রচনা। খ্রীষ্টানগণ উভয় অংশই মান্য করেন।

২৬ গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত দস্যুদল

মুঘলযুগের অবসানকালে উত্তর-ভারতে যে ব্যাপক নিয়মহীনতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই সুযোগে এই সংঘবদ্ধ দস্যুদলের আবির্ভাব হয়। গবর্নর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে ক্যাপ্টেন শ্লীম্যান (১৮৩৫ খৃঃ) প্রায় দেড় হাজার ঠগ ধরিয়া এই দলের উৎখাত করেন।

৮৮ ৪ 'বিদেশী শয়তান'—১৯০০ খৃঃ Boxer movement স্মরণীয়। সে সময়ে চীনাদের শ্লোগান ছিল—ঘুষি মারিয়া বিদেশী শয়তানদের (Foreign devils) সমুদ্রে ফেলিয়া দাও।

৯৩ ৬ ব্যাধগীতা : ধর্মব্যাধের উপদেশ ; মহাভারত বনপর্বের ১৯৬ হইতে ২০৬ অধ্যায়ে দুইটি উপাখ্যানে বর্ণিত। প্রথম—পতিব্রতোপাখ্যান, দ্বিতীয়—ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদ। ব্যাধোক্ত একটি শ্লোক :

কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং মম।
বর্তমানস্য মে ধর্মে মন্যুং ত্বং মা কৃথা দ্বিজ॥

২০ তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী

গাজীপুরের যোগী পওহারী বাবা। পরিব্রাজক জীবনের প্রথম ভাগে যোগশিক্ষার জন্য স্বামীজী ইহার নিকট যান। ইহার সাধন ভজন বিনয় ও ত্যাগ দেখিয়া স্বামীজী ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, ১৮৯৮ খৃঃ তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার সম্বন্ধে ইংরেজীতে

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

স্বামীজী একটি প্রবন্ধ লিখিয়া 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশ করেন (৮ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ দ্রঃ)। ইহা ছাড়া বক্তৃতায় ও পত্রাবলীতে পওহারী বাবা সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ আছে।

৯৭ ৪ মূশা: (Moses খ্রীঃ পূঃ ১৫৭১—১৪৫১) ইহুদীদের ধর্মপ্রবর্তক। মিশরে তাঁহার জন্ম হয়; কিছুকাল মেষপালক ছিলেন। মিশর হইতে নিগৃহীত ইহুদীগণকে নিরাপদে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া তিনি ইস্রায়েলে লইয়া আসেন, এই কাহিনী বাইবেলে বর্ণিত আছে (Exodus)। তাঁহাকে ইহুদী জাতির 'জনক' আখ্যা দেওয়া হয়। ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি ইহুদীদের দশটি ধর্মবিধি বলিয়া দেন। (৫ম খণ্ড, তথ্যপঞ্জী—৪৭৯ পৃঃ দ্রঃ)

৬ আজটেক: পৃথিবীর প্রাচীনতম আদিম জাতিগুলির অন্যতম। এই 'লাল মানুষ' জাতি পুরাকাল হইতে মেক্সিকোর মালভূমিতে বাস করিত এবং নিজস্ব সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। চৌদ্দ শতকের প্রথমভাগে তাহারা বর্তমান মেক্সিকোকে সুদৃঢ় করে এবং অল্পকালের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ১৫১৯ খ্রীঃ স্পেনের এক নৌবাহিনীর অধিনায়ক কোর্তেজ (Cortes) আজতেক-রাজ মণ্টজুমাকে পরাভূত করিয়া ঐ দেশ জয় করে। এই বিজয়ের ইতিহাস নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত।

৬ ফিনিসীয়: প্রাচীন সেমিটিক জাতি। বর্তমান সিরিয়ার উপকূল অঞ্চলে বাস করিত। তাহারা তাহাদের দেশকে 'ক্যানান' বলিত। হিব্রুর সহিত তাহাদের ভাষার সাদৃশ্য আছে। খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে মিশর ফিনিসিয়া জয় করে, তখন হইতে তাহাদের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। খ্রীঃ পূঃ ৮৭৬ হইতে ৬০৫ পর্যন্ত তাহারা আসিরিয়ার অধীন ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮ হইতে ৩৩৩ পর্যন্ত ফিনিসিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। সেকেন্দার শাহ কর্তৃক পারস্যসাম্রাজ্য-বিজয়ের পরে তাহারা গ্রীকদের ও তারপর রোমানদের অধীন হয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে

ষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলেও ব্যবসা-বাণিজ্য উপনিবেশ-স্থাপন ইত্যাদিতে তাহারা খ্যাতিলাভ করে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্থেজ নগরী তাহারাই স্থাপন করিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থে তাহাদের বহু উল্লেখ আছে। তাহাদের প্রধান দেবতা ছিলেন বা'ল (Ba'al)। সম্ভবতঃ এই নারীদেবতাই প্রথমে ভেনাসে (Venus) ও পরে আফ্রোদিতিতে (Aphrodite) রূপান্তরিত হন।

১০৫ ৪ 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বহু পিউরিটান (Puritans) অত্যাচারিত হইয়া ইংলণ্ড হইতে হল্যাণ্ডে যাইয়া বসবাস করে। সেখানে নানা অসুবিধার ফলে তাহারা ইংলণ্ডে ফিরিয়া যায় এবং প্রথম জেমসের রাজত্বকালে এই-সকল 'পিলগ্রিম ফাদার' প্রায় একশত জন প্লীমাথ বন্দর হইতে ১৬২০ খ্রীঃ 'মে ফ্লাওয়ার' নামে একটি ক্ষুদ্র মালবাহী জাহাজে আমেরিকার পথে যাত্রা করে। তাহারা কড্ অন্তরীপে অবতরণ করে এবং ম্যাসাচুসেট্‌স্-এ নিউ প্লীমাথ কলোনী স্থাপন করে। কথিত আছে যে, ১৬২৫ হইতে ১৬৪০ খ্রীঃ এর মধ্যে প্রায় ২০ হাজার লোক ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় আসিয়া নিউ ইংলণ্ডে (ম্যাসাচুসেট্‌স্, কনেক্‌টিকাট, নিউ হাম্পশায়ার ও রোড দ্বীপ) বসতি স্থাপন করে।

১১ নোয়ার আর্ক: বাইবেল-বর্ণিত জলপ্লাবনের কাহিনী দ্রষ্টব্য (O. T. Genesis, 6-9)। পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইলে ঈশ্বর জানান, সমগ্র সৃষ্টি তিনি জলমগ্ন করিবেন; শুধু পুণ্যবান্ নোয়াকে তিনি আদেশ দেন, নোয়া যেন একটি জাহাজে সকল প্রাণীর দুটি দুটি করিয়া সংগ্রহ করেন, ৪০ দিন অবিরত বৃষ্টির পর পৃথিবী জলমগ্ন হইল। তারপর জল কমিলে এই জাহাজের প্রাণিগণ আরারাত পর্বতের নিকট আসিয়া আবার প্রাণী সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে বসবাস করিতে লাগিল।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১১৪ ৭ এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলোক' (Light of Asia)

এডুইন আর্নল্ড (১৮৩২-১৯০৪) অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি Deccan College-এর অধ্যক্ষরূপে ভারতে আসেন। পরে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময় হইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ আরম্ভ করেন। পরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া Daily Telegraph পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৮৭৯ খৃঃ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Light of Asia প্রকাশিত হয়। ভগবান্ বুদ্ধের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে রচিত এই মহাকাব্যখানিতে 'ললিতবিস্তরের' খুব প্রভাব আছে। তাঁহার কৃত গীতার অনুবাদ 'Song Celestial' উল্লেখযোগ্য।

১১৮ ১৮ ব্যাসদেব: নারায়ণের অংশে জাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া 'বেদব্যাস' নামেও পরিচিত। মহাভারত ও বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতা। ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

২৪ শুকদেব: ব্যাসদেবের পুত্র, তিনি জন্ম হইতেই জ্ঞানী, পরমহংস, মুক্ত। পিতার নিকট বেদান্ত-তত্ত্ব অবগত হইয়া পুনরায় রাজর্ষি জনকের নিকট উপদিষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। ঋষিদের সভায় রাজা পরীক্ষিৎকে 'ভাগবত'-কথা শ্রবণ করান। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জনক: মিথিলার রাজা, ইনি 'বিদেহ জনক' নামেও প্রসিদ্ধ। রামায়ণে বর্ণিত আছে—মিথির পুত্র মিথিলাধিপতি জনক ঋষিতুল্য জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রাজর্ষি' বলা হইত। তিনি অনাসক্তভাবে প্রজাকল্যাণের জন্য রাজকার্য করিতেন ও জ্ঞানের চর্চা করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে' বৈদেহ জনকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১২১ ১২ জেণ্টাইল: প্রাচীন ইহুদীগণ—ইহুদী ছাড়া অন্য জাতিকে এই নামে অভিহিত করিত এবং তাহাদিগকে নিজেদের হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিত।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১২১ ১৮ 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালা : প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।'

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রকৃত পক্ষে পৃথক্ নয়—ইহাই তাৎপর্য। —গীতা, ৫।৪ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪১ ১০ ঠিক দান্তের সেই নরকচিত্রের মতো

ইটালীর শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি দান্তে Dante (১২৬৫—১৩২১ খ্রীঃ); তাঁহার বিখ্যাত কাব্য Divina Commedia-র অন্তর্গত Inferno অংশে নরকচিত্রের বর্ণনা আছে। মধ্যযুগে প্রচলিত শাস্তি-পুরস্কার-নীতির একটি জীবন্ত চিত্র।

২২ সুখের স্বর্ণযুগ (Millennium): ইহার আক্ষরিক অর্থ ১০০০ বৎসর; খ্রীষ্টান জগতে ইহার বিশেষ অর্থ যীশুর প্রত্যাশিত দ্বিতীয় আবির্ভাব (১০০০ খ্রীঃ) এবং সন্তদের লইয়া রাজত্ব-স্থাপন। ইহার প্রচলিত অর্থ—একটি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, যখন পৃথিবীতে সকলেই সুখে বাস করিবে, দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না।

১৪৩ ২২ আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানগণ

ইহারা উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী। ইহাদের গায়ের রং তামাটে। কলম্বস এই দেশ আবিষ্কার করিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন। সেজন্যই আমেরিকার এই লাল-অধিবাসীদের 'রেড-ইণ্ডিয়ান' বলা হয়। তাহারা মোঙ্গলশ্রেণীর (Mongoloid) মানবজাতির একটি শাখা এবং এস্কিমোগণ (Eskimo) তাহাদের একটি উপশাখা। 'আজতেক' বা 'মায়া'গণ তাহাদের শ্রেণীভুক্ত। মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার বেশীর ভাগ লোক এখনও হয় এই জাতীয় অথবা ইহাদের সহিত মিশ্রণে সম্ভূত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহারা এখন লুপ্তপ্রায়।

১৬৪ ২০ একবার নাকি…জাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'—মুক্তির অবস্থা বুঝাইবার এই অপূর্ব বৈজ্ঞানিকভাবের দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায়।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

১৭১ ৯ অর্জুন, তুমি মহাজ্ঞানীর............অত্যন্ত কাপুরুষ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। গীতা, ২।১১

১৭৩ ৮ পিথাগোরাস: পিথাগোরাস (খ্রীঃ পূঃ ৫৭০-৫০৪) একজন গ্রীক দার্শনিক। তিনি আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার কিছু কিছু ধর্মমত ভারতবর্ষের সাংখ্য-দর্শন হইতে গৃহীত। (৫ খণ্ডের তথ্যপঞ্জী, ৪৮১ পৃঃ দ্রঃ)

৮ লুথার: মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ) ছিলেন একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সংস্কারক এবং 'প্রোটেস্টাণ্ট' (Protestant) মতবাদের প্রবর্তক। জার্মানির থুরিঞ্জিয়া গ্রামে এক কৃষক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫০৫ খ্রীঃ তিনি সংসারত্যাগ করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ Indulgence প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া পোপের অধীনতা অস্বীকার করেন। ১৫২০ খ্রীঃ পোপ লুথারকে ধর্মদ্বেষী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জার্মানিতে লুথারের এতই জনপ্রিয়তা ছিল যে, লুথারকে কার্যতঃ কোন শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তিনি ইওরোপে স্বায় 'প্রোটেস্টাণ্ট' ধর্মমত প্রচার করেন। ১৫২৫ খ্রীঃ লুথার মঠজীবন ত্যাগ করেন। জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

৮ ক্যালভিন: ক্যালভিনের (১৫০৯-৬৪ খ্রীঃ) জন্ম ফরাসীদেশে। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরোধিতা করিয়া তিনি ১৫৩৪ খ্রীঃ দেশ হইতে পলায়ন করেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা শহরে বাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতকে তাহার নিজস্ব সুসঙ্গত একটি আকার দান করেন। তাঁহার ধর্মমত স্কটলণ্ডে প্রেসবিটেরিয়ান (Presbytarian) ও ইংলণ্ডে পিউরিটান (Puritan) নামে খ্যাত, এবং ফ্রান্সে হুগোনট্ (Hugonot) নামে পরিচিত। ১৫৩৬ খ্রীঃ তাঁহার 'The Institutes of the Christian Religion' পুস্তক প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

সরল রাজযোগ

১৮৮ ১৬ যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন···প্রবুদ্ধ করুন।

গায়ত্রী মন্ত্র : 'তৎ সবিতুঃ ···প্রচোদয়াৎ'। গুরুমুখে শ্রোতব্য।

১৯২ ২৮ কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ···তুলনা করা হয়েছে

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ১।৩।৩
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১।৩।৪

১৯৬ ৬ এই নিদ্রিত সর্পই কুণ্ডলিনী······

তুলনীয় সাধন-সংগীত : জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী।
প্রসুপ্তভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী ॥

৯ ওজঃ : দেহধারক সপ্ত-ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র ও অস্থি। এগুলির সার ওজোধাতু আধ্যাত্মিক শক্তির ভিত্তি।

ভ্রমরৈঃ ফলপুষ্পেভ্যো যথা সংভ্রিয়তে মধু।
তদ্বদোজঃ শরীরেভ্যো ধাতুঃ সংভ্রিয়তে নৃণাম্ ॥ ইতি বৈদ্যকম্।

১৫ এই কুণ্ডলিনী সর্প······সহস্রারে উপস্থিত হয়

এই সাতটি চক্র বা পদ্মের নাম ও অবস্থান (এই খণ্ডে ২০২ পৃষ্ঠায়, ও ২০৬ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)। যোগসূত্রে এগুলির উল্লেখ নাই, এগুলির কথা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, ষট্‌চক্রনিরূপণ, হঠযোগ-প্রদীপিকা, গোরক্ষসংহিতা, শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২০০ ১৭ 'কুম্ভকের সময় হুঁ মন্ত্র জপ করবে'

গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে 'হু' মন্ত্রে। হুঁ শিববীজবোধক মন্ত্র। হ-কার আকাশের বীজ।

রাজযোগ

গ্রন্থ-পরিচয় : চিকাগো ধর্মসম্মেলনে সাফল্যলাভের পর স্বামীজী আমেরিকার নানা স্থানে জনসভায় ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিসম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন। অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, জনসভায় বক্তৃতা দ্বারা স্থায়ী কাজ হইবে না; সেইজন্য স্থির করিলেন, নিয়মিত অধ্যাপনা দ্বারা তিনি একদল শিষ্য-শিষ্যা গড়িয়া তুলিবেন।

১৮৯৫ খ্রীঃ প্রথমভাগে কয়েকজন আগ্রহান্বিত ছাত্রছাত্রী নিউ ইয়র্কের এক দরিদ্র অঞ্চলে একটি সাধারণ বাড়ি ভাড়া করেন; স্বামীজী ঐ বাড়ির একটি ঘরে বাস করিতেন এবং তেতলায় একটি হল-ঘরে ক্লাস নিতেন। স্বামীজী মেঝেতে বসিয়া বক্তৃতা করিতেন, শ্রোতাগণ যে যেখানে পারিত বসিত, প্রতিদিন সকালে ও সপ্তাহে কয়েকদিন বিকালে বক্তৃতা হইত। এখানে তিনি বেশ কয়েকজন বাছাই-করা শিষ্যশিষ্যাকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিতেন। এ-ছাড়া তিনি এই সময় রাজযোগ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে সুরু করেন, যাহাতে ছাত্রেরা আত্মসংযম, একাগ্রতা ও ধ্যানের কৌশল শিক্ষা করিতে পারে। খাদ্য সম্পর্কে কঠোর সংযম ও নিয়ম পালন করিতে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিতেন। ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়া অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেন এবং তাহাদের লইয়া প্রতিদিন ধ্যান করিতেন।

ঐ বৎসর জুন মাসে স্বামীজী তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'রাজযোগ' লেখা শেষ করেন। পুস্তকটি পতঞ্জলির যোগসূত্রের অনুবাদ, তাহার সহিত স্বামীজী নিজের ব্যাখ্যা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভূমিকারূপে লিখিত কয়েকটি অধ্যায় এই অন্তর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে।

রাজযোগ-গ্রন্থটি লেখার কাজে শ্রুতলেখকের কাজ করেন স্বামীজীর শিষ্যা মিস এস. ই. ওয়াল্ডো। এ বিষয়ে তাঁহার বর্ণনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য :

In delivering his commentaries on the aphorisms, he would have me waiting while he entered into deep states of meditation or self-contemplation, to emerge thereupon with some luminous interpretation. I had always to keep the pen dipped in the ink. He might be absorbed for long period of time and then suddenly his silence would be broken by some eager expression or some long deliberate teaching.

বিষয় প্রবেশ ঃ

এই গ্রন্থের অবতরণিকায় স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ যোগশাস্ত্র শুধু কতকগুলি তত্ত্বের উপর স্থাপিত নয়। যদি ঈশ্বর থাকেন তো তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে ; তাহা না হইলে বিশ্বাস না করাই ভাল, ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল ; রাজযোগ-বিদ্যা সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে দীর্ঘদিন সাধন করিতে হয়। স্বামীজী বলিতেছেন : তুমি যদি জ্যোতির্বিদ্ হইতে ইচ্ছা কর, আর ঘরে বসিয়া জ্যোতিষ জ্যোতিষ' বলিয়া কেবল চীৎকার করিতে থাকো, তাহা হইলে কখনই তুমি জোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবে না।...তোমাকে মান-মন্দিরে যাইতে হইবে, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তারা ও গ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে, তবেই তুমি জ্যোতির্বিদ্ হইতে পারিবে ; সকল বিদ্যা সম্বন্ধেই এইরূপ। রাজযোগ-বিদ্যাও মানুষকে ঐরূপ একটি কার্যকর উপায় দেখাইয়া দেয় ; তবে বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া উহাদের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন, রাজযোগীও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিতে উদ্যত হন ; ঐ যন্ত্র তাঁহার 'মন' ; উহার শক্তিকে একত্র করিলে তিনি যে শুধু তাঁহার আভ্যন্তর জগতের তথ্য অবগত হন তাহা নয়, তিনি ইচ্ছা করিলে উহা হইতে সমগ্র অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের উপর আধিপত্যও লাভ করিতে পারেন, ইহাই রাজযোগের মূল কথা : ইহার সাধনকেই যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গ বলে, স্বামীজী রাজযোগের বিভিন্ন বক্তৃতায় ঐগুলিই বিস্তারিত ও বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে সর্বসাধারণকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে তোমার ধর্ম যাহাই হউক না কেন—তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, ইহুদী হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও—তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তুমি মানুষ, ইহাই যথেষ্ট।

সূত্রকার পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্' (সাধনপাদ, ৩১)। ইহার সাধনগুলি—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়

প্রভৃতি—প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ ও বালকের পক্ষে জাতি-দেশ-অবস্থা-নির্বিশেষে অনুষ্ঠেয়।

ভারতবর্ষে যোগের নানা প্রকার গ্রন্থ থাকিলেও স্বামীজী পাতঞ্জল সূত্রের রাজযোগকেই সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন: ভারতবর্ষে যত বেদমতানুযায়ী দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহাদের সকলের একই লক্ষ্য—পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি; ইহার উপায়—যোগ। 'যোগ' শব্দ বহুভাবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন না কোন আকারে যোগের সমর্থন করে। অন্যান্য দার্শনিকগণের কোন কোন দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ থাকিলেও সকলেই অবিপর্যয়ে তদীয় সাধনপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন।

হঠযোগাদি যোগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহার সাধকগণ শুধু শরীরকে দীর্ঘজীবী করিবার জন্য বিভিন্ন আসন ও প্রাণায়ামের চর্চা করেন বলিয়া বর্তমান গ্রন্থে স্বামীজী উহার চর্চা হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সকলকেই উহা সাধন করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

স্বামীজী এই ভূমিকায় যোগশিক্ষার্থিগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত নিরাপদে যোগ শিক্ষা করিতে হইলে গুরু সর্বদা নিকটে থাকা আবশ্যক।

পাতঞ্জল যোগসূত্র-ব্যাখ্যাতে স্বামীজী একটি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছেন; যাহাতে বর্তমান বিজ্ঞান-সম্মত ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়, সেইভাবে উহা প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। এই যোগসূত্রের নানাবিধ ভাষ্য টীকা ও বৃত্তি আদি আছে, তন্মধ্যে ব্যাসভাষ্য ও ভোজবৃত্তি সমধিক প্রচলিত। ভোজবৃত্তি বা রাজমার্তণ্ডাখ্য-বৃত্তি অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জল বলিয়া স্বামীজী তাঁহার ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে উহার অনুসরণ করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে অপরাপর ভাষ্য ও যোগের অন্যান্য পুস্তক হইতেও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

যোগের অষ্টাঙ্গ বা যোগসাধনের আটটি উপায় পতঞ্জলি উল্লেখ করিয়াছেন—ঐগুলি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

'যম' বলিতে অহিংসা (কায়মনোবাক্যে), সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (অপরের নিকট হইতে যথাসম্ভব অপ্রয়োজনীয় কোন বস্তু গ্রহণ না করা) বুঝায়।

'নিয়ম' বলিতে শৌচ (অন্তর্বহিঃ পবিত্রতা) সন্তোষ, তপঃ (শারীরিক, মানসিক ও বাচিক তপস্যা), স্বাধ্যায় (যে পুস্তক-পাঠে নিজের কল্যাণ হয়, উহা নিয়মিত পাঠ করা) ও ঈশ্বর-প্রণিধান (ঈশ্বর বা ভগবচ্চিন্তা) বুঝায়।

'আসন' বলিতে নানাবিধ শারীরিক আসন, যে-আসনে বসিয়া অধিকক্ষণ এক ভাবে চিন্তা করা যায়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে; 'স্থিরসুখমাসনম্' (সাধনপাদ, ৪৬)

'প্রাণায়াম' বলিতে আমরা শুধু প্রাণের সংযম বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ বুঝি, কিন্তু স্বামীজী 'প্রাণ' ও 'প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ' বিষয়ক বক্তৃতায় উহাকে আরও বিস্তারিত ও বর্তমান বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাণ বলিতে শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না, উহা জগতের মূল শক্তি, যাহা দ্বারা প্রতি অণু পরমাণু পর্যন্ত চালিত হইতেছে, উহাকেই এক আকারে আমরা আমাদের ফুসফুসের ভিতর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-পরিচালকরূপে দেখিতে পাই। উহাই আবার অন্যরূপে আমাদের মেরুদণ্ডের নিম্নে—যোগীদের মতে মূলাধার চক্রে—কুণ্ডলিনী-শক্তিরূপে অবস্থিত,—'প্রসুপ্তভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী'। এই কুণ্ডলিনীর জাগরণই যোগীদের কাম্য। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও যোগের অন্যান্য অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে উহার জাগরণ হইয়া থাকে। আমাদের মেরুদণ্ড মধ্যে—যোগীদের মতে ষট্চক্র অবস্থিত। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া চক্র হইতে চক্রান্তরে গমন করেন এবং পরে মস্তকমধ্যস্থ সহস্রার চক্রে বা পদ্মে যাইয়া উপস্থিত হন। তখন আমাদের সকল হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, আমরা সকল সংশয় অতিক্রম করিয়া পরমানন্দে অবস্থিত হই। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ইত্যাদি' মুণ্ডক উপ., ২।২।২।

'প্রত্যাহার' অর্থে—বাহিরের বিষয় হইতে মনকে ভিতরে টানিয়া আনা।

'ধারণা' অর্থে—মনকে ভিতরে বা বাহিরে একস্থানে কিছুক্ষণ ধারণ বা স্থির করিয়া রাখা, 'দেশবন্ধচিত্তস্য ধারণা'—(বিভূতিপাদ, ১)।

'ধ্যান' অর্থে—ঐ চিন্তাকে নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত করা 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্'—(বিভূতিপাদ, ২)।

'সমাধি'—ইহা যোগের শেষ অঙ্গ, ইহার অর্থ যখন ধ্যান করিতে করিতে মনের এমন এক অবস্থা হয়, যে উহা ধ্যেয়ের বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্র প্রকাশ করে—'তদেব অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমেব সমাধিঃ'—(বিভূতিপাদ, ৩)।

স্বামীজী আরও সরল করিয়া বলিয়াছেন: যদি মনকে কোনস্থানে ১২ সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি 'ধারণা' হইবে, এই ধারণা দ্বাদশ গুণ হইলে (১২ × ১২ = ১৪৪ সেঃ = ২মিঃ ২৪ সেঃ) একটি 'ধ্যান', এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ (২ মিঃ ২৪ সেঃ × ১২ = প্রায় অর্ধঘণ্টা) হইলে এক 'সমাধি' হইবে। ('সংক্ষেপে রাজযোগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

সমাধি সাধারণতঃ দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

সম্প্রজ্ঞাত: যখন মন অন্যান্য বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হইয়া প্রকৃতি ও উহা হইতে উৎপন্ন তত্ত্বগুলির—(মোট চতুর্বিংশতি তত্ত্বের) স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনটির বিষয়ে একাগ্র হইতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

অসম্প্রজ্ঞাত: মন যখন চেতনস্বরূপ পুরুষে একাগ্র হয়, তখন উহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

এই 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' আবার সাধারণতঃ চারিপ্রকার—(১) সবিতর্ক (২) নির্বিতর্ক (৩) সবিচার ও (৪) নির্বিচার।

সবিতর্ক: যখন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম্—পঞ্চ মহাভূতকে দেশ ও কালের ভিতরে চিন্তা করিয়া উহার কোনটিতে মন স্থির হয়, তখন তাহাকে 'সবিতর্ক সমাধি' বলে। (স্বামীজী উহা এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'বিতর্ক' অর্থ প্রশ্ন, 'সবিতর্ক' অর্থ প্রশ্নের সহিত, যাহাতে ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি ঐরূপ ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে।)

নির্বিতর্ক: যখন ঐ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্ করিয়া উহাদের স্বরূপ চিন্তা করা যায়।

সবিচার: যখন ধ্যেয়বস্তু আর স্থূল ভূত নহে, উহাদের সূক্ষ্মাংশ বা তন্মাত্র—

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং উহাদিগকে দেশ-কালের ভিতরে চিন্তা করা হইতেছে।

নির্বিচার: যখন ঐ ধ্যেয়বস্তুই আবার দেশকালশূন্যরূপে চিন্তা করা যায়।

ইহা ছাড়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আরও দুই প্রকারের কথা সূত্রে উল্লিখিত আছে, যথা 'আনন্দ' ও 'অস্মিতা'; উহাতে সূক্ষ্ম স্থূল উভয় প্রকার ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্তঃকরণকেই ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন উহাকে 'রজস্তমোলেশানুবিদ্ধ'রূপে চিন্তা করিয়া সমাধি হয়, তখন তাহাকে 'আনন্দ সমাধি' বলে, আবার যখন ঐ সমাধিই পরিপক্ব হইয়া অন্যান্য সকল ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া মনের স্বরূপ অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক অহঙ্কারে স্থিত হয়, তখন উহাকেই 'অস্মিতা সমাধি' বলে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অন্যপ্রকার—স্বামীজী বলিতেছেন, এই সমাধিই কেবল আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত সমধিতে শক্তিলাভ হয়, কিন্তু মুক্তি হয় না। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু তখনও সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ' (সমাধিপাদ, ১৮)। এই সমাধিই ক্রমে ক্রমে নির্বীজ হইয়া যায় ও আমাদের জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়। 'তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ (সমাধিপাদ, ৫১)।

এই অষ্টাঙ্গ সাধনের উদ্দেশ্য 'দ্রষ্টা'র স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। দ্রষ্টা (পুরুষ) অন্য সময়ে তাঁহার চিত্তবৃত্তির সহিত নিজেকে মিলাইয়া ফেলেন। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্', 'বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র'—(সমাধিপাদ, ৩, ৪)।

যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত; উভয়ের প্রতিপাদ্য একই। উভয়েই স্বীকার করেন, প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া দুইটি মূল পদার্থ আছে, প্রকৃতি জড় (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী); পুরুষ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ। এই চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে আলোড়ন উপস্থিত হয় ও প্রকৃতি হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব (প্রকৃতিকে লইয়া ২৪) উদ্ভূত হয়। উহারই নাম সৃষ্টি. আবার যখন এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব একে একে উহাতে প্রবেশ করে, তখন উহার সৃষ্টি

থামিয়া যায়, উহা সাম্যাবস্থা ধারণ করে, উহারই নাম 'প্রলয়'। এই সৃষ্টি ও প্রলয় আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় প্রকারের। এই উভয় দর্শনের মতে 'পুরুষ' এক নয়, বহু। পুরুষের সান্নিধ্যে যখন প্রকৃতির এই নৃত্য আরম্ভ হয়, চেতন নিষ্ক্রিয় পুরুষও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, উহাই তাহার বন্ধন, কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে শুধু ভোগই দেয় না তাহাকে অপবর্গও দেয়, 'প্রকৃতি ভোগাপবর্গদা'।

প্রকৃতির এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে পুরুষ হঠাৎ যেন তাহার পূর্বচৈতন্য ফিরিয়া পান, তখন নর্তকীর নৃত্য থামিয়া যায়, 'রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতি (সাংখ্যকারিকা, ৫৯) পুরুষ আবার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু পুরুষ তো এক নয় বহু, কাজেই একের মুক্তিতে অন্যের মুক্তি হয় না, 'কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ' (সাধনপাদ, ২২)। তাই প্রকৃতির নৃত্য চলিতে থাকে। কিন্তু এরূপ করিতে করিতেও প্রকৃতির লীলা থামিয়া যায়, প্রকৃতি তখন তাহার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া যায়, আবার কল্পান্তে প্রকৃতির আলোড়ন সুরু হয়।

এই তত্ত্বাংশে যোগ ও সাংখ্য উভয় দর্শনই এক। কিন্তু কি করিয়া ব্যষ্টি পুরুষ তাহার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, কি করিয়া প্রকৃতির সকল নৃত্য তাহার নিকট থামিয়া যাইতে পারে, সাংখ্যদর্শন তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। শুধু প্রকৃতি ও পুরুষ যে দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ—ইহা দেখাইয়া দিয়া উক্ত দর্শন উহার সাধককে সেই তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু যোগদর্শন উহার কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; এই অংশে উহা সাংখ্য হইতে পৃথক্ ও অধিক কার্যকর। দ্বিতীয় পার্থক্য যোগদর্শনে ধ্যানের অনেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানও একটি; এই ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আদিগুরু, সৃষ্টিকর্তা নন; তিনি ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট। সাংখ্য এইরূপ কোন ঈশ্বর মানেন না, তবে কোন কোন সকাম শক্তিমান্ সাধক প্রলয় হইলে প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করেন ও পরবর্তী কল্পের চালক হন, এইরূপ কল্পেশ্বর বা প্রকৃতিলীন পুরুষকে মানিয়া থাকেন।

সাংখ্য ও যোগের প্রধান প্রধান গ্রন্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

	সাংখ্য	যোগ
মূলগ্রন্থ	সাংখ্যকারিকা, ঈশ্বরকৃষ্ণ (প্রামাণ্য গ্রন্থ)	যোগসূত্র (পতঞ্জলি)
		যোগিযাজ্ঞবল্ক্য (শ্লোকাকারে)
	সাংখ্যসূত্র, কপিল (সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র)	
ভাষ্য :	কারিকার গৌড়পাদ	ব্যাস
	সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু	(শংকর ?)
টীকা :	„ বাচস্পতি	বাচস্পতি টীকা (প্রামাণিক)
		যোগমণিপ্রভা—রামানন্দ
বৃত্তি :	„ মাঠর বৃত্তি	বিজ্ঞানভিক্ষু (বিস্তৃত)
	„ অনিরুদ্ধ	ভোজবৃত্তি (সরল সংক্ষেপ) (ভোজরাজা লিখিত ?)
	„ জয়মঙ্গলা (শংকর)	নাগজী ভট্ট

সাংখ্য ও যোগের মত-বিষয়ে তুলনা

সাদৃশ্য	(১)	সৃষ্টি-প্রকরণে—উভয়েই একমত	পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তৃত্ব
	(২)	প্রমাণাংশে „ „	প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম
	(৩)	মুক্তি-বিষয়ে „ „	দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি
		সাংখ্য মতে	যোগমতে
বৈষম্য	(১)	জন্য ঈশ্বর স্বীকৃত, নিত্য ঈশ্বর নাই	ঈশ্বর নিত্য
	(২)	সাধনা—বিচারপ্রধান, ধ্যানসমাধি সহকারী	সমাধিপ্রধান, বিচার সহকারী
	(৩)	মনের বিভুত্ব স্বীকৃত নয়	মনের বিভুত্ব স্বীকৃত
	(৪)	ভ্রমে অবিবেক-খ্যাতি স্বীকৃত	অন্যথা-খ্যাতি স্বীকৃত
	(৫)	শব্দ বর্ণাত্মক ও আকাশের গুণ	স্ফোটাত্মক, নিত্য বিভু

সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রকরণ

পুরুষ (চৈতন্য) + প্রকৃতি (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ)

|

মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধি)

|

অহংকার

|

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্)

মন

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)

পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)

|

পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্)

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব :	প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও মন	:	৪
	জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্)	:	৫
	কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)	:	৫
	তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)	:	৫
	মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্)	:	৫
			২৪

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

২০৯ ৮ পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত

তথ্যপঞ্জীতে 'বিষয়-প্রবেশ' নিবন্ধে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

১২ জন্য ঈশ্বর: জীবই যোগসাধনার ফলে বিভূতি লাভ করিয়া পরকল্পে আংশিক সৃষ্টির নিয়ামকত্ব লাভ করে।

২১২ ৫ ধর্ম-বিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূল ভিত্তি আছে

ধর্ম-বিশ্বাস সাধারণতঃ দেশ কাল ও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। এগুলি আপাততঃ সার্বভৌম নয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি ধর্মভাবের মূলে যাওয়া যায়, তবে দেখা যায়—প্রতিটি ধর্মভাবই দেশ-কাল-ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এবং সর্বজনীন। স্বামীজী বহু স্থানে বহু ভাবে ধর্মের এই সার্বভৌম ভিত্তির কথা বলিয়াছেন। ইহার যথার্থ অনুশীলনে ধর্ম-বিরোধ দূরীভূত হইতে পারে এবং যথার্থ ধর্ম জীবনে রূপায়িত হইতে পারে।

২২৬ ১০ ডেলসার্ট:—'ডেলসার্ট ব্যায়াম' কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই হাত-পা চালনা করিয়া ভারসাম্য (balance) বজায় রাখিয়া শারীরিক ব্যায়াম। কিছুদিন আলমবাজার মঠে এই ব্যায়াম খুব চলিয়াছিল (৯ম খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ দ্রঃ)।

২২৮ যোগশাস্ত্রের জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন

দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৪৯

২৩১ ১৬ ইব্লিশ: কোরানে বর্ণিত আছে দেবদূত ইব্লিশ (Eblis) ভগবানের কথা অমান্য করায় শয়তানে পরিণত হইয়াছিল।

২৩৬ ১৭ কল্পান্তে: কল্পের শেষে প্রলয়কালে। পুরাণমতে ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দিবস ও সৃষ্টিকাল। অনুরূপ কাল রাত্রি, উহা প্রলয়কাল। এই দিবস ও রাত্রিতে এক কল্প।

২৪১ ২০ স্যর হাম্‌ফ্রি ডেভি (Sir Humphrey Davy ১৭৭৮-১৮২৯), : বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক; কয়লার খনিতে ব্যবহৃত 'ডেভি সেফ্‌টি ল্যাম্পের' আবিষ্কর্তা। বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের শিক্ষাগুরু।

২৪১ ২১ হাস্যজনক বাষ্প (Laughing gas) : N_2O বা নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস। নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

হাসিতে হয়। কিছুকাল ইহা অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত হইত, রোগীর কষ্ট লাঘব করিবার জন্য।

২৪৩ ১৪ পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব (atavism)

ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের (কিন্তু পিতার নয়) গুণদোষের চরিত্রে পুনর্বিকাশ। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন জাতীয় পোষা খরগোশের মিশ্রণে উৎপন্ন বাচ্চার মধ্যে বুনো খরগোশের রং ও চেহারার সাদৃশ্য থাকিবে। অষ্ট্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক মেণ্ডেল (Mendel, ১৮২২-৮৪) তাঁহার আশ্রমে কয়েকটি ভিন্নজাতীয় মটর গাছ লইয়া এই পরীক্ষা করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের নাম Mendel's Law of Heredity.

২৪৫-২৬ অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত…

তুলনীয়: পদার্থ বিজ্ঞানের 'Response and resonance'; শব্দতত্ত্বে ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য, দুইটি তার যদি সমতানে বাঁধা থাকে, একটিতে আঘাত করিলে অন্যটিও বাজিয়া উঠিবে। বেতারেও এই তত্ত্বটির প্রয়োগ আছে।

২৫১ ২৩ কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacral plexus): মূলাধার বা মূলাধারের সন্নিকটে বহু স্নায়ুজালের গ্রন্থি। 'Sacral plexus is formed by the lumbo sacral trunk, the anterior primary rami (branches) of the first, second and third sacral nerves, and part of anterior primary ramus of the fourth sacral nerve.' (Grey's Anatomy)

২৫৮ ১৮ শরীরের তিনটি ভাগ

তুলনীয়: 'সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ' গীতা, ৬।১৩ এবং 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্'—শ্বেতাশ্ব. উপ., ২।৮

২৬১ ২৮ মণিপুর…ইত্যাদি

এই খণ্ডেরই ২০২ পৃঃ তালিকা ও ২০৬ পৃঃ চিত্র দ্রষ্টব্য।

২৬২ ৬ ওজোধাতু: ১৯৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য (তথ্যপঞ্জীতে)।

২৭৫ ২ মূর্খও যদি সমাবিষ্ট হয়…

দ্রষ্টব্য বেদান্তসূত্র (৪।৪।২) এবং মাণ্ডূক্যকারিকা ১।১৩।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২৭৬ ৯ হিতবাদ : (Utilitarianism of Mill), ব্যক্তি ও সমাজ-দর্শনের তত্ত্ব ; নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের জন্যই ইহার প্রচলন হইয়াছিল। এই মতে—যাহা কোন ব্যক্তির সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করে, তাহাই নীতিগত ভাবে ভাল।

২৭৯ ১৬ 'আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'

শৈলোপদেশে খ্রীষ্টের উক্তি। N. T. Matt. 5

২৫৮ ৮ গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে

গায়ত্রী ছন্দে রচিত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র। ঋগ্বেদ, ৩।৫।৬২

২৮৬ ১ 'যেখানে অগ্নি আছে'

পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—শ্বেতাশ্বতর উপ., ২-১০

২৯২ ৪ সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে

অধুনা ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, Curvature of space অনুসারে আলোকও বক্ররেখায় গমন করে। এ-বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক ছড়া বিশেষ উপভোগ্য :

A warp in nature has been found,
No line is straight, no circle round.
Sir Isaac Newton had unsound
Knowledge of gravitation.

২৯৬ ১৮ ক্যাণ্ট (Immanuel Kant—১৭২৪-১৮০৪) : বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক এবং কনিগস্‌বার্গ (Konigsberg) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; হিউমের সন্দেহবাদ খণ্ডন করিয়া 'সবিচারবাদ' (Criticism) প্রবর্তন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তা প্রভাবিত করেন। তাহার উল্লেখযোগ্য রচনা—Prologomena to any future Metaphysics, Critique of Pure Reason (১৭৮১), Critique of Practical Reason (১৭৮৮), Critique of Judgement (১৭৯০).

২৯৮ ৩০ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill—১৮০৬-১৮৭৩) : পিতা জেমস মিলের হিতবাদের প্রচারক, প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক। অর্থনীতি, ধর্ম, ন্যায়দর্শন, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব-

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা। ১৮৬৫ খৃঃ হইতে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন। (২য় খণ্ডের তথ্যপঞ্জী দ্রঃ)।

৩০২ ১০ আপ্তবাক্য : ৪২৮ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১০ ৩ তন্মাত্রগুলি : ৪৫০ পৃঃ সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

১৯ প্রকৃতিলীন : ৪৪৮ পৃঃ 'বিষয়-প্রবেশ' নিবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য।

৩১৮ ১২ ওঁ (অউম)— : ওঙ্কার ব্রহ্মের নাম, ব্রহ্মের শব্দময় প্রতীক। মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদে এই ওঁকারতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত।

৩২৩ ২৬ তাঁহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা

এখানে হঠযোগিগণের কথাই বিশেষভাবে বলা হইতেছে। গোরক্ষসংহিতা, হঠযোগপ্রদীপিকা, শিবসংহিতা, ঘেরণ্ড-সংহিতা —এই যোগীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ।

৩২৫ ১১ মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ

To the naked eye, certain portion of the brain and spinal cord appear grey and others white, when freshly cut sections are examined. Grey matter is composed largely of nerve cells, while white matter contains only long processes, the nerve fibres. It is in the former that the nervous impressions are received, stored and transformed into impulses, and by the latter they are conducted.

—Grey's Anatomy

৩৪৩ ১৪ পুনর্জন্মবাদ : পুনর্জন্মবাদের কথা ন্যায়দর্শনেই সমধিক আলোচিত, ইহাতেই চার্বাক-মত খণ্ডিত। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৩৫২ ৪ কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া···

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আছে : বরাহ-অবতার ছানাপোনা লইয়া স্বরূপ ভুলিয়াছিলেন, শিব আসিয়া ত্রিশূল দিয়া তাঁহার দেহ ছিন্ন করিয়া দিলে তিনি হাসিতে হাসিতে স্বধামে চলিয়া যান। সম্ভবতঃ ঐ গল্পটিই এখানে এইভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

৩৫৬ ২৫ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ…

ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য ও জড়ের বিরোধ। উনবিংশ শতাব্দীর যে-সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে, তন্মধ্যে ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ (Darwin's Theory of Evolution) প্রধান, বাইবেলের Genesis (সৃষ্টিতত্ত্ব)-অধ্যায় বিশ্বাস করা যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম ছাড়িয়া জড়বাদী হইতে থাকেন, কেহ বা ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সন্ধান করিতে থাকেন। বেদান্তের মধ্যেই এই আপাত বিরোধের সমাধান রহিয়াছে, তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে দুই নয়, একই; শুধু দুই দিক্ হইতে দেখা হইতেছে, স্বামীজী এই কথাই বলিতেছেন।

৩৮৫ ২ আত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্ বস্তু

এখানে আত্মা বলিতে পুরুষ বা চৈতন্যকে বুঝাইতেছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সৃষ্টির জড় উপাদান, উভয়ের এই পৃথক্ জ্ঞানের নামই 'বিবেকজ্ঞান'।

৩৮৭ ২৩ এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ

বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান ও মহাযান দুইটি প্রধান সম্প্রদায়। মহাযান সম্প্রদায়ে যোগসাধনা প্রচলিত ছিল। এখানে সম্ভবতঃ তাহাদের কথাই বলা হইতেছে। Zen Buddhism-এর ধ্যান-ধারণা আরও ভাবমূলক (abstract).

৩৮৮ ২০ কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া…

ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগপ্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে ॥—হঠযোগপ্রদীপিকা ৯

৩৯৩ ১১ আলকেমি (Alchemy): রসায়ন শাস্ত্রের আদিম অবস্থা। নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার এবং যৌবনকে চিরকাল রক্ষা করিবার জন্য একটি পানীয় আবিষ্কার করিবার বিদ্যা। যদিও এই সন্ধান কখনও সফল হয় নাই, তথাপি এই পরীক্ষাগুলি হইতেই পরবর্তী কালের রসায়ন ও ভেষজ বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিষ্কৃত।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩৯৩ ১২ পরশ পাথর (Philosophers' stone): যে কল্পিত পাথরের স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। আলকেমি ইহারও রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য গোপনীয়ভাবে পরীক্ষা করিত।

১৩ সঞ্জীবনী অমৃত (Elixir of life): মধ্যযুগে মানুষ বিশ্বাস করিত, এমন এক পানীয় সে আবিষ্কার করিবে, যাহার সাহায্যে মানুষ অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

১৪ ভারতবর্ষে 'রসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল

সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা বিশ্বাস করিতেন—রসই পরমাত্মা; পারদকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা শোধন করিয়া পান করিলে অমর হওয়া যায়।

৪১৬ ৫ সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৪র্থ অ (৫-১৪) সূত্র:

এই কয়টি সূত্রে গ্রথিত ভাবগুলি শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৭ম, ৮ম, ৯ম অধ্যায়ে সবিস্তারে গল্পাকারে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে অবধূতের যে চব্বিশ গুরুর কথা পাওয়া যায়, তাহারও উৎস এইখানে:

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতা।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥

১৯ নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥

৪১৭ ৫ গুরুসেবা দ্বারা……যেমন ইন্দ্রের হইয়াছিল

দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্য উপ., ৮।৭—ইন্দ্রবিরোচন-সংবাদ

৮ বামদেব: দ্রষ্টব্য বৃহ. উপ., ১।৪।১০

১৪ সৌভরি: আনুষঙ্গিক সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা